প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৭

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

শহিদ শ্রেষ্ঠ ভগৎ সিং.

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনটি ধারা আছে। একটি সশস্ত্র বলপ্রয়োগে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের ধারা, অপরটি অহিংস অসহযোগের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত আপস-আলোচনার দ্বারা শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির ধারা। তৃতীয় ধারা মার্কসবাদী গণ-আন্দোলনের ধারা। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে এই ধারাটি প্রথমটিকে পুষ্ট করতে পারে এই আশঙ্কা দেশী-বিদেশী ধনিক শ্রেণীর মনে জেগেছিল। কার্যত দ্বিতীয় ধারাটি সফল হলেও তার কারণ যে প্রথম ও তৃতীয় ধারাটির প্রবল প্রভাব—তা ঐতিহাসিকরা স্বীকার না করেই পারে না। প্রথম ধারার সর্বশেষ প্রবক্তা ছিলেন—সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিযার হিন্দু-মুসলমান-শিখ বন্দী সিপাহীদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং যুদ্ধ শেষে তার প্রভাব বৃটেনের ভারতীয বাহিনীর উপর এত গভীর হয়েছিল যে ভারতে বৃটেনের ভাবতীয সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশ—নৌসেনা, বিমানসেনা ও স্থল বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বৃটেন বুঝতে পারে যে দেশীয় সেনা বাহিনীর উপর নির্ভর করে আর ভারত শাসন সম্ভব নয়। ভারতে নিযুক্ত বৃটিশ সেনানায়করা যে এই ব্যাপারটি অনুধাবন করেছিল তার লিখিত দলিলপত্র বর্তমান কালে প্রকাশ পেয়েছে। যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মেজর এ্যাটলীর শাসনকালে ভারতে বৃটিশের শাসন ক্ষমতা এদেশীয় নেতাদের হস্তান্তরিত হয়—সেই প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় বলে গেছেন যে গান্ধীজীর জন্য নয—সুভাষচন্দ্রের জন্য বৃটেন ভাবত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

স্বাধীন ভারতের সরকারি ইতিহাস রচনাকাররা কিন্তু প্রথম থেকেই সশস্ত্র ধারাটির গুরুত্ব হ্রাস করতে চেয়েছেন। ফলে নতুন প্রজন্ম কেবল জেনেছে যে গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী প্রভৃতি পরাধীন ভারতের মুক্তিদাতা। শহিদ ভগৎ সিং-এব সহকর্মী শিব বর্মা যথার্থ লিখেছেন :

"সাধারণ মানুষ জানেন না ভগৎ সিং সত্যিই কি ছিলেন। তারা কেবল শুনেছেন ভগৎ সিং একজন সাহসী যুবক ছিলেন। যিনি লালা লাজপত রায়ের হত্যার বদলা নিয়ে সান্ডার্স বধ করেছিলেন এবং দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা ছুঁড়েছিলেন, ব্যাস এইটুকুই।" (আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা : ১৯৯)

ফাঁসিতে মৃত্যুবরণের সময় যে যুবকের বয়স মাত্র ২৩ বছর কয়েক মাস ছিল—সেই যুবক যে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ধারাকে নতুন মতাদর্শ—মার্কসবাদী মতাদর্শের পথে উত্তরণে সেই মতাদর্শের ভিত্তি গঠনে সাহায্য করেছিলেন—একথা আজও অজানা রয়ে গেছে। ভগৎ সিং-এর বন্ধুরা, সহযোগীরা এবং সামান্য কিছু গবেষকবা সে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু জাতীয় স্তরের ঐতিহাসিকরা সে চেষ্টা করেননি—তা স্বীং

করতে হবে। ত্রিশ দশকের শেষে যখন তাঁর সহকর্মীরা জেল থেকে মুক্ত হলেন—তাঁদের মধ্যে বটুকেশ্বর দত্ত, কুন্দনলাল, বিজয় সিংহ এবং কমলনাথ তেওয়ারীর সঙ্গে আমার সংযোগ হয়। তাঁরা সকলেই তখন মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য আগ্রহী হয়ে ছিলেন। কমলনাথ তেওয়ারী আমাকে বিহারে কমিউনিস্ট পার্টি গডার কাজে নিয়ে যান। বস্তুত ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরেই বিহারে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে জেল-ফেরৎ সন্ত্রাসপন্থী বিপ্লবীদের একটি ভূমিকা ছিল—একথা আজ ইতিহাসে স্বীকৃত। অর্থাৎ, গান্ধীবাদী গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে মার্কসবাদী গণ-আন্দোলনের যে ধারাটি ক্ষমতা হস্তান্তরের কিছু আগে গণ-বিক্ষোভের সূচনা করে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের তৃতীয় ধারার ভূমিকাকে সুস্পষ্ট করে তোলে তার পেছনেও যে ভগৎ সিং-এর অবদান আছে একথাটি আমি বিশেষ করে বলতে চাই।

নিতান্ত অল্পসংখ্যক কমিউনিস্টদের নিয়ে ভারতে যখন বৃটিশ সরকার মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চালাচ্ছিল, ভগৎ সিং-ও তখন ফাঁসির প্রতীক্ষায় জেলখানায়। আলোচ্য পুস্তক থেকে পাঠকরা জানবেন যে ১৯২৮ সালে কলকাতাতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভগৎ সিং গোপনে এসেছিলেন এবং বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক করে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন। শহীদ যতীন দাস বোমা তৈরির ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁব সাহায্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিপ্লবীদের দ্বারা বোমা তৈরি করার জন্য যে চেষ্টা হয় তাতেও ভগৎ সিং যুক্ত ছিলেন। এইসব ক্রিযাকর্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার বিষয় নিয়ে পঠন-পাঠন শুরু করেন। ভারতেব বিপ্লবীদের মনে দীর্ঘদিন ধরে ফরাসী বিপ্লব, ইটালী ও আযারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাশিযার নিহিলিস্ট (Nihilıst) ও মার্কসবাদীদের সংগ্রাম প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু প্রথম দিকে বেশি ছিল ফরাসী বিপ্লব. ইটালী ও আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা দাঁতোঁ'র (Dantan) ব্যবহৃত শব্দ Audacıty (দুঃসাহসিকতা) ভগৎ সিং ও সুভাষচন্দ্র উভয়কেই অনুপ্রাণিত করেছিল। সুভাষচন্দ্রেব মত ভগৎ সিং-ও মনে করতেন গান্ধীবাদী নেতৃত্ব আপস রফার মারফতে শাসন ক্ষমতা পাবে যা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

ভগৎ সিং-এর কাছে ফরাসী বিপ্লবী বৈলিয়োঁ-র ক্রিয়াকর্ম বিশেষভাবে অনুকরণযোগ্য মনে হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীলদের সচেতন করার জন্য ভগৎ সিং-ও অনুরূপভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বেলীতে বোমা ফেলেন। পরে তিনি বিবৃতিতে জানান যে কাউকে হত্যা করার জন্য তিনি এ কাজ কবেননি। তিনি শাসকবর্গের ঔদাসীন্য ভাঙবার জন্যই এই কাজ করেছিলেন। কেবল তাই নয়, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের আপস করার যে মানসিকতা ছিল তারও প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্য ছিল ভগৎ সিং-এর। ত্রিশ সালের লবন আইন শুরু করার আগে ভারতের রাজনৈতিক জীবনের যে অবস্থা এবং তার পরবর্তিকালে ... দেশে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারীদের নিধন সম্পর্কিত

যে-সব ক্রিয়াকর্ম জঙ্গী জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সংগঠিত হচ্ছিল সেগুলিকে মার্কসবাদী গণ-আন্দোলনের ধারায় আনার পক্ষে ফাঁসির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভগৎ সিং যেসব চিন্তাভাবনা রচনা মারফৎ প্রকাশ করে গেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে আছে।

বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে ভগৎ সিং সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তার থেকে এই উত্তরণের ইতিহাস বোঝা যায় না। এই পুস্তকটির বৈশিষ্ঠ্য এইখানে। অন্যান্য রাজ্যে যারাই ভগৎ সিং সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য দলিল সংগ্রহ করেছেন সেগুলিকে একত্র করে লেখক রাজনৈতিক ইতিহাসের গবেষকদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কারণ আমার বিবেচনায় জঙ্গী জাতীয়তাবাদের মার্কসবাদে উত্তরণ কি করে হল তা জানতে হলে এই জীবনী পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

ত্রিশ দশকের শেষে সারাবিশ্বে যে অর্থনৈতিক সংকট চলছিল তার মোকাবিলায় বিগত সোভিয়েত ইউনিয়ন যেসব সাফল্য অর্জন করেছিল নিশ্চই তা সারা বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু সেই সংবাদ ভারতের কজন রাজনীতিক রাখতেন? বাংলাদেশের জঙ্গী জাতীয়তাবাদের মাথায় তখনো সন্ত্রাসবাদী পথই প্রধান বলে বিবেচ্য হয়েছে, যে পথ বস্তুত ভগৎ সিং-এর ফাঁসির কিছু পরে পরিত্যক্ত হয়। এই পুস্তকে পাঠকরা দেখতে পাবেন ভগৎ সিং ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে মার্সি পিটিসন করার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাচ্ছেন। তাঁদের উকিল প্রাণনাথ মেহ্তার খসড়ার পরিবর্তে তাঁরা তিনজন (ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু) যে খসড়া সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন তার মূল বক্তব্য ছিল যে তাঁরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সেই হিসাবে যুদ্ধবন্দীদের যেমন করা হয় তেমনি ফাঁসির পরিবর্তে তাঁদের গুলি করে মারা হোক। এই চিঠিটি একটা অসাধারণ ঐতিহাসিক দলিল যা বাংলা ভাষায় রচিত এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে আছে: "...নতুন নতুন উদ্যম, সাহস ও সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ, লড়াই চলতেই থাকবে। যতদিন না বর্তমান সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে।" (আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা : ১৯০)। বর্তমান যুগের পাঠকের খেয়াল রাখা দরকার তখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে চায়নি।

সম্প্রতিকালে কিছু গবেষক প্রশ্ন তুলেছেন ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীদের ফাঁসি থেকে বাঁচাবার জন্য গান্ধীজী, গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের সময় কোন চেষ্টা করেননি। বরং গান্ধীজী তৎকালীন বড়লাটকে বলেছিলেন যে ১৯৩১ সালের কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের আগেই যেন ফাঁসি দেওয়া হয়। অর্থাৎ গান্ধীজী ভারত সরকারকে জানাতে চেয়েছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের ওপর ভগৎ সিং-দের ফাঁসি কোন প্রভাব ফেলবে না। এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্রেরও ঘোরতর আপত্তি ছিল। তবু একথা সত্য যে করাচী কংগ্রেসের সমাগত প্রতিনিধিরা গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট সমর্থন করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা এবং জঙ্গীবাদী আন্দোলন থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে উত্তরণের সমস্যাগুলি।

বর্তমানকালে যারা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরকে গভীরভাবে অনুশীলন করছেন তাদের কাছে আমি এই বিষয়টি উপস্থিত করছি ; কারণ, এই পুস্তকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনেক ঘটনা ও নেতাদের উল্লেখ আছে। এতে বর্ণিত ভগৎ-এর অন্তিম সময়ের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য :

সেদিন (২৩শে মার্চ, ১৯৩১) বেলা তিনটের মধ্যে খবর এল ফাঁসির বন্দোবস্ত করার। লাহোর জেলের ধর্মপ্রাণ চীফ ওয়ার্ডার চতর সিং ভগৎকে অন্তিম সময়ে ভগবানকে স্মরণ করার জন্য গুরুবাণী পাঠ করতে অনুরোধ করলে তিনি সাহাস্যে জবাব দিলেন, "কিছুদিন আগে যদি আপনি এই হুকুম করতেন তাহলে আপনার ইচ্ছা ও হুকুম দুটিই আমি পূরণ করতে পারতাম। এখন অন্তিম সময়ে যদি পরমাত্মার স্মরণ করি, তাহলে নির্ঘাৎ তিনি বলবেন, 'ব্যাটা বুজদিল, ভীরু! সারা জীবন আমাকে স্মরণ করল না, এখন ফাঁসির দড়ি দেখে ভয় পেয়ে আমাকে ডাকছে!' এর চাইতে এটাই কি ভাল হবে না, যেভাবে আমি আগের জীবন কাটিয়েছি, সেইভাবেই দুনিয়া থেকে চলে যাব। একথা সত্যি যে কিছু লোক আমাকে নাস্তিক বলে দোষী বা অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, কিন্তু আমাকে ভীরু, বেইমান এইসব তো কেউ বলতে পারবে না। একথা তো কেউ বলতে পারবে না যে অন্তিম সময়ে মৃত্যুর সামনে তার পা কাঁপতে থাকে।" (আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা : ১৯৩)

সেইদিনই সকালে ভগৎ 'The Tribune' পত্রিকা থেকে মহান লেনিনের 'জীবন চরিত' গ্রন্থ সম্পর্কে জানতে পেরে উকিল প্রাণনাথ মেহতাকে দিয়ে ঐ বইটি সংগ্রহ করে পড়তে থাকেন। ফাঁসিতে ঝুলবার আগে পর্যন্ত তিনি সেই বইটাই পড়ছিলেন। এই সময় জেলের অফিসারের ডাক এল, 'সরদারজী, ফাঁসি লাগানে কা হুক্ম আ গয়া হ্যায়। আপ তৈয়ার হো যাইয়ে।' ভগৎ সিং-এর ডান হাতে বইটা ছিল। বাঁ হাত বাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান। একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার চলছে।'[২] থমকে দাঁড়ালেন অফিসার। কিছুটা পড়বার পর, বইটা রেখে ভগৎ সিং তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চলনু'। (আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা : ১৯২-১৯৪)

গান্ধীবাদী নেতৃত্বের প্রভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে সেখানে এই মহান বিপ্লবীর ভূমিকা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারেনি। ইদানিংকালে যারা গভীরভাবে সেই চেষ্টা করছেন তাদের কাছে এই পুস্তক মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ ঘটাবে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্বাধীনতা আন্দোলনেব একজন নগণ্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমি এই বইটি রচনার জন্য লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সুধী প্রধান

ভূমিকা

মাথায় ফেল্ট-হ্যাট পরা সাহেবী চেহারার এক বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বের ছবি, সর্বসাধারণের কাছে ছবি হিসেবে এটি বেশ পরিচিত। নানান যানবাহন-সহ বই, পত্র-পত্রিকা এবং ইদানিং কালের জাতীয় গণ-প্রচারমাধ্যমগুলিতে বহুল প্রচারিত এই বিশেষ চেহারার ছবিটি কম-বেশি সকলের চেনা। মোটামুটি অনেকেই জানেন ইনিই বিপ্লবী বীর ভগৎ সিং। শহীদ সম্রাট ভগৎ সিং। যাঁর নাম পাঞ্জাবের খুনী ইংরেজ পুলিশ অফিসার সান্ডার্সবধের সঙ্গে, দিল্লীর আইনসভায় শব্দ-বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে এবং 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করার কৃতিত্বের সঙ্গে যুক্ত।

চেনার পরেই আসে জানার প্রশ্ন। পরিচিত ছবির ভগৎ সিংকে পূর্ণাঙ্গরূপে জানার আগ্রহ। কিন্তু বাংলা ভাষায পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত সহজলভ্য নয়। বর্তমান গ্রন্থে চেষ্টা করেছি সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান করার।

বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর তৎকালীন সাথী ও সহযোদ্ধা শিব বর্মা বলেছেন, '...ভগৎ সিং যে একজন অতি উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন একথা বেশিরভাগ মানুষেরই জানা নেই।' তেমনি জানা নেই ভগৎ সিং সম্পর্কে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চমকপ্রদ শ্রদ্ধাঞ্জলীর কথা : 'ভগৎ সিং আজ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। তিনি একটি প্রতীক। আজ সারা দেশ যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের চিন্তা আদর্শে প্রভাবিত হয়েছে, ভগৎ সিং সেই বিপ্লবী চিন্তার জীবন্ত প্রতীক।'

এমনি অনেক আজানা কথা, অজানা ঘটনা'র কথা জানতে জানতে অবাক হতে হয়, কীসব উপাদানে তৈরি ছিলেন সে সময়ের বীর বিপ্লবীরা! আর জানা-বোঝার পর্ব যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন হলেই বিশ্লেষণ ও চরিত্র মূল্যায়ন পর্বও বাস্তবানুগ হয়।

এই উদ্দেশ্যেই, ভগৎ সিং-এর জীবনচরিত রচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন সময়ের অন্যান্য চরিত্র যেমন, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, যতীন দাস, ভগবতীচরণ ভোরা, যশপাল, শিব বর্মা, সুখদেব, রাজগুরু ও চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ প্রখ্যাত বিপ্লবীদের প্রসঙ্গ এবং তার সঙ্গে যুক্ত কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য ও ঘটনারও উল্লেখ করতে হয়েছে। কারণ, ভগৎ সিংকে জানা-বোঝা ও মূল্যায়ন করার কাজ, স্থান-কাল ও তার প্রাসঙ্গিক চরিত্রগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে হতে পারে না।

বিপ্লবী ভগৎ সিং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিলাম বছর দশেক আগে। সংগৃহীত তথ্য থেকে ভগৎ সিংকে মুখ্য চরিত্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকও লিখেছিলাম। কিন্তু পরে শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে বছর খানেক আগে শুরু করেছিলাম বিপ্লবী ভগৎ সিং সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত গ্রন্থ রচনার কাজ। সাহিত্যলোকের কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও বহুদিন আগে নাটকের

পরিবর্তে এমনি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত গ্রন্থ রচনার কথা বলেছিলেন। সকলের সমবেত উৎসাহের ফলেই এই রচনাপর্ব শেষ করতে পেরেছি।

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রখ্যাত মার্কসবাদী চিন্তাবিদ, সাহিত্য শিল্প জগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও অসংখ্য মূল্যবান চিন্তাশীল গ্রন্থের রচয়িতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধান মহাশয় এই গ্রন্থের জন্য 'শহিদ শ্রেষ্ঠ ভগৎ সিং' শীর্ষক মুখবন্ধটি রচনা করে আমার প্রতি অশেষ স্নেহ ও উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যেসব গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে সাহায্য পেয়েছি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেছি গ্রন্থপঞ্জীতে। মূল ইংরাজি ও হিন্দী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছি। তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করতে গিয়ে গ্রন্থরচনায় হয়ত কিছুটা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ও রচনা উদ্ধৃতি-কণ্টকিত হয়েছে। আশা রাখি সুধী পাঠক এইটুকু অসুবিধা নিজগুণে মানিয়ে নেবেন।

'বিপ্লবী স্মৃতি সংসদ'-এর বন্ধুদের কাছ থেকে গ্রন্থ প্রকাশের কাজে উৎসাহ পেযেছি। তাঁদের আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নিতে গিয়ে অধ্যয়নস্পৃহাকে জাগ্রত রাখতে পেরেছি। আমার অগ্রজ প্রখ্যাত চিকিৎসক ও অধ্যাপক ডাঃ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায ব্যক্তিগতভাবে আমার কাজে উৎসাহ জুগিয়েছেন। এছাড়া যাঁরাই আমার এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দিযেছেন, প্রত্যেকের প্রতিই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থপাঠের পরিশ্রমান্তে 'বিপ্লবী ভগৎ সিং' গ্রন্থটি যদি সুধী পাঠকজনকে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির কালকে সম্যকরূপে মূল্যাযন করতে উৎসাহী করে তাহলেই বুঝব আমার পরিশ্রম মূল্য পেয়েছে।

বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

১

শহীদের রক্তের উৎস এক ও অভিন্ন

এ দেশের মাটিতে বিদেশী ইংরেজ খুনীর দল, স্বদেশ প্রেমের অপরাধে গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে এক নিষ্পাপ তাজা কিশোরকে একদিন হত্যা করেছিল। সেই কিশোর ছিল, বাংলাব অগ্নিযুগের অগ্নিক্ষরা আন্দোলনের পরিণাম। বাংলার বিপ্লববাদের প্রথম প্রকাশ্য বলিদান—শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। সময়টা ছিল ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট।

মর্মান্তিক বেদনায় ভারাক্রান্ত হল ভারতবাসী। কিন্তু এরই মধ্যে সবার অলক্ষ্যে মাত্র বছর খানেক আগেই শহীদের শূন্য স্থান পূরণের উদ্দেশ্যেই যেন জন্ম নিলেন আর এক বিপ্লবী, আর এক শহীদ—সর্দার ভগৎ সিং।

বাংলার বুক খালি করা, বেদনাহত ভারতবাসীর কাছে পাঞ্জাব তুলে দিল তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। দেশগৌরব শহীদ সম্রাট বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং জন্ম নিলেন পাঞ্জাবের লায়লপুর জেলার বংগা গ্রামে। ১৯০৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার, সকাল ৯টায় (মতান্তরে ২৭শে সেপ্টেম্বর / ৫ই অক্টোবর)।

ভগৎ সিং-এর বৈপ্লবিক কর্মময় জীবনকাল ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। মাত্র ২৩ বছরের কিছু বেশি সময়। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চের সন্ধ্যায অতি গোপনীয়তার মধ্যে ইংরেজ খুনীর দল কিশোর ক্ষুদিরাম বোসের মতই, যুবক ভগৎ সিং ও তাঁর অপর দুই সহযোগী বিপ্লবী সাথী সুখদেব ও শিবরাম হরি রাজগুরুকেও ফাঁসিতে ঝুলিযে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এরপর ভীত সন্ত্রস্ত বিদেশী শাসকের দল একই গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁদের শবদাহের নিষ্ঠুর প্রহসন করে শতদ্রু নদীর কিনারে। শহীদের প্রতি আচরণের সে এক কলঙ্কময় ইতিহাস।

মৃত্যুর আগে, ভারতীয গদর পার্টির প্রবীণ নেতা ও একই জেলের রাজবন্দী, বাবা সোহন সিং ভাক্না ভগৎ সিং-কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ভগৎ, তোমার কোন আত্মীয় এল না দেখা করতে?' জবাবে, সহাস্যে ভগৎ বলেছিলেন, 'আমার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তা তো শহীদ ক্ষুদিরাম বসু আর কর্তার সিং সারাভার সঙ্গে। আমাদের সকলের রক্তের চরিত্র একরকম। একই উৎস থেকে এই রক্ত এসেছে। আবার একই জায়গায় গিয়ে মিলবে।...'

শহীদের রক্ত তাই বোধ হয় ব্যর্থ হয় না। এক ও অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত রক্তধারা তাই বারে বারে, যুগে যুগে, কৃতঘ্ন মানুষের শত বিস্মরণের মধ্যেও আপন মহিমার ঔজ্জ্বল্যে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষকে আত্মশুদ্ধির স্লোগান দিতে হয়, শহীদ তোমায় ভুলি নি, ভুলছি না, ভুলব না।

ভগৎ সিং-কে স্মরণ করা তাই বোধ হয় পুণ্যার্জনের কার্যক্রমের সমগোত্রীয়।

পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এইভাবে বহুবার তাঁকে জেলে যেতে হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে চলে মামলা মকদ্দমা। জেলের ভেতরও মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য তিনি লড়াই জারি রাখেন[৯]।

১৯০৭ সালে, পুত্র ভগত সিং-এর জন্মকালে, পিতা কিষেণ সিং এবং পিতৃব্য স্বর্ণ সিং ছিলেন জেলের অভ্যন্তরে বন্দী। জমি-বাজেয়াপ্ত বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অপরাধে তাদের লাহোর কেন্দ্রীয় কাবাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এরই মধ্যে জন্ম হয়েছে তাঁর পুত্র ভগৎ সিং-এর। আর ঘটনাসূত্রে সেই শুভদিনেই পিতা ও পিতৃব্যরা ছাড়া পেয়ে পরিবারের সঙ্গে আনন্দের শরিক হয়েছেন[১০]।

ঐতিহাসিক 'গদর' আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে কিষেণ সিং-এর ছিল অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালের এই 'গদর' আন্দোলনে তাঁর আর্থিক সাহায্য এক স্মরণীয় দলিল[১১]। 'গদর' আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের জন্য কিষেণ সিংকে তাঁর গ্রাম বংগায আটক রাখা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব সময়। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণেব অপরাধে তাঁকে ৪২টি রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। দু'বছব জেলে কাটাতে হয় এবং দু'বছর কাটে অন্তরীণ অবস্থায। কিন্তু কোনভাবেই তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনার নিষ্ঠুর পরিহাসে এই দেশপ্রেমিক পিতাকেই বিপ্লবী বীর শহীদ পুত্র ভগৎ সিং-এর চিতাভস্মপূর্ণ পাত্র নিয়ে ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত করাচী কংগ্রেস অধিবেশনে, স্তম্ভিত সমবেত দর্শক শ্রোতাদের সামনে এসে বিবরণ দিতে হয়েছিল, কিভাবে রাতেব অন্ধকারে তাঁর পুত্র ভগৎ সিং-সহ সুখদেব, রাজগুরুকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে; আর পেট্রল ঢেলে গোপনে নদীর ধারে তাদের মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনায ফেটে পডেছিল গোটা অধিবেশন কক্ষ। দেশের তিন বীর বিপ্লবী সন্তানকে শত প্রতিশ্রুতি দিয়েও রক্ষা করতে পারেননি তাবড তাবড নেতারা। ক্ষোভে দুঃখে তারা কতকগুলো কালো ফুল নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিল মহাত্মা গান্ধীকে।[১২] আর এক বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর উদ্যোগে সেদিন রক্ষা পেয়েছিল অধিবেশন। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁরই প্রচেষ্টায় কংগ্রেস এই বীর শহীদদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

অজিত সিং :

একসময় পাঞ্জাবে যার নামে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হৃৎকম্প হোত তিনিই ভগৎ সিং-এর পিতৃব্য এবং কিষেণ সিং-এর ভাই অজিত সিং। জলন্ধরের সাঁইদাস অ্যাংলো-সংস্কৃত হাইস্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। লাহোরের ডি.এ.ভি কলেজ থেকে পাশ করেন ইনন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। কিছুসময়ের জন্য স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এইসময় সারাদেশজুড়ে জাতীয় কংগ্রেসের পাশাপাশি আপসহীন বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের এবং সন্ত্রাসবাদী পথে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের মুক্তির প্রয়াসে আর একটি ধারার সৃষ্টি হয়। লালা

লাজপত রায়ের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায, অজিত সিং-এব নেতৃত্বে পাঞ্জাবের বুকে গড়ে ওঠে চরমপন্থী আন্দোলন। মহারাষ্ট্র এবং বাংলার আন্দোলনের থেকে এর চরিত্র ছিল ভিন্ন। কারণ গুপ্ত সংগঠন নয়, প্রকাশ্যে কৃষিজীবী জনসাধারণের ন্যাযসঙ্গত দাবী ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করেই এর ভিত তৈরি হয়। ঔপনিবেশিক আইন বা কলোনাইজেসন আইনই ছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভকে সংগঠিত করার বিশেষ সুবিধার কারণ। অপর চরমপন্থী নেতা সৈয়দ হাযদার রাজার সহযোগিতায অজিত সিং প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারতীয় দেশপ্রেমিক সমিতি' (Indian Patriot's Association), যার মাধ্যমে মানুষের বিক্ষোভকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা হয়। প্রখ্যাত বিপ্লবী সুফী অম্বাপ্রসাদের সম্পাদনায়, অজিত সিং-এর নেতৃত্বে শুরু হয 'পেশোয়া' পত্রিকা। প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতমাতা সোসাইটি'। অপর দুই ভাই কিষেণ সিং ও স্বর্ণ সিংও হন এর সদস্য। পাঞ্জাবের কিষাণ আন্দোলনের আওয়াজ, 'পাগডী সাম্‌হাল জাট', ('ফিরিঙ্গি তোমার সমস্ত শস্য লুট করেছে') এই ধ্বনিতে যা বিখ্যাত, তা গ্রাম-শহর সহ সমস্ত জনপদে প্রচার ও জনপ্রিয করে তুলেছিল অজিত সিং-দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'ভারতমাতা সোসাইটি'। অজিত সিং-এর ভাষণ ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণীয। হাজার হাজার শ্রোতা ঘন্টার পব ঘন্টা প্রবল আগ্রহে তাঁর ভাষণ শুনতেন এবং তাদের মধ্যে তাঁর বক্তৃতা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলত। কৃষিজীবী মানুষ-সহ সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও তাঁর বক্তৃতা ক্রিযা করত। বিপ্লবী পরিকল্পনায এই দুটো শ্রেণীকেই তিনি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ভীত সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকারের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট গেল। 'অজিত সিং এবং তাঁর সাথীরা জনসাধারণকে জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছে, ইংরেজদের আক্রমণ করে স্বাধীন হতে বলছে।··· সে ইংরেজ সবকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলছে এবং তাঁর ডাকে কৃষিজীবী শ্রেণী ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ মাথা চাডা দিচ্ছে।' সময় এল, যখন অজিত সিং-এর উত্তেজক ভাষণে ১৯০৭ সালে লাহোর, রাওলপিণ্ডি শহরে সরকাব বিরোধী দাঙ্গা ও ত্রাসের সৃষ্টি হল। লালা লাজপত রায় উৎসাহভরে ভাই পরমানন্দকে চিঠি লিখলেন, 'মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, এমনকি কৃষক শ্রেণীও আন্দোলন বিক্ষোভে এগিযে এসেছে। আমার একটিমাত্র আশঙ্কা এটা যেন অপরিণত অবস্থায় না ফেটে পড়ে নষ্ট হয।'

কিন্তু বৃটিশ সরকার আর কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজী নয়। ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভকে খতম করতে তারা ১৮১৮ সালের রেগুলেসন তিন ধারা বলে অজিত সিংকে গ্রেপ্তার করে বর্মার মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দিল ১৫ই জুন ১৯০৭ তারিখে।

মাস ছয়েক বাদে মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেলেন অজিত সিং। ১৯০৭ সালের ১৮ই নভেম্বর এক স্পেশ্যাল ট্রেনে লাহোর পৌঁছলেন। জনতার উৎসাহে তুফান এল। সারা পাঞ্জাব জুড়ে চলল খুশির উৎসব। এই সালের ডিসেম্বর মাসে সুরাটে বসল কংগ্রেসের অধিবেশন। লোকমান্য তিলক অজিত সিং এবং কিষেণ সিং দুজনকেই ঐ অধিবেশনে আসবার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ পাঠালেন। ওঁরা দুজনেই উপস্থিত হলেন। অজিত সিং-এর

লাহোর শহরে। ১৮৯০ খৃঃ অর্জন সিং সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। সামাজিক সংস্কারমূলক কাজ, যেমন জাতিভেদ প্রথা দূর করা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন এসব ছিল আর্য সমাজিদের কার্জের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আর্যসমাজ আন্দোলন জাতীয়তাবোধেরও জাগরণ ঘটাতে সাহায্য করেছে। অর্জন সিং ছিলেন এই আন্দোলনের সংগঠক, নেতা ও প্রচারক।

১৮৯৩ খৃঃ দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন। ভগৎ সিং-এর পিতামহ অর্জন সিং এই সম্মেলনে যোগ দেন অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে।

অর্জন সিং তাঁর চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন আপসহীন, যুক্তিবাদী, দৃঢপ্রত্যযের মানুষ। অচল, অনড ঐতিহ্যবাদ, কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে আপস কবেননি তিনি।

ধর্মীয় সংস্কার-সাধক তথা জাতীযতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও অর্জন সিং ছিলেন সমাজ-সেবক। বংগা গ্রামে তিনি নিজব্যয়ে তৈবি করেছিলেন যাত্রীদের জন্য সরাইখানা, খনন করিয়েছিলেন পানীয় জলের জন্য কূঁয়া এবং নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি শিখ গুরুদ্বার।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসির দু'বছর বাদে ১৯৩৩ সালে বৃদ্ধ অর্জন সিং প্রাণত্যাগ করেন।

অর্জন সিং-এর মানবপ্রেম, সমাজসেবা ও দেশভক্তি তাঁর তিন পুত্রকেও প্রভাবিত করে। এই তিন পুত্র হলেন কিষেণ সিং, অজিত সিং ও স্বর্ণ সিং।

কিষেণ সিং :

বড়ছেলে কিষেণ সিং, যিনি ভগৎ সিং-এর বাবা এবং মেজ ছেলে অজিত সিং, সম্পর্কে যিনি কাকা, একই সঙ্গে জলন্ধরের সাঁইদাস অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুলে পডাশুনা করেন। কিষেণ সিং এই স্কুলেই অষ্টমশ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করেন। এই স্কুলেই এঁরা প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ও শিক্ষক নেতা সুন্দর দাসের সংস্পর্শে আসেন। সুন্দর দাস তাঁর বক্তৃতা ও কাজের মাধ্যমে ছাত্রদের জাতীয়তাবাদী কাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে, পিতা অর্জন সিং-এর পাশাপাশি তাঁর শিক্ষকের প্রভাবও পড়ে এঁদের ওপর।

ভগৎ সিং-এর বাবা কিষেণ সিং সে সময়ের জাতীযতাবাদী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলকের আহ্বান, 'স্বাধীনতায় আমার জন্মগত অধিকার' এবং বাংলার অনুশীলন দলের নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পাঞ্জাবকে সে সময় প্রভাবিত করেছিল। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[*] (পরবর্তীকালে নিরালম্ব স্বামী), শচীন সান্যাল, রাসবিহারী বসু প্রমুখ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হচ্ছিল পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের।

কর্মক্ষেত্রে ভগৎ সিং-এর বাবা কিষেণ সিং যুক্ত ছিলেন কয়েকটি ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে। যে কোম্পানীগুলির সদর দপ্তর ছড়িয়েছিল পাঞ্জাব ও বোম্বাই (বর্তমান মুম্বই)-এর শহরগুলিতে। লাহোর শহরকে কেন্দ্র করেই ছিল তাঁর বসবাস।

ভগৎ সিং-এর বাবা কিষেণ সিং ছিলেন একজন মানবদরদী সমাজ সেবক। ১৮৯৮ খৃঃ তিনি তাঁর অপর দুজন সহযোগী লালা বিশ্বম্বব দাস ও এ্যাডভোকেট লালা অমর দাসের সঙ্গে তৎকালীন মধ্য প্রদেশের বেরারে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য ব্যাপক ত্রাণকার্য চালান। তেমনি ১৯০০ খৃঃ লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে তিনি আহমেদাবাদের দুর্ভিক্ষেও দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৪ খৃঃ কাংডার ভূমিকম্পে দুর্গত মানুষের সেবার কাজে 'কাংড়া রিলিফ কমিটি'র সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৫ খৃঃ কাশ্মীরের ঝিলম নদীর ভয়াবহ বন্যায় শ্রীনগরের অধিবাসীদের জন্য সেবাকার্য পরিচালনা করেন। পিতা অর্জন সিং-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, কিষেণ সিংও আর্যসমাজ আন্দোলনে অংশ নেন, মহাত্মা হংসরাজের সঙ্গে।

কিষেণ সিং এরপর জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং দীর্ঘকাল এতে সক্রিয় অংশ নেন। বাংলা ও মহারাষ্ট্রের সঙ্গে পাঞ্জাবেব তৎকালীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনে, গোপন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের যেমন মিল ছিল ; তেমনি পার্থক্যও ছিল। প্রকাশ্যভাবে গডে ওঠা ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মধ্যেই ছিল এর স্বাতন্ত্র। জমির খাজনা বৃদ্ধি, বারি-দোয়ব ক্যান্যাল্ করবৃদ্ধি, ঔপনিবেশিক আইন বা কলোনাইজেসন্ এ্যাক্ট, পাঞ্জাবের মানুষকে প্রকাশ্য সংঘর্ষের ময়দানে হাজির কবেছিল। এরই পরিণতিতে গড়ে উঠেছিল 'আঞ্জুমান-এ-মুহিব্বান-এ-ওয়াতন' বা 'ভারতমাতা সোসাইটি'। যতদূর জানা যায়, মোবাদাবাদের বিখ্যাত বিপ্লবী 'সুফী' অম্বাপ্রসাদ, যিনি ১৯০৯ সালে ভগৎ সিং-এর কাকা বিপ্লবী অজিত সিং-এর সঙ্গে ইরানে পালিযে যান ; ১৯০৭ সালে পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীদের নিয়ে এই সমিতিটি গঠন করেন। এই সমিতিব বিখ্যাত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অর্জন সিং-এর তিন ছেলে, ভগৎ সিং-এর বাবা কিষেণ সিং ও কাকা অজিত সিং ও স্বর্ণ সিং। কিষেণ সিং-এব সাথীরা ছিলেন, লালা আনন্দকিশোর মেহেতো, লালা পিণ্ডিদাস, লালা কেদারনাথ সায়গল, লালা হরদয়াল, মৌলভি জিযাউল হক, লালা লালচাঁদ 'ফলক', শ্রীমতী পদ্মাবতী রামচন্দ্র ও অন্যান্যরা।

'বাংলার বিপ্লববাদের ব্রহ্মা', যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (নিরালম্ব স্বামী), অরবিন্দ যাকে বরোদার রাজার আর্মিতে এনেছিলেন, যিনি ১৯০২ সালে বরোদা থেকে কলকাতায় এসে ১০৮, সার্কুলার রোডে একটি বিপ্লবীকেন্দ্র গডে তোলেন ; তিনিই ১৯০৬ সালে পাঞ্জাবে যান এবং ভগৎ সিং-এর বাবা কিষেণ সিং ও তাঁর দুই কাকা অজিত সিং ও স্বর্ণ সিংকে বিপ্লবের পথে আকৃষ্ট করেন।[৭] উল্লেখ্য, অরবিন্দ এই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমেই তিলকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।[৮]

লাহোরে স্থাপিত 'ভারতমাতা সোসাইটি', তার প্রকাশিত পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজ শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। লালা লাজপত রায় ও ভগৎ সিং-এর কাকা বিপ্লবী অজিত সিং-এর ওপর নেমে আসে সরাসরি আক্রমণ। তেমনি ইংরেজ শাসকদের নজর পড়ে কিষেণ সিং-এর ওপর। অস্ত্রসংগ্রহের জন্য কিষেণ সিং নেপাল অবধি ছোটেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে ইংরেজ গোয়েন্দাদের নজরদারী। নেপাল থেকে ফেরার

২

ভগৎ সিং-এর পূর্বপুরুষ

একসময় ভগৎ সিং-এর পূর্বপুরুষ শিখ গৌরব মহারাজা রণজিৎ সিং-এর প্রতাপশালী সৈন্যবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন।[১] ইংরেজ শক্তির ক্রমসম্প্রসারণের সামনে স্বাধীন শিখ রাজ্য গড়ে তোলা ও রক্ষা করার যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম হয়েছিল তার সঙ্গে উল্লেখ করা যায় এই পূর্বপুরুষদের ভূমিকা।

ভগৎ সিং-এর পূর্বপুরুষরা ছিলেন সাঁধু জাট। জাটরা পাঞ্জাবী চাষী বা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। এই পূর্বপুরুষ কালক্রমে শিখধর্মে রূপান্তরিত হন।

আঠারো শতকের দ্বিতীযার্ধে, তখনকার পাঞ্জাবে, মোগল আব আফগান বিজয়ীদের বিরুদ্ধে শিখ সামরিক নেতা 'সর্দার' শাসিত ১২টা শিখ 'মিস্‌ল' বা যোদ্ধৃসঙ্ঘ[২] ছিল। রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে শিখ রাজ্যের অভ্যুত্থানের পব সেখানে খুব কম এলাকাই হিন্দু ও মুসলিম সামন্তপ্রভুদের দখলে ছিল। মিস্‌লগুলোর ছিল নিজ অধিকারের এলাকা বা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য এবং শিখ 'খালসা', অর্থাৎ সম্প্রদাযের নিজস্বভূমি হিসেবে তা গণ্য হোত। এটা আবার সৈন্যদলের নেতৃত্বকেও বোঝাত। ('খালসা', আরবী শব্দ, 'খালিসা' অর্থাৎ 'পরিচ্ছন্ন' থেকে এসেছে)।

ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্রে দেখা যায তখনকাব পাঞ্জাবে সর্দাবদের মধ্যকার নিরন্তর সংগ্রামে পীডিত এবং বিদেশী ইংরেজদের আবির্ভাবে ভীত কৃষকরা মহারাজা রণজিৎ সিং-এর সৈন্যবাহিনীতে বিপুল সংখ্যায় যোগ দিযেছিল। এদেব নিযে গঠিত হয়েছিল প্রবল পরাক্রমশালী কৃষক পদাতিক বাহিনী।[৩] এঁরা ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু ও যুদ্ধে পারদর্শী।

ভগৎ সিং-এব কণ্ঠে বাঁকেদযালের জনপ্রিয় গান— 'পাগডী সাম্‌হাল জাট' ছিল একটি অত্যন্ত আবেগমযী উদ্দীপনামঘ গান।

'Take Care of Turban,
O Jat.
The Firingee has taken away
Your entire Wheat'.

এ গানের অর্থের মধ্যেই লুকিযে আছে তখনকার পাঞ্জাবের শোষণ, বঞ্চনা আর সংগ্রাম। সেই সময় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের উপদ্রবকারী পাঠান আর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা ইংরেজ সাম্রাজ্যবিস্তারী থাবার মাঝে শিখ রাজ্যকে পিষে মারার চক্রান্ত চলেছে। সাময়িক সন্ধি করে, শয়তান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, শিখরাজ্যকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চেযেছে। আবার সময় সুযোগমত তাকে কব্জা করেছে। এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে শিখভূমি পাঞ্জাব।[৪] পরবর্তীকালে নানান অর্থনৈতিক সংস্কারের মলম দিয়ে শিখরাজ্যের সংগ্রামী মানুষকে বৃটিশ রাজশক্তি

সাময়িকভাবে কিছুটা বিভ্রান্ত করতে সফল হয়েছে" এটা সত্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষ বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে অন্তরের তীব্র ঘৃণার আগুনকে সদা প্রজ্বলিত রেখেছে। ইতিহাসের গতি, সময়ের স্বাভাবিক বিস্মৃতি একে নির্বাপিত করতে পারেনি। ভগৎ সিং-এর পূর্বপুরুষদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে এই ঘৃণা, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম ; আর পাঞ্জাবের অতীত ঐতিহ্যের বর্ণময় বীরত্ব, সাহস, নিষ্ঠা এবং বৃহত্তর মানবতার মুক্তির স্বার্থে বলিদানের আকুতি।

৩

ভগৎ সিং-এর বংশ পরিচয় ও পারিবারিক পশ্চাৎপট

ভৌগোলিক দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবেব লাযলপুর, শেখিপুরা, সারগোদা, মন্ট-গোমারী এবং মুলতান অঞ্চলগুলো ছিল অনিবিড বা বিক্ষিপ্ত জনসমষ্টির বাস-এলাকা। এসব অঞ্চলে চাষাবাদ হোত নদীর ধারের কয়েকফালি জমিতে, অথবা সেচের উপযোগী কিছু কুঁয়ার সংলগ্ন জমিতে। উনিশ শতকের শেষভাগে এসব অঞ্চলে খাল কাটা হল। মধ্য পাঞ্জাবেব ঘনবসতির লোকেদের এখানে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হল। চাষাবাদের সুবিধা পেয়ে এবং বেশিবভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্কর জমি পেযে অনেকেই এসব অঞ্চলে বসবাসের জন্য চলে এলেন। এবই ফলে মধ্য পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর, হোসিযারপুর, লুধিয়ানা থেকে বিরাট সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ এই উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবে তাদের নতুন বাসস্থান গডলেন। দেশান্তরী হয়ে দুঃসাহসিক জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করা ও জীবনসংগ্রাম শুরু করার এই দলে ছিলেন ভগৎ সিং-এর পূর্বপুরুষেরা।

পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার ফাগুয়ারা থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে, খাকতার কালান গ্রামে ছিল ভগৎ সিং-এব পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান। এখান থেকে দেশান্তরী হযে বিশ শতকের গোডায় ওঁরা নয়া বসতি স্থাপন করলেন লায়লপুর জেলার জরণওয়ালা তহশীলের অন্তর্গত চক নং ১০৫ জি-বি, বংগা গ্রামে। বর্তমানে পাঞ্জাবের এ অঞ্চলটা পাকিস্থানের অন্তর্গত।

অর্জন সিং :

ভগৎ সিং-এর ঠাকুরদাদা বা পিতামহের নাম অর্জন সিং। কৃষিকাজই ছিল তাঁর মূল জীবিকা। কিন্তু এরই সঙ্গে তিনি ছিলেন চিকিৎসক। বিনা পয়সায় গ্রামের গরীব মানুষের চিকিৎসা ও সেবা করতেন গ্রীক মেটিরিয়া মেডিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত 'ইউনানি' চিকিৎসা শাস্ত্রে। ঐ অঞ্চলে চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন তিনি। অর্জন সিং ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ। মাতৃভাষা পাঞ্জাবী ছাড়াও তিনি জানতেন সংস্কৃত, পার্সি এবং উর্দু ভাষা। ঐতিহাসিক বাংলার নবজাগরণের পাশাপাশি পাঞ্জাবেও হয়েছিল আর্যসমাজ আন্দোলন। উত্তর ভারতে এই আর্যসমাজের কাজকর্মের শুরু ১৮৭৭ খৃঃ

বিপ্লবী কার্যক্রমে লোকমান্য তিলক এতই প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি ঐ সভায় গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'সর্দার অজিত সিং এক বিরল ব্যক্তিত্ব। স্বাধীন ভারতে প্রথম রাষ্ট্রপতি হবার উনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। অজিত সিং ভিন্ন ঐ পদের উপযুক্ত আমাদের কাছে আর কেউ নেই।' একথা বলে নিজহাতে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এক মুকুট পরিয়ে দিলেন অজিত সিং-এর মাথায়। এই সভায় আওয়াজ উঠল, শাসন সংস্কার নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, তিলক, লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে গলা মেলালেন অজিত সিং।[১৩]

মান্দালয় জেল থেকে ফিরে প্রবল বেগে সাংগঠনিক কাজ শুরু করলেন অজিত সিং। পত্র, পত্রিকা প্রকাশ করা, বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমিতির অয়োজন করা, ভাষণ দেওয়া, সব কিছু চলতে থাকল। একদিকে প্রকাশ্যে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে থাকলেন, অপরদিকে, গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমের বিপ্লবের প্রস্তুতিও চালাতে থাকলেন। বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ এবার কড়া রিপোর্ট তৈরি করল তাঁর বিরুদ্ধে। গোপন সূত্রে খবর এল অজিত সিং-এর কাছে। খবরে জানা গেল, এবাব বৃটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে এমন চক্রান্ত করবে যাতে নির্ঘাৎ তাঁকে ফাঁসিতে লটকান যায়। এ অবস্থায় বিদেশে আত্মগোপন করে বিপ্লবী কার্যক্রম চালাবার জন্য তিনি ১৯০৯ সালে ভারত ত্যাগ করে বিদেশে চলে যান। প্রথমে এলেন ইরানে। এখানেও ইরান সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করল। ফলে তুর্কি ও অস্ট্রিয়া হয়ে তিনি পৌঁছলেন জার্মানী। এখানে থেকেই তিনি বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে থাকেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে র্জামান ও তুর্কির পরাজয়ের ফলে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। উপাযান্তর না দেখে তিনি ইওরোপ ছেড়ে ব্রাজিলে চলে যান।

সুযোগ্য বিপ্লবী ভাইপো, ভগৎ সিং-সম্পর্কে সুদূর ব্রাজিল থেকেও অজিত সিং খবর রাখতেন। ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে যখন মামলা চলছিল তখন তিনি দাদা কিষেণ সিং-এর কাছে ভগৎ সিং সম্পর্কে এক চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি ভগৎ সিং-কে ব্রাজিলে পাঠাবার কথা বলেন। কিন্তু জীবিতকালে আর কাকা-ভাইপোর সাক্ষাৎ হয়নি।

অবশেষে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আত্মীয় পরিজনের চেষ্টায় ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাহায্যে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

ঘটনাচক্রে, এই বীর বিপ্লবী ইতিহাস-প্রতিম মানুষটি পৃথিবী থেকে বিদায নেবার দিনটিকেও ঐতিহাসিক করে গেছেন, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ ও ভারতের স্বাধীনতা একই দিনে ঘটে। বিদায়ের ক্ষণে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'আমার কাজ শেষ, চলি'।

পরবর্তী প্রজন্মের ওপর হয়ত গভীর আস্থা ও বিশ্বাস রেখেই তিনি চলে গেছেন। সময়ের আহ্বানে উপযুক্ত হয়ে ওঠার দায়িত্ব তো নতুন প্রজন্মের। এই তো বাস্তব। এই তো সত্য।

স্বর্ণ সিং :

সর্দার স্বর্ণ সিং অর্জন সিং-এর ছোটছেলে। ভগৎ সিং-এর কাকা। এঁর জন্ম হয় ১৮৮৭ সালে, খাতকার কালানে। স্বর্ণ সিং 'ভারতমাতা সোসাইটি'-র অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। সংগঠনের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানোর দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতেন তিনি। এই সময় তাঁর মেজ দাদা অজিত সিং-কে মান্দালয় জেলে পাঠান হয় আর বড়দাদা কিষেণ সিং ফেবার হয়ে চলে যান নেপালে। স্বর্ণ সিং এ অবস্থায় তৎপরতার সঙ্গে পত্রিকায় লেখার কাজ চালাতে থাকেন। গুপ্তপথে উত্তেজক বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন ঐসব লেখার মাধ্যমে। মিটিং, মিছিল, শোভাযাত্রার মাধ্যমে সংগঠনের কাজ চালু রাখেন। ফলে, বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করে এবং তাঁকে দুবছরের সশ্রম কাবাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলে তাঁকে দিনের পর দিন কঠিন পরিশ্রম করতে হোত। ঘানি টানার যে কাজ বলদের, তাঁকে দিযে সেই কাজ করতে বাধ্য করা হোত। এরই সঙ্গে দেওয়া হোত মানুষের অযোগ্য পশুর খাবার, যা ছিল অখাদ্য। এসবের ফলে, ধীরে ধীরে তিনি যক্ষারোগে আক্রান্ত হলেন। এইভাবে, নিষ্ঠুর বৃটিশ শাসন ও অত্যাচারের সামনে শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন ভগৎ সিং-এর কাকা স্বর্ণ সিং। মাত্র তেইশ বছর বয়সে, ১৯১০ সালে তাঁর জীবনাবসান হল।

শিশু ভগৎ সিং-এর বন্দুক চাষ কাহিনী :

শোনা যায়,[১৪] আড়াই তিন বছরের ভগৎ সিং-এর অন্যতম খেলা ছিল মাটিতে চারা গাছ পুঁতে, সেটাকে বন্দুকের চাষ করছি বলে আনন্দ করা। বাবার বন্ধু, অন্যতম দেশ নেতা আনন্দকিশোর মেহতা শিশু ভগৎ সিং-এর কাণ্ড দেখে তো অবাক! বন্ধু কিষেণ সিং-এর বাগানে এসেছেন তিনি। বাগানে আমের চারা লাগান হচ্ছে। হঠাৎ দেখেন শিশু ভগৎ সিং-ও কয়েকটা চারা নিয়ে মাটিতে লাগাচ্ছে। ব্যাপার কি? এগিয়ে এলেন শিশুটির কাছে।

'তোমার নাম কি?' মেহতা জানতে চাইলেন।

'ভগৎ সিং'। শিশুটি জবাব দিল।

'কি করছ, এসব?'

'বন্দুকের চাষ।'

'বন্দুকের চাষ!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন মেহতাজী।

'হ্যাঁ, বন্দুকের চারা পুঁতছি।' বন্দুক উচ্চারণ স্পষ্ট নয়, তবু শিশু ভগৎ সিং যেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর গর্বের সঙ্গে জবাব দিল।

'বন্দুক!' মেহতাজী যেন ঘাবড়ে গেলেন, বলে কি একরত্তি ছেলে!

'হ্যাঁ, বন্দুকই-তো।'

ভগৎ সিং চলে এলেন লাহোরের কাছে নবকোটে বাবা-মায়ের কাছে। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল ডি.এ.ভি (দয়ানন্দ এ্যাঙ্গলো বৈদিক) স্কুলের ৫ম শ্রেণীতে। সময়টা, ১৯১৭ সাল নাগাদ। ভগৎ সিং-এর বয়স তখন বছর দশেক। গ্রাম ও শহরের পরিবেশের পার্থক্য ও পড়াশুনার চাপের কথা মনে রেখে ভগৎ-এর জন্য গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা হল। কিছুদিন বাদে কিষেণ সিং শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনার শিষ্যটির পডাশুনা কেমন চলছে?' শিক্ষক জবাব দিলেন, 'শিষ্য কি বলছেন! ভগৎ তো স্বয়ং গুরু! আমি ওকে কি পড়াব? আমি তো দেখছি, সবই ওর আগে থেকে পড়া।' কথাটার মধ্যে সত্যতা ছিল। কারণ, ভগৎ স্কুলের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের নানান বই ও পত্র-পত্রিকা পডতেন আর ভালভাবে সেসব মনে রাখতেন। এই কাবণে দেশের নানান বিষয়, নানান সমস্যা সম্পর্কে সমশ্রেণী ও সমবয়সীদের চাইতে তাঁর জ্ঞান ছিল অনেক বেশি।

সেটা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমকাল, ১৯১৭ সাল। ১৯১৫ সালের 'গদর' পরিকল্পনা এবং তার ব্যর্থতা থেকে বহু নেতা ও কর্মীর ওপর নেমে আসে অত্যাচার। মামলা, মকদ্দমা চলতে থাকে। ফাঁসি, দীপান্তর, সশ্রম কারাদণ্ড ইত্যাদি দমন পীড়ন-মূলক ব্যবস্থা চালু হয়। এই সময়, সংবাদপত্রের পাতায কেটে ছেঁটেও যেটুকু খবর আসত, সেটুকুও গভীর আগ্রহ নিযে পড়তেন ভগৎ।

একসময়ের কম্যুনিস্ট নেতা, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির (C. P. I.-এর) সাধাবণ সম্পাদক অজয় ঘোষ ছিলেন ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সহকর্মী। তিনি লিখেছেন, 'বিগত দিনের কাজকর্ম নিয়ে মাঝে মধ্যেই আমাদের কথাবার্তা হোত। ১৯১৫-১৬ সালের শহীদরা, বিশেষ করে শহীদ কর্তার সিং-এর কথা বলতে গিয়ে ভগৎ সিং-এর সারামুখে এক আশ্চর্য ভাবান্তর দেখা যেত। কর্তার সিং ছিলেন প্রথম লাহোর ষডযন্ত্র মামলায় সর্বপ্রধান বলে চিহ্নিত। তিনি যখন ফাঁসিতে আত্মবিসর্জন করেন, তখন ভগৎ সিং ও আমি ছিলাম বযসে খুবই ছোট।

'কর্তার সিং ছিলেন যেমন নির্ভীক, তেমনই অদ্ভুত সংগঠক। এ ব্যাপারে শত্রুরাও তাঁকে প্রশংসা করত। বলতে গেলে আমি তাঁকে দেবতা বলেই মনে করতাম···'। (সূত্র, 'Bhagat Singh and his Comrades'—by Ajoy Ghosh)

জীবনের সূচনাপর্বে, বালক বয়স থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের সান্নিধ্যে এসেছেন ভগৎ। যেমন, লালা লাজপত রায়, সুফী অম্বাপ্রসাদ, মেহ্‌তা আনন্দ কিশোর, লালা পিন্ডিদাস প্রমুখ। পাঞ্জাবের যে কৃষকরা আমেরিকা, কানাডা থেকে ফিরে, ১৯১৪-১৫ সালের ভারত কাঁপান 'গদর' (গদরের অর্থ—বিপ্লব) আন্দোলন শুরু করেছিল, তার অন্যতম নেতা ও সংগঠক কর্তার সিং সারাভার স্পর্শও পেয়েছেন বালক ভগৎ সিং। রাসবিহারী বসু-সহ বাংলার নানান বিপ্লবী নেতাদের আনাগোনাও ছিল ভগৎ সিং-এর বাড়িতে। কিন্তু ফাঁসিকাঠে জীবন দেওয়া, মাত্র ২০ বছরের এক তাজা প্রাণময় পাঞ্জাবী যুবক কর্তার সিং সারাভা, ৮/৯ বছরের বালক ভগৎকে নাড়া দিয়েছিল সবচাইতে বেশি। কর্তার সিং-এর বীরত্ব ও আত্মত্যাগ বিরাট ছাপ ফেলেছিল

ভগৎ-এর জীবনে। গ্রেপ্তার হবার পর তাই দেখা যায় ভগৎ সিং-এর পকেট থেকে যে ছবিটা বেরিয়েছিল সেটা, কর্তার সিং সারাভার। কর্তার সিং-এর ছবি ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। মাকে এ ছবি দেখিয়ে ভগৎ বলত, 'মা দেখ, এই ছবিটা শহীদ কর্তার সিং সারাভার'[১৬]। ইনিই একাধারে আমার আরাধ্য বীর, বন্ধু ও সহচর।' ভগৎ -এর কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হোত কর্তার সিং-এর প্রিয় গান,

'সেবা দেশদি-জিন্দিরিয়ে বড়ি ওখি
গালান করনিয়ান ঢের সুখালিয়ান নে,
জিন্হান দেশ-সেবা ভিচ্ প্যার পাযা,
উনহান লাখ্ মুসিবতান ঝলিয়ান নে।' (গুরুমুখী)।

অর্থাৎ, বাংলায় ভাবানুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায়,

দেশের কাজ করব, বলা তো সোজা।
কিন্তু করা কঠিন।
কারণ, দেশপ্রেমের পথে ছড়ানো রয়েছে
অগুনতি বাধা-বিপত্তি, দুঃখকষ্ট—
আর মরণসম অশেষ পীড়ন।

লেখাপড়ার প্রতি ভগৎ-এর আগ্রহের নজির মেলে, ১৯১৮ সালে লাহোরের ডি. এ.ভি স্কুলে ক্লাস সিক্সের (VI) ছাত্র থাকাকালীন, তাঁর পরীক্ষার নম্বর প্রাপ্তির সংবাদে। তথ্য সংগ্রহে তাঁর উর্দুভাষায় লেখা ঐ সময়ের একটি পোস্টকার্ড মেলে, যাতে তিনি তাঁর পূজনীয় ঠাকুর্দা অর্জন সিংজীকে চিঠির ওপরে 'ওম' শব্দের সূচনা করে 'শ্রীমান পূজ্য বাবাজী, নমস্তে' সম্বোধন অন্তে জানাচ্ছেন, 'এখন আমার ইংরাজী ও সংস্কৃতে কত নম্বর মিলেছে তা জানান হয়েছে। এই বিষয়গুলিতে আমি পাশ করেছি। সংস্কৃতে আমি ১৫০-এর মধ্যে ১১০ নম্বর পেয়েছি। ইংরাজিতে ১৫০-এর মধ্যে পেয়েছি ৬৮ নম্বর। ৫০ নম্বর পেলেই পাশ। ৬৮ নম্বর পেয়ে আমি ভালভাবেই পাশ করেছি। আপনি কোনরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। বাকী বিষয়ের ফল এখনও জানায় নি··· আপনার আজ্ঞাধীন, ভগত সিং।'

স্কুল জীবনের কাহিনীতে এক মজার ঘটনা মেলে। ভগৎ সিং-এর বয়স তখন দশ-এগারো বছর। স্কুল যাতায়াতের পথে একজন বৃদ্ধকে দেখা যায় রাস্তায় বসে এক বড় থালায় মিঠাই বেচে। বয়সের ভারে তার হাত কাঁপে। ঐ কাঁপা হাতেই সে কোনরকমে অতি কষ্টে কাজ চালায়। বন্ধু ও সহপাঠী জয়দেব গুপ্তের সঙ্গে এক কড়া শীতের দিনে ঐ রাস্তায় চলতে গিয়ে ভগৎ থমকে দাঁড়ালেন ঐ বৃদ্ধের পাশে। ঐ কড়া শীতে বৃদ্ধের কাহিল অবস্থা। তারই মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে সে দাঁড়িপাল্লায় মিঠাই বেচছে। গভীর মমত্বে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ভগৎ। তারপর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তোমার কেউ নেই?' বৃদ্ধ কাঁপা গলায় জবাব দিল, 'না।' এবার বন্ধু জয়দেব ভগৎকে আশ্বস্ত করতে বলল, 'আরে, এ কিছু নয়। এসব বুড়োর কর্মফল।' ভগৎ এ কথা মানতে

তার প্রতিক্রিয়া তাকে প্রভাবিত করতে থাকে। তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত বালক ভগৎ সিং বড় কাকীমা শ্রীমতি হরনাম কাউরের দুঃখভরা হৃদযের ব্যথা লাঘব করতে পাশে বসে সান্ত্বনা দেয়, 'কাকী তুমি কেঁদ না, দুঃখ কোর না। আমি ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াব। কাকাকে ফিরিয়ে এনে তবেই ছাড়ব।' আর এক কাকী শ্রীমতি হুকুম কাউরকে বলে, 'আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বদলা নেব।' বয়সে সে বালক। কিন্তু এসব কথা বলার মধ্যে, তার চেহারায় ফুটে উঠত এমন এক বলিষ্ঠ ভাব, যেন সে এক সেনাপতি। দুঃখ, ব্যথা ভুলে কাকীরা সস্নেহে ভগৎকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করত, সাময়িক হলেও ভুলে যেত তাদের দুঃখ বেদনার কথা।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র বালক ভগৎ সিং। বয়স বছর নযেক। সময়কাল ১৯১৬ সাল নাগাদ। ন' বছরের বালক সহপাঠীদের প্রশ্ন করত, 'তুমি বড় হযে কি করবে?' কেউ বলত, চাকরী, কেউ চাষাবাদ, কেউবা দোকানদারী। হঠাৎ হয়ত একজন বলল, 'আমি ভাই বিয়ে করব···।' ভগৎ শুনে লাফিয়ে উঠত, 'বিয়ে! বিয়ে করাটাও কি একটা বড় কাজ? আমি কখনো বিয়ে করব না। আমি, ইংরেজ তাড়াব। দেশ থেকে ইংরেজকে বার করে দেব।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কর্তার সিং সারাভা, রাসবিহারী বসু'দের নেতৃত্বে, 'গদর পাটির'[১৫] উদ্যোগে, ব্যাপক সৈন্যবিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বিশাল কর্মকাণ্ডের আয়োজন হয়েছিল, ভগৎ সিং-এর পরিবার তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সাংগঠনিক ও আর্থিক সহায্যের এক যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল ভগৎ সিং-এর পরিবার। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছাপ পড়েছিল বালক ভগৎ সিং-এর ওপর। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের যোগাযোগ সূত্রে বাড়িতে অঢেল পত্র পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকার সম্ভার ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র হলেও বালক ভগৎ সিং-এর ছিল এসব সম্ভারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। কাকা সরদার অজিত সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদ, লালা হরদয়াল প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের লেখা ছোট-বড় খান পঞ্চাশেক পুস্তক-পুস্তিকা পড়ে ফেলেন ভগৎ। এছাড়া পুরানো কাগজের বাণ্ডিল, যার মধ্যে লালা লাজপত রায় ও কাকা অজিত সিং-এর বিরুদ্ধে মামলার বিবরণ-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক মামলা-মকদ্দমার খবরাখবর থাকত; সে সবও পড়া হয়ে যেত তার। ফলে, বয়সে বালক হলেও, কথাবার্তা, বিচার-বিবেচনা, চাল-চলনে ভগৎকে মনে হোত বয়সের তুলনায় বড়। অস্বাভাবিক অধ্যয়ন তার বুদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের তুলনায অনেকটা বেশিই বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। স্কুলের শিক্ষকরা সস্নেহে ভগৎকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতেন অন্য ছাত্রদের কাছে। ভগৎ-এর মত হবার জন্য উৎসাহ জোগাতেন সকলকে। কেবল পড়াশুনাই নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলাবোধ, নিষ্ঠা, সকলের প্রতি মমতা, সর্ব বিষয়ে সহযোগিতা, এসব গুণের জন্য কেবল স্কুলেই নয়, গ্রামজুড়ে বালক ভগৎ সকলের ভালবাসা ও স্নেহ জয় করে নিয়েছিল।

ভগৎ সিং-এর ওপর পিতামহ অর্জন সিং-এর প্রভাবও কাজ করেছে। ঠাকুরদা 'আর্য সমাজী' সংস্কারবাদী আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন। ফলে, জন্মসূত্রে শিখ হওয়া সত্ত্বেও

আর্য সমাজী সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর দুই নাতি জগৎ ও ভগৎ সিং-কে প্রচলিত প্রথামাফিক যজ্ঞোপবীত শুদ্ধির কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু পৈতার কাজ শেষে দুজনকে দুইহাতে নিয়ে তিনি সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমি এই পবিত্র যজ্ঞবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার এই দুই বংশধরকে দেশের বলিবেদীতে অর্পণ করছি।' নিজের তিন ছেলে, কিষেণ সিং, অজিত সিং ও স্বর্ণ সিং-কে দেশমাতৃকার চরণে বলি দিয়েও পিছু হটেননি ঠাকুরদা অর্জন সিং। নয়াযুগের নবজাতকদেরও একই কাজে উৎসর্গ করেছেন বিনা দ্বিধায়, বিনাসঙ্কোচে। এর এক বিশাল প্রভাব পড়েছে বালক ভগৎ-এর ওপর। বড় ভাই জগৎ সিং অবশ্য মাত্র এগার বছর বয়সেই তার স্বল্পজীবন শেষ করে। পরিবারে তাই ভগৎ-ই হয়ে ওঠে যেন বড় ছেলে।

লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির অপেক্ষায় বন্দী থাকাকালীন সময়ে, ভগৎ সিং স্বাধীনতা সংগ্রামী অপর এক নেতা বাবা রণধীর সিং-এর বিদ্রুপাত্মক উক্তির উত্তরে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'কেন আমি নাস্তিক'। সে সময়টা ছিল ১৯৩০-৩১ সাল। এই গ্রন্থে পাওয়া যায় সেই সময়কার ঘটনা সম্পর্কে ভগৎ সিং-এর নিজের বর্ণনা। 'আমার ঠাকুরদার প্রভাবে আমি গড়ে উঠেছি। তিনি ছিলেন গোঁড়া আর্য-সমাজী। আর্য-সমাজীরা ঈশ্বর বিশ্বাসী। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আমি লাহোরের ডি. এ. ভি. স্কুলে ভর্তি হই এবং স্কুলের বোর্ডিং বাড়িতে টানা এক বছর থাকি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যের প্রার্থনা ছাড়াও আমি ঘন্টার পর ঘন্টা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতাম। সে সময় আমি ছিলাম গোঁড়া ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত। কিন্তু পরে আমি বাবার কাছে থাকতাম। ধর্মের গোঁড়ামি সম্পর্কে বাবা ছিলেন উদার মনের মানুষ। তাঁরই শিক্ষায় আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজের জীবন উৎসর্গ করায় উচ্চাভিলাষী হই। কিন্তু বাবা নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী। তিনিও প্রতিদিন ঈশ্বর আরাধনার জন্য আমাকে উৎসাহিত করতেন। এইভাবেই আমি বড় হয়ে উঠি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমি ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হই। এইখানেই আমি বিভিন্ন ধর্মীয় সমস্যা সম্পর্কে উদার ভাবে চিন্তা করা, আলোচনা করা এমনকি ঈশ্বর সম্পর্কে সমালোচনা করাও শুরু করি। কিন্তু, তখনও আমি একজন ধর্মপ্রাণ ঈশ্বর বিশ্বাসী। সেই সময় থেকেই আমি না ছেঁটে, না কেটে, লম্বা চুল রাখতে থাকি। কিন্তু, শিখধর্মসহ কোন ধর্মেরই মতবাদ, উপদেশ আর পৌরাণিক তত্ত্বের ওপর কোন বিশ্বাস রাখতে পারিনি। যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার প্রত্যয় ছিল দৃঢ়।'

ঘটনার পরিবর্তন, পারিপার্শ্বিকতা, নতুন চিন্তা ও জ্ঞানের সংস্পর্শে এসে একদিন (১৯২৬ সাল নাগাদ) এই ভগৎ সিং-ই হয়ে ওঠেন তাঁর নিজের কথায় একজন, 'সোচ্চার নাস্তিকতাবাদের প্রচারক।' সে অনেক পরের কথা।

কিষেণ সিং লাহোরের কাছেই কিছু জমি কিনেছিলেন। সেখানে কাজকর্ম শুরু হতে বেশিরভাগ সময় তিনি লাহোরেই থাকতেন। বংগা গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পাশ করে

'কি হবে এই বন্দুক দিয়ে ?' মেহতাজী জানতে চাইলেন।

'দেশের মুক্তি।'

'তোমার ধর্ম কি ?' আর এক ধাপ এগিয়ে প্রশ্ন করলেন মেহতাজী।

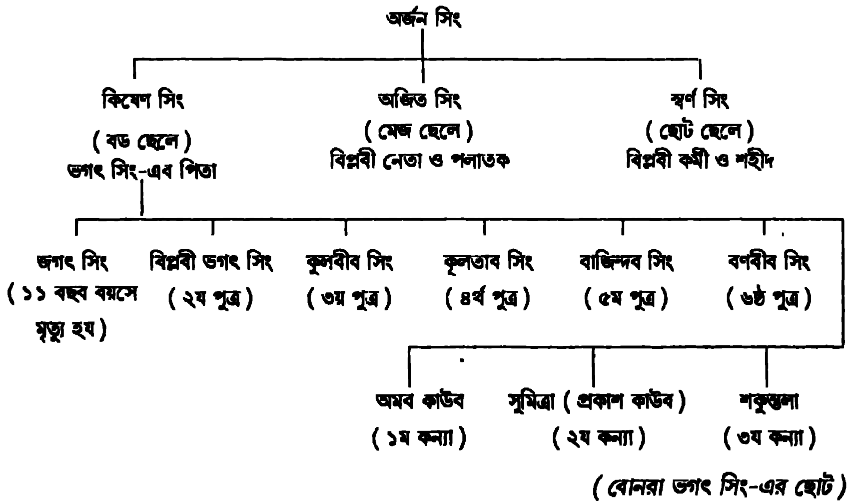
'দেশপ্রেম।' শিশু ভগৎ সিং-এর উত্তর।

মেহতাজী সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বন্ধু কিষেণকে বললেন, 'আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার এই শিশুপুত্র সারা দুনিয়ায় নাম ও খ্যাতি অর্জন করবে। দেশের ইতিহাসে এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

পিতামহ, পিতা, পিতৃব্যদের যে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের ঐতিহ্য এবং বংশধারায় ভগৎ সিং-এর জন্ম, তাতে গল্পের মত শুনতে লাগলেও, এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ভারতের মুক্তিযজ্ঞে আহুতি দেবার জন্যই যেন কয়েক যুগ ধরে বংশধারার মহান ঐতিহ্যে যজ্ঞবেদী তৈরি করেছিল ভগৎ সিং-এর পূর্বপুরুষরা।

ভগৎ সিং সে বংশের সর্বোৎকৃষ্ট আত্মাহুতির গর্ব।

বংশতালিকা



৪

জীবন সূচনা ও শিক্ষা

(১৯০৭-১৯২৪)

ভগৎ সিং-এর ডাকনাম ছিল 'ভাগনওয়ালা'। যার অর্থ ভাগ্যবান, সৌভাগ্যের প্রতীক।

ভগৎ সিং-এর জন্মের সময় বাবা কিষেণ সিং ছিলেন লাহোর জেলে বন্দী। ঔপনিবেশিক আইন বা 'কলোনাইজেসন বিলে'র বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়ে তাঁর এই শাস্তি জোটে। কাকা, প্রখ্যাত বিপ্লবী অজিত সিং ছিলেন সুদূর মান্দালয (বার্মায) জেলে। আর এক কাকা, স্বর্ণ সিং-ও ছিলেন জেলে। ভগৎ সিং-এর জন্মকালে ৫০,০০০ টাকার জামিনে মুক্তি মেলে কিষেণ সিং-এর। একই সময়ে জামিনে মুক্তি পান কাকা স্বর্ণ সিং। দু'একদিনের মধ্যেই তাঁরা বাড়ি ফিরে আসেন। অপরদিকে, মান্দালয় জেল থেকে বিপ্লবী অজিত সিং-এরও মুক্তির তাববার্তা পৌঁছয় বাড়িতে। ভগৎ সিং-এর জন্মলগ্নে, একের পর এক ঘটে যায় এই শুভ যোগাযোগ। সবদিকের প্রসন্ন ভাগ্যের প্রতীক হয়ে ওঠেন শিশু ভগৎ সিং। ঠাকুরমা আদর করে নামকরণ করেন বংশের ভাগ্যবান সন্তান, 'ভগনওয়ালা'। সকলের পরম আদরের 'ভগনওয়ালা'। আর এই নাম থেকেই পরবর্তীকালে তাঁর নামকরণ হয়, ভগৎ।

শিশু ভগৎ সিং তাঁর বড়ভাই, জগৎ সিং-এর সঙ্গে তাঁর জন্মস্থান বংগা গ্রামের জেলা বোর্ড প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন ১৯১১-১২ সাল নাগাদ। দু'ভাই-এর শিক্ষা চলতে থাকে একই স্কুলে একই সঙ্গে। দুই ভায়ের আচার-আচরণ, কথাবার্তা সকলের থেকে ভিন্ন। ঠাকুরদা অর্জন সিং-এর উদার সংস্কারবাদী চিন্তা-চেতনার পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে দুই ভাই। শিশুকাল থেকেই এর ছাপ পড়তে থাকে এদের চরিত্রে।

স্কুলের পাঠ তৈরি করা, হাতের লেখা অভ্যাস করা, খেলাধূলা করা, সবকিছুতেই শিশু ভগৎ সিং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সকলের মাঝে সে তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন করে নেয়। শিক্ষকদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানান, সহপাঠীদের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির উদার আচরণে ছোট-বড সকলের মন জয় করে নেয় ভগৎ সিং।

সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় ভগৎ সিং-এর জুড়ি ছিল না ঐ বয়সেই। স্কুলের সমবয়সী ও বড়দের সঙ্গে তো বটেই, এর বাইরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশারও তার ছিল এক অপূর্ব সহজাত ঢং। গাঁয়ের বুড়ো দর্জি তার জন্য জামা বানিয়ে এনেছে, মহানন্দে ছোট্ট ভগৎ সিং বলতে শুরু করেছে, 'এই দেখ, ইনি আমার বন্ধু দর্জি, আমার জন্য জামা বানিযে এনেছেন'। এমনি, যে কেউ তাকে আদর করে, ভালবেসে যা কিছুই দিত, ভগৎ তার বালক-সুলভ চপলতা ও আনন্দের সঙ্গে বলত, 'এই দেখ, এ আমার বন্ধু, আমাকে এটা দিয়েছে।' বাড়ির লোক হাসতে হাসতে বলত, 'এ লোক, ওলোক কেন, তোমার তো দেখছি সারা গাঁয়ের লোকই বন্ধু!' ভগৎ এ রসিকতায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হযে গর্বের সঙ্গে বুক চাপড়ে বড় মানুষদের মত জবাব দিত,'হ্যাঁ, সারা গাঁয়ের মানুষই আমার বন্ধু।' বালক ভগৎ-এর কথা শুনে সকলে মজা পেয়ে হাসত।

বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে, পরিবারের মধ্যে যেসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, বালক ভগৎ সিং শিশুবয়স থেকেই তাকে লক্ষ করতে থাকে। পিতা, পিতৃব্যদের ওপর নির্যাতন, আর পরিবারের মানুষদের ওপর

রাজী নয়। জোর দিয়ে বললেন, 'মোটেই না। এসব ধাপ্পাবাজীর কথা। আমাদের সমাজের উচিত ছিল এই বৃদ্ধের দেখভাল করা, তার খাদ্য, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।' জয়দেব সমস্যা সমাধানে তার কিশোর সুলভ সহজ নিদান দিল, 'ভগবানকে ডাকতে হবে।' কিন্তু ভগৎ এই নিদানে বিশ্বাসী নয়, সে বলল, 'চোখ বন্ধ করে মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করে এ কাজ হবে না।'

নাস্তিকতার পর্যায়ে না এলেও, কিশোর ভগৎ সিং-এর মানুষের প্রতি ভালবাসা, ও ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত, যত সামান্যই হোক, একপ্রকার সামাজিক বোধের প্রভাব, কাজ করছিল তাঁর ওপর, ঐ বয়সেই।

রাওলাট এ্যাক্ট ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড :

যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, ভগৎ সিং-এর সেই সময়ের জীবন এগিয়ে চলেছিল, তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত হওয়া যেতে পারে। ১৯১৪ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। এই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থ ছিল গায়ের জোবে বিশ্ববাজার দখল করা এবং দখলদারীকে আরও মজবুত করা। বিশ্বযুদ্ধের ফলস্বরূপ ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর নেমে এসেছিল ভয়াল পরিণতি। বিপরীত দিকে ভারতের শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধির পথ তথা আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার সুযোগও খুলে গিয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী নেতারা ইংরেজ শাসকদের কাছে 'হোমরুল', 'স্বরাজ' তথা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চেয়ে আবেদন নিবেদন রেখেছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রাম, বিদ্রোহ তথা সন্ত্রাসের পথে মুক্তির আশাবাদীরা নিস্ফল 'অ্যাকসন' করে অবস্থার চাপে নিস্ক্রিয় হয়েছিলেন।

কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমস্ত হিসেবকে উল্টে-পাল্টে দিযে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯১৭ সালে জন্ম নিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অনুপ্রেরণা পেল এর থেকে। আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বৃটিশ রাজশক্তি ভারতীয়দের আর্থিক ও মানবসম্পদ, যেমন: ব্যাপকহারে ভারতীয়দের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধজয়ের আশুলক্ষ্যে, ভারতীয়দের যুদ্ধশেষে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের একটা বড অংশ এই আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস রেখে সর্বতোভাবে বৃটিশ শক্তিকে সাহায্য দিয়েছিলেন। যেমন গান্ধীজী গুজরাটের খেদা জেলায় ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক গ্রাম থেকে কম্‌সে কম কুড়ি জন সমর্থ মানুষকে বৃটিশ যুদ্ধবাহিনীতে যোগ দেবার আহ্বান জানান। তিনি এই আহ্বানকে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে বলেন, 'Sacrifice for empire and swaraj'। গান্ধীজীর জীবনীকার টেণ্ডুলকর এই সময়ের গান্ধীজীকে 'Recruitment Sergeant' আখ্যা দেন।

কিন্তু যুদ্ধশেষে সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলতে সময় লাগল না বৃটিশ রাজশক্তির। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার উন্নতি, তথা সংস্কারের উদ্দেশ্যে সেক্রেটারী অব স্টেট্ মিঃ মণ্টাগু ও

তদানীন্তন গাভার্নর জেনারেল চেমস্ফোর্ড ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে একটি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট জমা দেন বৃটিশ সরকারের কাছে। এরই ভিত্তিতে তৈরি হয় মন্টাগু-চেমস্ফোর্ড শাসন সংস্কার আইন। স্বায়ত্তশাসনের নামে এটা ছিল লোক ঠকানো 'দ্বৈত শাসন' (Diarchy)। আসল শাসনক্ষমতা বৃটিশ রাজশক্তির হাতেই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছিল। মাঝখান থেকে ভারতের বিত্তশালী শ্রেণীগুলিকে কিছু সুবিধা এবং আইনসভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা, বৃটিশের ভেদনীতিকেই শক্তিশালী করেছিল।

বিশ্বপরিস্থিতি ও ভারতেব বুকে ধূমায়িত রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও আন্দোলন সম্পর্কে আতঙ্কিত বৃটিশ রাজশক্তি, এই লোক ঠকানো আইনী সংস্কাবের পাশাপাশি, পাশবিক দমন-পীড়নের ব্যবস্থাকে পাকা কবতে, চালু করল নয়া দমন-নীতি। বৃটিশ বিচাবপতি রাওলাটের নেতৃত্বাধীন কমিটি ভারতে বৃটিশ বিবোধী কার্যকলাপ দমন ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব বিরুদ্ধে নির্যাতন তীব্র করার জন্য যে প্রস্তাব করেছিল, তারই ভিত্তিতে তৈরি আইনই 'রাওলাট এ্যাক্ট' বা বিধি হিসেবে আইনে রূপান্তবিত হয়ে, ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ থেকে চালু হল। এই আইনে যে কোন সাধারণ রাজনৈতিক কার্যকলাপকেই বেআইনি ও দেশদ্রোহিতা বা রাজদ্রোহিতা বলা হল। সংবাদপত্রেব মুখ বন্ধ করা হল। যথেচ্ছভাবে দণ্ড বা শাস্তিদান চলল। শাস্তিস্বরূপ যথেচ্ছ নির্বাসনের ব্যবস্থা হল।

পরাধীন দেশেব মানুষও এর বিরুদ্ধে যোগ্য উত্তব দিতে প্রস্তুত হল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে, গান্ধীজী সেই সময় কংগ্রেসী কার্যক্রমকে সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছাকাছি নিযে এসেছিলেন ; তাঁব নানান জনমুখী এবং আন্দোলনমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে। সাধারণ মানুষকে সক্রিযভাবে বাজনীতির ময়দানে হাজির কবাবার কৃতিত্বের স্বাক্ষর, সেইসময় একমাত্র তিনিই বেখেছিলেন। 'রাওলাট এ্যাক্ট' বিবোধী আন্দোলনেও গান্ধীজীর যোগদান ও নেতৃত্ব এক নবযুগেব সূচনা কবে।

গান্ধীজীব সঙ্গে বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ চব্বিশজন রাওলাট আইন বিরোধী নেতৃবৃন্দ এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন। গান্ধীজীকে সভাপতি করে এক 'সত্যাগ্রহ সভা' গঠিত হয়। এই সভার ডাকে সারা ভারতে এক দিনের হরতাল পালনের আহ্বান জানান হয। হরতালের দিন ছিল ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল। সারা ভাবতে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন জাযগায় হরতালকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয। দিল্লীতে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশেব গুলি চলে। আন্দোলন ধীরে ধীরে সহিংস আকার নিতে থাকে। গান্ধীজী আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করেন, আন্দোলনে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদের ফলে তাঁর নেতৃত্বের আন্দোলন, তাঁরই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ফলে, তিনি আন্দোলনের ঐরকম এক উচ্চ পর্যায়ে, তুঙ্গে ওঠা অবস্থাতে, তাকে স্থগিত ঘোষণা করে দেন।

কিন্তু প্রবল বেগে ধাবমান নদীর বেগকে সামলান মুস্কিল। হরতাল পালনের এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবে বিক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। এই বিক্ষোভ দমনে বৃটিশের

অত্যাচার, তাণ্ডবলীলার এক ভয়াবহ ইতিহাস রচনা করে। কয়েক শত ছাত্রের শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণ চলে। অমৃতসরের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার, লাহোর আর কাসুরের পুলিশী আক্রমণকে ম্লান করে দেয়। বিনা প্ররোচনায়, পাঞ্জাবের বিশিষ্ট জননেতা ডঃ সত্যপাল এবং ডঃ কিচলুকে অন্তরীণের আদেশ দেওয়া হয়। ফলে প্রতিবাদ, বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে অমৃতসর শহর। এইসময় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার সামরিক আইন জারি না করেই অসামরিক কর্তৃত্ব তার নিজের হাতে নিয়ে নেয। নিপীড়ন, নির্যাতনের বাঁধ খুলে দেয় কুখ্যাত জেনারেল ডায়ার।[১৭]

জালিয়ানওয়ালাবাগ :

পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে, পবিত্র শিখ ধর্মস্থান স্বর্ণমন্দিরের খুব কাছেই, এই জালিয়ানওয়ালাবাগ। চারদিকে বাড়ির দেওয়াল ঘেরা, উঁচু নীচু পরিত্যক্ত একখণ্ড চতুর্ভুজ আকারের জমি ছিল এটা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী 'লন্ডন টাইমস' পত্রিকার সাংবাদিক বেলেনটাইন কিরোল বলেছেন, 'কোন সময়ে এটা একটা বাগান বা বাগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই পরিত্যক্ত ভূমিখণ্ড জলসা, সভা, মেলা ইত্যাদির জন্য ব্যবহার হোত। ···এখানে ঢোকার রাস্তা ছিল একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথ। জমিতে ছিল তিনটে গাছ, একটা জীর্ণ শীর্ণ সমাধি, আর একটা কুঁয়া। ঐ জমিতে ঢোকা বা বেরনোর জন্য ঐ সরুগলি ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না।'

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অত্যাচার, নিপীডন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ জানাতে ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ সালে ঐ বাগে জমায়েত হয়েছিল কুড়ি (২০) হাজারের ওপর মানুষ। শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, মুশলিম, শিখ সর্বস্তরের মানুষ। দিনটি ছিল রবিবার। পবিত্র বৈশাখী উৎসবের দিন, আর একই সঙ্গে শিখ খালসা দিবস। সমবেত জনতার জমায়েতের উদ্দেশ্যই ছিল অত্যাচারী জেনারেল ডাযারের বিরুদ্ধে এই ঘোষণা করা—যে, তার অত্যাচারে আন্দোলন স্তব্ধ হবে না। আন্দোলন এবং লড়াই চলবে।

বিকেল চারটে নাগাদ জেনারেল ডায়ার নব্বই (৯০) জন সিপাই, রাইফেল, মেসিনগান- সহ ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে মার্চ করতে করতে জালিয়ানওয়ালাবাগে পৌঁছায়। ডায়ার পৌঁছবার আগে একটা হাওয়াই জাহাজ ঐ বাগের ওপর কিছুক্ষণ চক্কর মেরে নিরীক্ষণ করে যায়। ডায়ার সৈনিকদের পঁচিশ (২৫)—পঁচিশ (২৫) জন করে উত্তর দিকের উঁচু জমিতে, ডাইনে ও বাঁয়ে দুটি সারিতে পজিসন নেবার হুকুম দেয়। তখন পুরোদমে সভা চলছিল। নেতারা বক্তৃতায় ব্যস্ত। শ্রোতারা গভীর ভাবে মগ্ন। আচমকা ঘটে যায় ঐতিহাসিক বর্বর ঘটনাটা। ডায়ার অর্ডার দিতেই, একনাগাড়ে গুলি চলতে থাকে। টানা দশ মিনিট গুলি চলে। ১৬৫০ রাউন্ড গুলি শেষ হতে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ চলে গুলিবর্ষণ। গুলি চলার সময় ডায়ার নির্দেশ দেয়, যেখানে ঘন ভীড় সেদিকে

গুলি চালাতে। যেখান দিয়ে মানুষ পালাবার চেষ্টা করছে সেদিকে নিশানা করতে। যেখানে অসহায় মানুষ মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে তাকে হত্যা করতে। এক বর্বর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলে ঠাণ্ডা মাথায়, পরিকল্পিতভাবে।

পরবর্তীকালে গঠিত বৃটিশ তদন্ত কমিশনে, লর্ড হান্টার, জেনারেল ডায়ারকে প্রশ্ন করেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগে পৌঁছে আপনি কি করলেন' ? ডায়ার জবাব দেয়, 'তৎক্ষণাৎ গুলি চালিয়ে দিই।'

হান্টার—'তৎক্ষণাৎ ?'

ডায়ার—'এই সম্বন্ধে আমার আগেই চিন্তা করা ছিল, কি আমার কর্তব্য। ৩০ সেকেণ্ডের সময় লাগে সেটা করতে।'

হান্টার—'গুলি চালাবার আগে আপনার একথা মনে আসেনি যে লোকজনকে চলে যাবার জন্য হুঁশিযারী দেওয়া উচিত ?'

ডায়ার—'না। আমি এসময় কেবল এটাই ভেবেছি যে আমার আদেশ অমান্য করা হয়েছে। লোকেরা সামরিক-আইন মানেনি। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালনাটাই ছিল আমাব কর্তব্য।'

হান্টার— 'কিন্তু নিযমানুসারে মার্শাল-ল (সামরিক-আইন) ঘোষণা হয়নি। ফলে, শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যে জেলা কমিশনারের ওপর, তাব সঙ্গে পরামর্শ করাটা কি আপনি কর্তব্য মনে কবেছিলেন ?'

ডাযার—'ঐ সময় পরামর্শ করার জন্য কোন জেলা কমিশনার ছিলেন না। তাছাড়া আর কারও সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করাটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়নি আমার।'

হান্টাব—'গুলি চালাবার উদ্দেশ্য কি ছিল লোকজনকে বাগ থেকে তাড়ান ?'

ডায়ার—'না মহাশয়। আমি ততক্ষণই গুলি চালিযে যেতে চেয়েছিলাম যতক্ষণ না সব লোকেরা ওখান থেকে চলে যায়।'

হান্টার—'কিন্তু গুলি চালাবার পর লোকেরা যখন পালাতে থাকে, তখন আপনি গুলি চালান বন্ধ করলেন না কেন ?'

ডায়ার—'তাহলে তো গুলি চালাবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হোত।'

গুলি চালাবার আসল উদ্দেশ্য ছিল, ডায়ারের নিজের কথায়, 'To strike terror into the whole of Punjab।' ঘটনাস্থলেই প্রায় হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ডায়ারের একমাত্র অনুশোচনা ছিল, বাগে ঢোকার পথটা সরু হওয়ায় সাঁজোয়া গাড়ি, মেসিনগান ইত্যাদি ভেতরে ঢোকান যায়নি!

১২ বছরের কিশোর ভগৎ সিং :

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল যখন অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস গণহত্যা হয়, তখন ভগৎ সিং-এর বয়স ১২ বছর। লাহোরের দয়ানন্দ এ্যাঙ্গলো বিদ্যালয়ের (ডি.এ.ভি) ক্লাস সেভেনের ছাত্র। পরদিন যথারীতি ভগৎ স্কুলে যাবার জন্য বাড়ি

থেকে রওনা হন। কিন্তু সময় মত, স্কুল ছুটির পর তাঁকে বাড়ি ফিরতে দেখা গেল না। চারদিকে আতঙ্ক। অশান্ত বাতাববণ। বাড়ির সকলের দুশ্চিন্তা, ছেলে সময়মত ঘরে না ফেরায। আসলে, ভগৎ সেদিন বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার নাম করেই বেরিয়ে ছিলেন, কিন্তু স্কুলে যাননি। লাহোর থেকে অমৃতসরেব দূরত্ব খুব বেশি নয়, ৫০ / ৬০ কিলোমিটারেব মত। ভগৎ বাসে চেপে চলে এলেন অমৃতসরে। লক্ষ্য জালিয়ানওয়ালাবাগ। বাগে ঢুকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে বইলেন বাগের দিকে, যেখানে মাটি রাঙা হয়ে আছে হাজার হাজার মানুষের রক্তে। শ্রদ্ধা ভক্তিতে সেই পবিত্র রক্তে রাঙা মাটি তুলে নিলেন হাতে। মাথায ঠেকালেন সেই পবিত্র মাটি। দু-চোখ ফেটে জলের ধারা নেমে আসতে চাইল তাঁর চোখে। কিন্তু পবিত্র রক্তে রাঙা মাটিতে চোখেব জল ফেলতে দিলেন না কিশোর ভগৎ সিং। শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ পবিত্র রক্তে রাঙা মাটির কিছুটা সংগ্রহ করলেন একটা শিশিতে। তাঁব মন প্রাণজুড়ে এক প্রতিজ্ঞার শব্দ উচ্চাবিত হল, 'বলিদান, চাই বলিদান'।

ভাবলে বিস্ময লাগে, কোন স্তরের আবেগ ও সাহস থাকলে তবে ঐ অবস্থায লাহোর থেকে অমৃতসরে এসে জালিযানওযালাবাগে পৌঁছন যায। তখন সারা অমৃতসব শহর জুড়ে চলছিল ভয, ভীতি ও সন্ত্রাস। যথেচ্ছ অত্যাচার, জুলুম ও গুলি চলছিল। কে, কখন, কোন অবস্থায, গুলিব নিশান বনে যাবে তাব কোন ঠিক ছিল না। অথচ এই ভযাবহ অবস্থার মধ্যে সামান্য ১২ বছবের এক কিশোর কোন কিছুর পবোযা না কবে, একা চলে এল অমৃতসর শহরে, ঢুকল জালিযানওযালাবাগে, সংগ্রহ কবল পবিত্র খুনে রাঙা মাটি। এ যেন অসামান্য ভগৎ সিং-এর পক্ষেই সম্ভব।

বাড়ি ফিরতেই ছোট বোন অমর কাউর ভগৎ-এর কাছে ছুটে গিযে প্রবল আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই আজ তুমি বাড়ি ফিরতে এত দেরি করলে কেন? তোমাব ভাগের খাবার, ফল সব আমি রেখে দিযেছি আমার কাছে, এস খাবে এস।' ভগৎ সিং উদাস। তার মুখে কোন কথা নেই। বোন ঘাবড়ে গিযে প্রশ্ন করল, 'ভাই, কি হযেছে? তোমাব শরীর খারাপ?' ভগৎ গম্ভীরভাবে উত্তব দিলেন, 'খাবার কথা বোল না আমাকে। এস তোমাকে একটা পবিত্র জিনিস দেখাই।' শিশিতে ভরা বক্তে রাঙা মাটি দেখিযে ভগৎ বললেন, 'দেখ ইংরেজবা আমাদের কত মানুষকে খুন করেছে। দেখ তাদেরই রক্তে রাঙা মাটি। এ পবিত্র মাটি।'

ঐ রক্তে রাঙা মাটিকে ফুল-মালা দিযে নিয়মিত শ্রদ্ধা জানাতেন ভগৎ সিং। খুনী ইংরেজের বিরুদ্ধে, জাতীয় অপমানের প্রতিবিধান করতে, প্রতিশোধ নিতে এবং 'বলিদানের' নিয়ত শপথ বাক্য দিয়ে নিজের মধ্যে শক্তি সাহসকে সর্বদা প্রজ্বলিত রাখতে; জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তে রাঙা ঐ পবিত্র মাটি, তাঁকে দীর্ঘদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিযেছে।

অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ :

সময়টা ছিল ১৯২১ সাল। ভগৎ তখন ১৪ বছরের কিশোর। স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র।

এইসময় বাওলাট এ্যাক্ট, সমগ্র পাঞ্জাবসহ জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস গণহত্যা, তুরস্কের সুলতান খলিফার কর্তৃত্ব ও অধিকার বৃটিশ রাজশক্তির কাছে পদদলিত হওয়ায় বিক্ষুব্ধ মুশলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্তভাবে হিন্দু-মুশলিম ঐক্যবদ্ধ 'খিলাফৎ' আন্দোলন, ইত্যাদি ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবল প্রতিক্রিযা সৃষ্টি করে। এরই পরিণতি গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলনেব নেতৃত্ব সাত দফা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এগুলো হল, সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান, সরকারের মনোনীত সদস্যদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা থেকে পদত্যাগ, সমস্ত জাঁকজমকপূর্ণ সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারী পবিচালনাধীন স্কুল কলেজ বযকট, উকিল ও মামলাকাবীদেব বৃটিশের আদালত বয়কট, মেসোপটেমিযায় বৃটিশ সামরিক চাকুরি প্রত্যাখ্যান এবং আইনসভার নির্বাচন ও বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বযকট।

আন্দোলন শুরু করার আগে গান্ধীজী বাঙ্গলায আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে সশস্ত্র বিপ্লববাদে বিশ্বাসী নেতাদের একাংশের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন আহ্বান কবে প্রতিশ্রুতি দেন যে, এক বছবের মধ্যে যদি তিনি দেশে স্বরাজ আনতে না পারেন তাহলে বিপ্লবপন্থীরা তাদের নিজস্ব পথে স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন। এতে তাঁর কিছু বলার থাকবে না। বিপ্লব পন্থায বিশ্বাসীরা তাঁর প্রস্তাবে সমর্থন জানান ও একমত হন।

ধীরে ধীবে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি করে। ভারতের সাধারণ মানুষ ব্যাপক গণআন্দোলনের জন্য যেন তৈরি হযেই ছিল। ১৯২১-এর জুলাই মাসে গান্ধীজী বোম্বাই (বর্তমান মুম্বই) শহরে বিদেশী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলার বহ্ন্যুৎসবে নেতৃত্ব দেন। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, শিল্পাঞ্চলে মেহনতি মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে খাজনা বন্ধ করা, শিল্প ধর্মঘট, উদ্বৃত্ত জমি দখল সহ সরকারী বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নেমে পড়ে। যদিও অসহযোগের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না এসব গণমুখী আন্দোলন। তবু আন্দোলনের প্রবল জোয়ার সব কিছুকে ভাসিয়ে নিযে যায।

১৪ বছরের কিশোর ভগৎ সিংও প্রবল ভাবে প্রভাবিত হন এই আন্দোলনে। মনে মনে স্থির করেন অসহযোগে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবেন। কিন্তু বাবা কিষেণ সিং-কে না জানিয়ে এ কাজে নামা মুস্কিল। সরাসরি বাবার কাছে এ প্রস্তাব পেশ করতে দ্বিধাবোধ হওয়ায়, বন্ধু জয়দেব গুপ্তাকে পাঠালেন। কিষেণ সিং-এর অনুমতি মিলল। মহানন্দে স্কুল ছেড়ে ভগৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবী দলে নাম লেখালেন। কিষাণ পরিবাবে জন্ম। ফলে ঘরে সূতো কাটা, খদ্দরের প্রচলন আগে থেকেই ছিল। স্বদেশীয়ানা তাঁকে তেমন আকর্ষণ করল না। কিন্তু, ঐ যে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব, সেটা তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। নিজের বয়সের ছেলেদের নিয়ে তিনি দল বেঁধে ফেললেন। ঘবে ঘরে আবেদন করে বিদেশী বস্ত্রসামগ্রী সংগ্রহ করতে থাকলেন। তারপর মিছিল করে রাস্তার মোড়ে ঐ বিদেশী জিনিস পোড়াবার কাজ চালাতে থাকলেন সভা করে, মহা ধূমধামের সঙ্গে।

দলের বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখত যেখানে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ঐ বিদেশী বস্ত্রসামগ্রী সংগ্রহ অভিযানে ঝগড়া, মনকষাকষি হতো ; লোকেরা তাদের হাতে সেসব তুলে দিতে অস্বীকার করত, কিশোর ভগৎ সিং-এর মধুর ব্যবহার, তার আবেদন ও বক্তব্য প্রকাশের মাধুর্যে মোহিত হয়ে মানুষ নিজ থেকেই সাড়া দিত। দলে দলে বস্ত্র সামগ্রী তুলে দিত ভগৎ-এর কাছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভগৎ-এর হাতেখড়ি হয়েছিল পরবর্তী সংগ্রামের। এলাকার মানুষের কাছে ও সাথীদের কাছে সহজভাবে স্বীকৃত হল ভগৎ-এর সংগঠন শক্তি, তেজস্বিতা ও ব্যবহার-পটুতা। সর্বোপরি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা সকলকে মুগ্ধ করল।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনই গান্ধীজী এর রাস টেনে ধরলেন। আন্দোলনের বিস্তার ও ব্যাপকতা এমনিতেই তাঁর কল্পনার বাইরে চলে গিয়েছিল। তিনি যেন অপেক্ষা করছিলেন অসহায়ভাবে। ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামের আন্দোলনকারী কৃষক জনসাধারণের ওপর পুলিশী গুলি বর্ষণে উত্তেজিত কৃষকরা থানা আক্রমণ করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বাইশজন পুলিশের মৃত্যু হয় এ ঘটনায়। সমগ্র অসহযোগ আন্দোলনের ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরিকল্পিতভাবে যে নৃশংস গণহত্যা, দমন পীড়ন আর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল তার তুলনায় এই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা দুর্ঘটনা কোন হিসেবের মধ্যেই আসার কথা নয়। কিন্তু গান্ধীজী এই ঘটনার অজুহাতেই দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই বিশাল গণআন্দোলনকে স্থগিত করে দিলেন। আন্দোলন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে সর্বস্তরে প্রবল প্রতিবাদ সোচ্চারিত হল। বৃটিশ জেলে আটক থাকা অবস্থায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ জাতীয় নেতারা গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু গান্ধীজী বললেন, 'এটা একটা হিমালয়-প্রমাণ বেহিসেবী কাণ্ড' ('Himalayan miscalculation') এবং এতেই অচল, অনড় থেকে, গঠনমূলক কাজ—যেমন চরকায় সূতা কাটা, অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি কর্মসূচী নেবার উপদেশ দিলেন।

গণআন্দোলনের প্রভাবে উৎসাহিত হয়ে ১৪ বছর বয়সের ভগৎ, তাঁর ঠাকুরদাকে লেখা ১৪ই নভেম্বর ১৯২১ সালের এক চিঠিতে উল্লেখ করলেন তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রেল শ্রমিকদের আসন্ন ধর্মঘটের কথা। আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের ওপর মালিক ও বৃটিশ সরকারের যৌথ আক্রমণের প্রতিবাদে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মচারীরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই ঘটনা সম্পর্কে ঠাকুরদাকে পত্র মারফৎ অবহিত করেন ভগৎ সিং।

পত্রটি এইরকম :

"ওঁম"

"আমার পূজনীয় দাদা সাহাবজী (ঠাকুরদা),

"নমস্কার। এখানে আমরা কুশলে আছি। প্রার্থনা, শ্রীপরমাত্মাজীর কৃপায় আপনারাও

ভাল এবং কুশলে আছেন। সময়মত আপনাদের পত্র পাই না। এর কারণ কি? ভাই কুলবীর সিং ও কুলতার সিং-দের কুশল সংবাদ যথাসত্বর পাঠান।···অন্যরা কুশলে আছে। মাকে আমার প্রণাম জানাবেন। কাকিমাকে প্রণাম জানাই।···আমি একটা পুরোনো বই বেশ সস্তা দাম দিয়েই কিনেছি।

"ইদানিং, দেশে রেলওয়ে কর্মচারীরা হরতালের প্রস্তুতি গড়ছে। আশা করা যায় আগামী সপ্তাহের বাদেই তাড়াতাড়ি এই আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে।

"আপনার অনুগত
"ভগৎ সিং"

শিখ গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ :

১৯২২ সালে অসহযোগ, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত হয়ে গেলে ভগৎ সিং শিখ গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে বেশ কিছুদিন যাবৎ পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের কৃষক ও মধ্যবিত্তরা ধর্মীয় শুদ্ধি বা সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। এতে অবশ্য সন্দেহ নেই যে এই আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক শুদ্ধি আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ছিল শিখ মন্দির অর্থাৎ গুরুদ্বারগুলি থেকে অনাচার ও দুর্নীতি দূর করা। কিন্তু এ সত্ত্বেও আন্দোলনটা তার সীমিত ক্ষেত্রে এক উগ্র আমূল পরিবর্তন-সূচক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। গুরুদ্বারগুলি ছিল মোহন্তদের পৈতৃক বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। গুরুদ্বারে ভেট বা প্রণামী হিসেবে যে হাজার-হাজার টাকা সংগৃহীত হোত বা গুরুদ্বারের অন্তর্ভুক্ত জমি থেকে যে মোটা টাকা আয় হোত, সবটাই মোহন্তদের হাতে চলে যেত। গুরুদ্বারের সামাজিক সীমার মধ্যেই শিখ সম্প্রদায় বা সঙ্গতের কাছে এবং তাদের নির্বাচিত পঞ্চায়েতের হাতে সমস্ত অর্থ ও তার আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখা, এই ক্ষমতার আমূল পরিবর্তন ঘটানই ছিল এই সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী মোহন্ত এবং তাদের রক্ষক বৃটিশ সরকার চরম নির্যাতন চালাল এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ধ্বংস করতে। 'নানকানা সাহেব' গুরুদ্বারে ঘটল নির্মম হত্যাকাণ্ড। মোহন্তদের গুণ্ডাবাহিনী শয়ে-শয়ে শিখ উপাসনাকারীদের ওপর গুলি চালাল। সারা পাঞ্জাব জুড়ে শিখেরা অহিংস প্রতিরোধ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই আন্দোলনের পরিণতিতেই উদ্ভব হল 'অকালী' আন্দোলন, তথা 'অকালী' দলের।

শিখ সম্প্রদায় শেষে আন্দোলনে জয়যুক্ত হলেন। আন্দোলনের নেতারা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই এই বলে মজা পেতেন যে, তাদের এটা এক বিরাট সৌভাগ্য, এই আন্দোলনে হাত দেবার সুযোগ পাননি গান্ধীজী! তাহলে হয়ত এটাও স্থগিত হয়ে যেত!

ভগৎ সিং-এর সাথী যশপাল, তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে ('সিংহাবলোকন') লিখেছেন, "১৯২২ সালে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন স্থগিত হয়ে গেলে ভগৎ সিং গুরুদ্বার আন্দোলনে অংশ নিতে আসেন। আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তিনি মাথার চুল বড় রাখেন। 'অকালী'-

ভুক্ত হয়ে মাথায় কালো পাগড়ী ও কৃপাণ রাখতে থাকেন। কিন্তু এগুলির কোনটাই ধর্মীয় আস্থা বা বিশ্বাস থেকে নয়। এই আন্দোলন ছিল তাঁর কাছে বিদেশী সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন। ওই সময় আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য অনেক হিন্দু যুবকও শিখ এবং অকালী বনে গিয়েছিল। কালো পাগড়ী একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ায়। কৃপাণ বা তলোয়ারের ওপর ভগৎ সিং-এর আকর্ষণ ছিল এই কারণে যে ইংরেজ সরকার এটা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু শিখেরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, হাতে তিনফুট লম্বা খোলা তলোয়ার নিয়ে, 'কৃপাণ আন্দোলন' চালিয়েছিল এবং সরকারী আইন অমান্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল।"

পরবর্তীকালে, লাহোর ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হয়েও, কিছুদিন ভগৎ সিং কালো পাগড়ী এবং তলোয়ার ব্যবহার করতেন। তারপর ধীরে ধীরে সে-সব ত্যাগ করেন। গুরুদ্বারা আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও জাতিগত অহঙ্কার জেগে ওঠায় ভগৎ সিং সহ পাঞ্জাবের নবযুবক শ্রেণী অকালী সংগঠন সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এই সময় তিনি কখনো গুরুদ্বারে যেতেন না। শিখ ধর্মমত সম্পর্কেও তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না।

গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলনে গুরুদ্বারের আচার পদ্ধতি, নৈতিকতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্দোলনের আগে গুরুদ্বারের মোহন্তদের বেশির ভাগই ছিল হিন্দু সাধু সম্প্রদায়ের। ভক্ত জনতার মধ্যে হিন্দু-শিখ সবাই থাকত। কিন্তু গুরুদ্বার প্রবন্ধ কমিটি শিখ সম্প্রদাযেব হাতে চলে যাওয়ায় তারা হিন্দুদের প্রতি হীনতার দৃষ্টি হানতে থাকল। ফলে, হিন্দু-শিখ জাতি সম্প্রদায় ও রাজ্যগত বিভেদে পরিণত হল এই সংস্কার।

ভগৎ সিং-এর লাহোর ন্যাশনাল কলেজে যোগদান :

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করে গান্ধীজী বলেছিলেন, '...education may wait but Swaraj can not.'— স্বরাজের স্বার্থে শিক্ষাকে বলিদান দিতে, বয়কট করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে হাজারে হাজারে ছাত্র তাদের ভবিষ্যৎ-এর কথা ভুলে আন্দোলনে ঝাঁপিযে পডেছিল। কিন্তু গান্ধীজী হঠাৎ-ই আন্দোলনের রাস টেনে ধরায়, চারধারে হতাশা ছেয়ে গেল। শিক্ষাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক করে, ছাত্রদের মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চারের উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে নেতারা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। কলকাতা, পাটনা, আলিগড়, দিল্লী, লাহোর ইত্যাদি শহরে গড়ে উঠল জাতীয় স্কুল ও কলেজ। বিভিন্ন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন আলিগড ন্যাশনাল মুশলিম ইউনিভার্সিটি, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, এবং পাঞ্জাব কোয়ামি বিদ্যাপীঠ লাহোর, গড়ে উঠল।

লাহোরে পাঞ্জাব কোয়ামি বিদ্যাপীঠ বা ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত ন্যাশনাল কলেজ স্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় এবং এই শতাব্দীর

প্রথম দশকের বিপ্লব প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত ১৯০৯ থেকে ১৯২১ সাল অবধি আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ভাই পরমানন্দ। ইনি ছিলেন, গণেশ দামোদর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ, রামশরণ দাস, হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো), বারীন ঘোষ, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ প্রখ্যাত বিপ্লবীদের কারাগার-সাথী। প্রখ্যাত আর্যসমাজী সমাজ সংস্কারক, সমাজসেবী ও সুপণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন, ভাই পবমানন্দ।

'কেন আমি নাস্তিক' পুস্তিকাতে ভগৎ সিং লিখেছেন, 'অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে আমি ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হই। সেখানেই আমি প্রথম স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করি।··· তখন আমি অবিন্যস্ত বড বড চুল রাখতাম, কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী ও শিখ ধর্মমত সম্পর্কে আমাব কোন বিশ্বাস ছিল না। তবে ঈশ্বর আছেন—এটা দৃঢভাবেই মনে করতাম।'

১৯২১ সালে ক্লাস নাইনের ছাত্র থাকাকালীন মাত্র ১৪ বছরের ভগৎ সিং অসহযোগ আন্দোলনে সত্যাগ্রহী হিসেবে সক্রিয অংশ নিযে ডি.এ.ভি (দয়ানন্দ এ্যাঙ্গলো বিদ্যালয়) স্কুল ছাড়েন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে ক্লাস নাইনের ছাত্র হিসেবে ভগৎ কিভাবে কলেজে যোগ দেবার সুযোগ পেলেন।

ভগৎ সিং-এর বন্ধু ও সহপাঠী জযদেব গুপ্তা ও ভগৎ-এর ভাই কুলতার সিং সাঁধু'র কাছ থেকে এক সাক্ষাৎকার ও বিবৃতির মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ কবেছেন 'শহীদ ভগৎ সিং' (ইংরাজী) প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থের লেখক ও গবেষক গুবদেব সিং দিয়ল (G. S. Deol)। তিনি লিখেছেন, "জযদেব গুপ্তার বিবৃতি অনুযাযী জানা যায়, এইসব ছাত্রদের ক্ষেত্রে, কলেজ কর্তৃপক্ষ দুমাস সময দেন, প্রযোজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে একটি ভর্তি পরীক্ষায বসার জন্য। ভগৎ সিং ও সাথী জয়দেব গুপ্তা রাতেব পর রাত জেগে, কঠোর পরিশ্রম কবে, এই পবীক্ষার জন্য পড়া তৈরি করেন এবং পবীক্ষায বসেন। এই ভর্তি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এঁবা। সরাসরি কলেজেব প্রথম শ্রেণীতে এঁদের ভর্তি করিয়ে নেওয়া হয়।"

বীরেন্দ্র সিঁধুও তার 'ভাবতীয় বিপ্লবের অগ্রদূত অমর শহীদ ভগৎ সিং' (হিন্দী) গ্রন্থে লিখেছেন, 'ভাই পরমানন্দ (যিনি ছিলেন কলেজের অন্যতম অধ্যাপক) ভগৎ সিং-এর পড়াশুনা ও জ্ঞানের পরীক্ষা নেন। ইংরাজীতে ভগৎ সিং ঐ সময় একটু কমজোরী ছিলেন, কিন্তু স্কুলের গণ্ডীর বাইরে, পাঠ্যতালিকার বাইবে, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর পডাশুনা ও জ্ঞান ছিল অনেকের চেয়ে উঁচুতে। ভাই পরমানন্দ ভগৎ সিং-এর ঐ বযসের ব্যক্তিত্ব, কথাবার্তা, ব্যবহার, বুদ্ধিমত্তা ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখে যথেষ্ট প্রভাবিত হন। ভাই পরমানন্দই তাঁকে দুমাস সময় দেন প্রবেশিকা বা ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে। ভগৎ পরিশ্রমে কোনদিনই ভয পেতেন না। তাই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি ভর্তি হবার পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।'

বীরেন্দ্র সিঁধু আরও লিখেছেন, '১৯১৫-১৬ সালের গদর (বিপ্লব) আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর পাঞ্জাবের সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়াসে ভাঁটা পডে। তখন একমাত্র জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারই

(ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক) বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ছাত্রদের মধ্যে যাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হতে দেখা যেত তারাই ওঁর সান্নিধ্যে এসে যেত। ভগৎ সিং-এর সেই সময়কার বিচারশক্তি ও ব্যক্তিত্ব ছিল বেশ প্রভাবশালী। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাই ভগৎ অধ্যাপক বিদ্যালঙ্কারের অত্যন্ত কাছে এসে গেলেন। এই নৈকট্যের ফলে ভগৎ সিং-এর অধ্যয়নের অভ্যাস ও পদ্ধতির যথেষ্ট পরিবর্তন হল। যার ফলে তাঁর জ্ঞান ও চিন্তার গভীরতা এল এবং বিকশিত হতে থাকল।'

লাহোর ন্যাশনাল কলেজ :

যে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল, তাতে, লাহোরের ন্যাশনাল কলেজেব বাতাবরণে রাজনীতির ক্রিয়াকাণ্ড গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয় আন্দোলনের পরিপূরক উপযুক্ত কর্মী ও নেতা তৈয়ারি করা। অবশ্য সব ছাত্রই যে জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নেবার প্রতিজ্ঞা থেকেই এখানে ভর্ত্তি হয়েছিল সেটাও ঠিক নয। তবে এর বাতাবরণ, পরিবেশ, সরকারী ইউনিভার্সিটির কলেজগুলি থেকে আলাদা ছিল। অন্য কলেজে ছাত্রদের যেমন শিক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রী লাভের পর চাকরী করার একটা উদ্দেশ্য কাজ করত, ন্যাশনাল কলেজে সেটা হোত না। অধ্যয়নই ছিল এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য। অন্যান্য কলেজে ছাত্রদের মধ্যে যেসব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে বা শখ, ফ্যাসানের প্রভাব থাকে এখানে এসব ছিল না। ছাত্ররা এখানে সহজ, স্বাভাবিক পোশাক ও আচরণেই অভ্যস্ত ছিল। খদ্দরের বদলে কলের বা মিলের কাপড পরাও চলত। 'গান্ধী আশ্রমে'র মত কোন কড়াকডি এখানে ছিল না। প্রাত্যহিক 'প্রার্থনা' এবং 'সন্ধ্যা'-র জন্যও কোন অনুশাসন ছিল না।

এখানে পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা আসত এবং কলেজের বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করত। শুরুতে এখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশ। ম্যাট্রিক থেকে ওপরে বি.এ অবধি ছিল বিভিন্ন শ্রেণী।

কলেজের অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল ছিলেন আচার্য যুগলকিশোর। বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষান্তে সবে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। স্বাধীন বৃটিশ রাজত্বে যে পরিবেশ তিনি দেখেছিলেন তারই প্রভাবে, এ দেশের জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার কাজে অংশ নিয়ে, তিনি লাহোর ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে যুগলকিশোরজী লাক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন এবং উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও নির্বাচিত হন।

অপর অধ্যাপকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভাই পরমানন্দ ও জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

ভাই পরমানন্দ ইতিহাস পড়াতেন। পড়াবার মাধ্যমে ছাত্রদের জাতীয় চেতনা, দেশসেবা ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। আন্দামান সেলুলার জেলের কালো দিনগুলির অভিজ্ঞতার কথাও তিনি ছাত্রদের শোনাতেন। ছাত্ররা মোহিত হয়ে শুনত সে সব অত্যাচার ও সংগ্রামের কথা।

কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি, তাঁদের জীবন ও বিচারধারা, ছাত্রদের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করত। অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নাম এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছাত্রদের মধ্যে তর্ক করা ও জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তির প্রেরণা দিতেন। ইতিহাসের বিষযগুলিকে কেবলমাত্র বিশ্বাস নয়, যুক্তি, তর্ক দিয়ে, বিচার করে হৃদয়ঙ্গম করতে বলতেন। ক্লাসের নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে, আস্তিকতা-নাস্তিকতা, অধ্যাত্মবাদ, বস্তুবাদ ইত্যাদি নানান বিষয়ে তিনি আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের সূচনা করতেন। ছাত্রদের মধ্যে এসব বিষয়ে অধ্যয়ন করার ও যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করার মানসিকতা তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করতেন। ফলে, জিজ্ঞাসু ও অধ্যয়নশীল ছাত্রদের একটা দল গড়ে উঠেছিল তাঁকে কেন্দ্র করে। পরবর্তীকালে এরাই বিপ্লবী কার্যক্রমের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিল পাঞ্জাবে।

ভগৎ সিংও ধীরে ধীরে এদেরই একজন হয়ে উঠলেন। এই সময য তাঁর সাথী ছিলেন সুখদেব (পরবর্তীকালে একসঙ্গে শহীদ হন), সুখদেবের ভাই জয়দেব, রামকিষেণ, তীর্থরাম, যশপাল, ভগবতীচরণ ভোরা। পরবর্তীকালে বিপ্লবী প্রযাসে এঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কবেন।

ন্যাশনাল কলেজে অধিকাংশ ছাত্রই রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা নিত। কলেজে ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষাও পড়ান হোত। যে পাঁচ-ছ'জন ছাত্র সংস্কৃত বিষয় নিয়ে পডত, তার মধ্যে একজন ছিলেন ভগৎ সিং। সাহিত্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, ভাষাশিক্ষা সম্পর্কেও ছিল ভগৎ-এর গভীর আগ্রহ।

সহপাঠী সুখদেব, যশপাল এঁরা কলেজের বোর্ডিং-এ থাকতেন। কিন্তু ভগৎ থাকতেন বাবা কিষেণ সিং-এর সঙ্গে শহরের আলাদা বাড়িতে। সহপাঠী শহীদ বিপ্লবী ভগবতীচরণ ভোরা থাকতেন শহরে নিজেদের বাড়িতে। ভগৎ, যশপাল এঁদের থেকে ভগবতীচরণ দু ক্লাস উপরের সিনিয়ার ছাত্র ছিলেন। ভগবতীচরণ ইউনিভার্সিটি থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে ইন্টারমিডিএট পাশ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ভগৎ সিং, যশপালদের সঙ্গে ভগবতীচরণের যোগাযোগ হয় হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের (HRA) গোপন প্রচার পুস্তিকা বিতরণকে কেন্দ্র করে। লাহোরে জন্ম হলেও বংশসূত্রে এঁরা ছিলেন গুজরাতী ব্রাহ্মণ। ভগবতীচরণের বাবা ইংরাজ রাজত্বের রায়সাহেব খেতাবধারী ছিলেন। কিন্তু ছেলেকে সেটা প্রভাবিত করতে পারেনি।

সুখদেব, ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ সহপাঠী ছিলেন। পাঞ্জাবের লাযালপুরে (বর্তমান পাকিস্থানের ফয়সালাবাদ) ছিল তাঁর জন্মস্থান। লায়লপুরে ওঁদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল আড়তদারী কারবারের। সুখদেব ছোটবেলাতেই পিতৃহীন হন। তাঁর জ্যাঠামশাই লালা অচিন্ত্যরাম, যিনি সুখদেবের ভরণপোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার ভার নেন, তিনি ছিলেন থাপর কংগ্রেসের উগ্র আপসবিরোধী নেতাদের অন্যতম। ১৯২০ সালের আন্দোলনে অংশ নিয়ে লালাজী জেল খাটেন। সুখদেব অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর জ্যাঠামশাই লালা অচিন্ত্যরামের বন্দীজীবনের কয়েদী পোশাক ও হাতকড়ি পরানো একটা ছবি রাখতেন

টেবিলে। ভগৎ সিং-এর অপর সহপাঠী জয়দেব ছিলেন সুখদেবের খুড়তুতো ভাই। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে, দুই ভাই ম্যাট্রিক পাশ করার পর ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সুখদেব ছিলেন অত্যন্ত জেদী, আবেগপ্রবণ, কিন্তু অসম সাহসী। তাঁর বৈচিত্রময় ব্যবহারেব ঘটনাতে বন্ধুদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জবাব দিতেন, 'আমি যেমন ভাল বুঝছি তেমনি চলছি। তোমাদের পছন্দ না হয় আমার কাছ থেকে সরে যাও।' এসবই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসবার আগের ঘটনা। এমনি একটা অসম সাহসী, বেপরোয়া ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর এককালের বিপ্লবী সহপাঠী যশপাল, তাঁর 'সিংহাবলোকন' (হিন্দী) স্মৃতিগ্রন্থে। ঘটনাটি এইরকম :

"একবার সুখদেব প্রতিজ্ঞা করল, নিজের সহনশক্তির পরখ করবে। লায়লপুর থেকে সে ট্রেনে লাহোর আসছিল। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছিল সে। ট্রেনেব এক কামরা ছিল ইংরেজ সিপাইদের জন্য সংরক্ষিত। সিপাইরা সে কামরায অন্য কোন যাত্রীকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। সুখদেব জবরদস্তি সে কামরায় ঢুকে গেল। সিপাইরা যথারীতি তাঁকে ধমকাল। ট্রেনে তার বসার অধিকার আছে এই যুক্তি দেখিয়ে সুখদেব সিপাইদের যুদ্ধং দেহী চ্যালেঞ্জের আহ্বান দিয়ে বলল, 'আমি বসব। হিম্মৎ থাকে তো ঠেকাও।'

"যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের রাজত্বে সূর্যাস্ত হয় না, তার সিপাইবা এই বেযাদপি চ্যালেঞ্জ কিভাবে সহ্য কববে! তাবা সুখদেবকে যথেচ্ছ বুটের লাথি আর ঘুঁসিতে আপ্যায়ন করল। আশ্চর্য কাণ্ড! সুখদেব নীরবে মাব খেতে থাকল। না সে, প্রতিকারেব জন্য পাল্টা হাত ওঠাল, না পরিত্রাণের জন্য চীৎকার করল। সিপাইরা শেষে তাকে মেরে পিটিয়ে প্লাটফর্মে ফেলে দিল। ট্রেন চলে গেল।

"সুখদেব অন্য ট্রেন ধরে লাহোর এল। মারের চোটে তখন তার শরীর ফুলে গেছে। বোঝা যাচ্ছে শবীরে অসহ্য সূচ বেঁধান যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু সুখদেব নির্বিকারভাবে আমাদেব ঐ মার খাবার ঘটনা ও তার অনুভূতির কথা শোনাল। বোঝাতে চাইল উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এই ধরনের সত্যাগ্রহের পথ কিভাবে সাফল্য আনতে পারে। আমরা দার্শনিক তর্ক করে যুক্তি দিলাম আত্মরক্ষা ও ভয় যদি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় তাহলে তোমার এ কাজ সত্যাগ্রহের নামে আত্মহত্যা, আত্মহনন।"

কলেজের শিক্ষাক্রমে কিছুটা পিছিয়ে থেকে শুরু করেছিলেন ভগৎ, তাই যথেষ্ট নিষ্ঠা, আগ্রহ ও পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি পড়াশুনা করতেন। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর ছিল অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক। ফর্সা রঙ, লম্বা চেহারা, মাথায় ঢিলে-ঢালা বাঁধা চুলের দুপাশে লটকানো ছোট পাগড়ী, খদ্দরের ময়লা আর শরীরের মাপের বেঢপ জামা, পরণে পায়জামার বদলে প্রায়ই লুঙ্গি, এই ছিল কলেজে ভগৎ-এর পোশাক। ফর্সা চেহারার মুখে হাল্কা দাড়ি-গোঁপে, আর ছোট ছোট দুটি উজ্জ্বল চোখে ভগৎ ছিল সকলের প্রিয় পাত্র। অবশ্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলে কলেজের দিনগুলিতে দুষ্টুমি করতেও তিনি পিছপা ছিলেন না। মুঘল ইতিহাস পড়াতেন অধ্যাপক সোঁধী। আর ইংরাজী পড়াতেন অধ্যাপক মেহতা। এঁদের পড়াবার ধরণ, ইংরাজী উচ্চারণ ও নানান প্রশ্নে প্রায়ই ক্লাসে গণ্ডগোল হোত।

শাস্তি স্বরূপ হুকুম হোত, 'গেট আউট অব দি ক্লাস'। সেই দুষ্টুমির শাস্তি পেতেন সুখদেব, যশপাল, ভগৎ সিং প্রমুখ ছাত্ররা।

কিন্তু অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের ক্লাসে কোন দুষ্টুমির ঘটনা ঘটত না। কারণ ছাত্ররা জানত এতে তাদেরই ক্ষতি হবে। তবু যদি কখনো কেউ দুষ্টুমি করে কোন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলত, তাহলে অধ্যাপক জয়চন্দ্র তার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজকের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তোমার প্রশ্নের সম্পর্ক কি ?' এই কারণে নিছক দুষ্টুমি বা গণ্ডগোল পাকাবার জন্য কেউ প্রশ্ন করত না। অধ্যাপক জয়চন্দ্রজীর পড়াবার বিষয়গুলি, ইতিহাস সম্পর্কিত হলেও, প্রায়ই ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রসঙ্গ উঠে পড়ত। যার পরিণাম স্বরূপ, রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ও দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে যেসব ছাত্রদের মনে প্রশ্ন থাকত, তারা অন্য কোন্ রাস্তায় স্বাধীনতা আনা যায়, এবং তাকে সফল করা যায় সে সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠত।

সুখদেব, ভগবতীচরণ ভোরা, যশপাল-সহ অনেকের মতই ভগৎ সিং-এর হাতেও এসে পড়েছিল বেশ কিছু মূল্যবান বই। জয়চন্দ্রজীর অনুপ্রেরণায় দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্য রাস্তা খুঁজতে গিয়ে তারা পেলেন, 'মাৎসনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনকাহিনী', 'মাই ফাইট ফর আইরিশ ফ্রীডম', 'ভলতেয়ার ও রুশোর রচনাবলী', 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস', 'রুশ বিপ্লবী ক্রোপটকিনের জীবন', এছাড়া টলস্টয়, তুর্গেনেভের বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থ ও উপন্যাস। ভগৎ-দের হাতে এল, বাংলার অনুশীলন সমিতি তথা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের অন্যতম বলিষ্ট নেতা ও সংগঠক শচীন্দ্রনাথ সান্যালের লেখা, 'বন্দীজীবন' এবং 'রাওলাট কমিটির রিপোর্ট'-সহ বিভিন্ন তথ্য।

রাওলাট কমিটি তার রিপোর্ট তৈরি করেছিল দমনমূলক আইন তৈরি করার উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যে দেশে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রমের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল ঐ রিপোর্টে। ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীরা, যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য ভিন্ন রাস্তার খোঁজে ছিলেন ; তাঁরা পরিচিত হলেন, দেশের বাস্তব সশস্ত্র আন্দোলনের ঘটনা ও তার সম্ভাব্য পরিণতির সঙ্গে। চিন্তা ও চেতনায় উজ্জীবিত হলেন তাঁরা।

ভগৎ সিং-এর সাথী যশপাল তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, এই সময় একদিন তিনি ও ভগৎ সিং রাবি (ইরাবতী) নদীতে নৌকাবিহার করছিলেন। তাঁদের কথোপকথন : "আমরা দুজনেই ছিলাম, অন্য কেউ ছিল না। আজ মনে নেই কোন প্রসঙ্গে কি কথা হচ্ছিল। কিন্তু মনে আছে আমি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে, গভীর বিশ্বাসে, হঠাৎ ভগৎ সিং-কে বলি, 'let us pledge our lives to our Country', 'এস আমরা আমাদের জীবন দেশের জন্য বিলিয়ে দেবার শপথ নিই।'

"ভগৎ সিং কথাটা শুনে, হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আমার হাতে হাত রেখে বলল, 'I do pledge', 'আমি শপথ করছি।'

"হাত মেলাবার পর আমরা দুজনে নৌকা চালানো বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চল বসে ছিলাম। তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশ লালে লাল। ...সমস্ত ঘটনাটা এমন গম্ভীর ভাবুকতার মধ্যে হয়েছিল যে স্মৃতির গভীরে আজও রয়ে গেছে।"

ভগৎ সিং-এর সঙ্গে এই সময় অধ্যাপক জয়চন্দ্রজীর গভীর সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হয়ত, ভগৎ-এর মাধ্যমে খবর পেয়েই, সুখদেবকে দিয়ে জয়চন্দ্রজী একদিন যশপালকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে। জয়চন্দ্রজী জানতে চাইলেন, 'তুমি জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি ভেবেছ?' যশপাল উত্তর দিলেন, 'এখন কি আর বলব। এখন তো পড়াশুনা করছি।' জয়চন্দ্রজী বললেন, 'পড়াশুনার জন্য তো তুমি সরকারী কলেজে ভর্তি হতে পারতে। এই ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হবার কি প্রয়োজন ছিল? এই কলেজের ডিগ্রী পেযে তো তোমার জীবিকা সম্পর্কে কোনও সুবিধা হবে না। সরকাবী চাকরীর রাস্তাও বন্ধ। তাহলে?'

যশপাল জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সরকারী চাকরীর রাস্তা যে বন্ধ সে জানি। সরকারী চাকরীর অর্থ হল, বিদেশী সরকারকে সাহায্য করা, সহযোগিতা করা। আমি দেশে বিদেশী সরকার কায়েম রাখার পক্ষে নেই। তাই এই সরকারের সঙ্গে কোন সহযোগিতা করব না।' এরপর বিদেশী সরকার অপসারণের পন্থা, পদ্ধতি নিয়ে যশপালের সঙ্গে অনেক কথা বললেন জযচন্দ্রজী।

ন্যাশনাল কলেজের বাতাবরণ ও পরিমণ্ডল ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীদের ধীরে ধীরে এইভাবে আকৃষ্ট করেছিল দেশের রাজনৈতিক ক্রিযাকাণ্ডে। উৎসাহিত করেছিল সক্রিয় অংশগ্রহণে।

লাহোর ন্যাশনাল ড্রামাটিক ক্লাব :

লাহোরের কলেজ জীবনে ভগৎ সিং গভীর অধ্যয়ন ও রাজনৈতিক বিষয়ে যেমন বিশেষভাবে উৎসাহিত হন, তেমনি দেশাত্মবোধক গান গাওয়া, নাটক করা, সাহিত্য রচনা করার কাজেও সমানভাবে অংশ নিতে থাকেন। ক্রমে তিনি লাহোরের ন্যাশনাল ড্রামাটিক ক্লাবের সক্রিয় সদস্যভুক্ত হন। ক্লাবের পক্ষ থেকে 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যৌবনকাল' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। ভগৎ সিং এই নাটকে নায়ক, শশী গুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এটি একটি মঞ্চসফল নাটক হয় এবং ভগৎ-এর অভিনয় বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা ভগৎ সিং-এর সাফল্যে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ ভগৎ-কে আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়ে বলেন, 'আমার ভগৎ, আগামী দিনের, সত্যিকারের নায়ক, শশীগুপ্ত হবে।'

১৯২৪-২৫ সালে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যখন স্তিমিতভাব চলছিল, তখন ন্যাশনাল কলেজের উদ্যোগে, জাতীয় চিন্তাকে জাগ্রত রাখতে বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে ভগৎ-ও এইসব নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটকগুলি ছিল, 'রাণা প্রতাপ', 'ভারত দুর্দশা', মহাভারত অবলম্বনে 'কৃষ্ণ বিজয়' ইত্যাদি। সে সময় একজন উর্দু নাট্যকারের লেখা 'মহাভারত' নাটকটিকে জাতীয় চিন্তা জাগরণের উপযোগী বানাবার জন্য, সংলাপের পরিবর্তন কবা হয়। দেশভক্ত

গোষ্ঠীর সংলাপকে 'পাণ্ডব-পক্ষ' এবং বিদেশী শাসক ইংরেজকে 'কৌরব-পক্ষে'র উপযোগী করে নেওয়া হয়। ভগৎ সিং-এর কাকা বিপ্লবী অজিত সিং-এর গাওয়া জনপ্রিয় গান, 'পাগড়ী সাম্মালো জাট', অর্থাৎ ইংরেজদের অত্যাচারে মাথা থেকে যে পাগড়ী খসে পড়ছে সব কিছু লুঠ হয়ে যাচ্ছে, তার সম্পর্কে সচেতন হবার আহ্বানের গান-কে, সুর ঠিক রেখে, কিছু কথা পাল্টে, ঐ নাটকের উপযোগী গানে রূপান্তরিত করা হয়। ভগৎ সিং-দের অভিনীত এটিও একটি মঞ্চসফল নাটক।

ঐসময় পাঞ্জাবের গুজরাণওয়ালায় আঞ্চলিক কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং দেরাদুনে অখিল ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে মঞ্চস্থ দেশাত্মবোধক নাটক, 'ভারত দুর্দশা'-য় ক্লাবের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে, ভগৎ সিং-ও অভিনয় করেন।

ভগৎ সিং-এর কাকা বিপ্লবী অজিত সিং-এর জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান, 'পাগড়ী সাম্মালো জাট' যেমন সেই সময় নিষিদ্ধ হয়েছিল, তেমনি কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার অপরাধে এইসব নাটকও নিষিদ্ধ হয়। বিদেশী শাসকের রোষানলে লাহোরের ন্যাশনাল ড্রামাটিক ক্লাবও নিষিদ্ধ হয়।

ইতিমধ্যে, ভগৎ সিং লাহোর ন্যাশনাল কলেজ থেকে F. A পরীক্ষা পাশ করে B. A. ক্লাসের প্রথম বর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছেন। জ্ঞান অন্বেষণে ভগৎ-এর গভীর সাধনা ও সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁকে এই সময় এক পরিশ্রমী পাঠকে রূপান্তরিত করেছে।

অসহযোগ আন্দোলনেব ব্যর্থতাব দিনগুলির পর ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীরা জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে পড়াশুনা ও তর্ক বিতর্কে বিশেষ-ভাবে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করেন। সদ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আসা কিছু রাজনৈতিক ও সাহিত্য গ্রন্থ পড়ে, এসব বিষয়ে, ভগৎ সিং ও তাঁর বন্ধুদের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছিল আরও জানবার, আরও পড়বার। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের উদ্যোগে গঠিত 'তিলক স্কুল অব পলিটিক্স' এবং 'সার্ভেন্টস্ অব পিপলস্ সোস্যাইটি' ছাড়াও, লাহোরে লালাজীর পিতা দ্বারকাদাসের নামে প্রতিষ্ঠিত 'দ্বারকাদাস পুস্তকালয়' বা লাইব্রেরী ছিল বই-এর আর একটি খনি। এই লাইব্রেরীতে রাজনৈতিক বই, পত্র-পত্রিকা ছাড়াও প্রচুর সাহিত্য গ্রন্থ মিলত। কানপুরের বিখ্যাত সমাজবাদী নেতা ও পরবর্তীকালে বিধানসভা সদস্য রাজারাম শাস্ত্রী ছিলেন এর কর্মাধ্যক্ষ বা লাইব্রেরীয়ান। রাজারামজী ছিলেন ভগৎ সিং ও তাঁর বন্ধুদের প্রায় সমবয়সী। ভগৎ সিং-দের চিন্তা ভাবনার প্রতি তাঁর ছিল গভীর সহানুভূতি। ফলে, 'দ্বারকাদাস লাইব্রেরী', ক্রমে, ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীদের একটা ভাল মিলন কেন্দ্র বা আড্ডায় পরিণত হয়।

ভগৎ সিং তাঁর মিশুকে স্বভাবের জোরে লাইব্রেরীয়ান রাজারামজীর প্রিয় বন্ধু হয়ে পড়েন। পড়ার জন্য, যথেষ্ট বই-পত্তর তো তিনি শাস্ত্রীজীর কাছ থেকে নিতেনই, উপরন্তু, থাকা-খাওয়াতেও, ভগৎ তাঁর সঙ্গে ভাগ বসাতেন। লাইব্রেরীটি যেহেতু আসপাশের কলেজের বোর্ডিংগুলির মাঝখানে অবস্থিত ছিল, তাই অনেক কলেজ ছাত্র এখানে ভীড় করত। ভগৎ সিং-রা রাজারামজীর কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতেন, কোন্ ছাত্র কি

ধরনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বা সাহিত্যেব বই-এর প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘনিষ্ঠতা করতেন।

১৯২৪ সালের শেষ ও ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে সারাদেশে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন যে দুটি ঐতিহাসিক পুস্তিকা, 'দি রেভলিউশনারী' এবং 'ইওলো পেপাব', বা দলের গঠনতন্ত্র, গোপনে প্রচার করে ; সেই গোপন কাজে, ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ ভোরা প্রমুখ ছাত্রদেব সঙ্গে লাইব্রেরীযান রাজারামজীও সক্রিয় অংশ নেন।

রাজারামজী লিখেছেন, "একদিন আমি একখানা সন্ত্রাসবাদী বই পডি। সম্ভবত, বইটির নাম, 'সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। এব মধ্যে একটা অধ্যায় ছিল, 'হিংসাব মনোবিজ্ঞান'। প্রসঙ্গক্রমে, ঐ বইয়ে, ফ্রান্সের সন্ত্রাসবাদী নবযুবক-নেতা বৈলিয়োঁ গ্রেপ্তার হবার পব, আদালতে যে বিবৃতিটি পাঠ করেন, এই অধ্যাযে ছিল তাবই বিস্তৃত উল্লেখ। বৈলিয়োঁ তাঁর বিবৃতিতে বলেন, কিভাবে তিনি প্রথমদিকে শ্রমিকদের সংগঠিত করাব জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গডেন। শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমিতির মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবী ও অধিকারেব কথা প্রচাব করেন। কিন্তু যে শোষকরা পুঁজিবাদী সমাজেব শোষণ কায়েম বেখেছে গাযেব জোরে, তার উপর এইসব আন্দোলনের কোন প্রভাব পড়ে না। "তখন আমার মনে এই বিচার উৎপন্ন হল যে, ফ্রান্সের বিধানসভায় বোমা ফেলা উচিৎ, যাতে এইসব বধিব, কালা শোষকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয এবং তাবা ভয় পায। বধিরকে শোনাতে হলে খুবই উঁচু গলার প্রযোজন হয। এই কথা ভেবেই আমি ফ্রান্সেব বিধান সভায বোমা ছুঁড়েছি। আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পবিষ্কার—ঘুমন্ত শাসক-শোষক বর্গকে আসন্ন রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সম্পর্কে হুঁশিযারী দেওয়া। এখন এই আদালতের বিচাবক আমাকে এই অপবাধের জন্য যা শাস্তি দেবার আছে দিন, আমি হাসিমুখে তা স্বীকার করে নেব"।

রাজারাম শাস্ত্রীজী আরও লিখেছেন, 'বৈলিয়োঁর বিবৃতিটি আরও লম্বা, উত্তেজক ও আবেগপূর্ণ ছিল। বিবৃতিটি পড়ে আমি দারুণভাবে প্রভাবিত হই। অনেক ছাত্র, যুবককে আমি এই বইটা পড়তে দিয়েছি। তাবা সাধারণভাবে পড়েছে। বই ফেবৎ দিয়েছে। কিন্তু, ভগৎ সিং এই বইটা পড়ে আনন্দে, খুশিতে দারুণ উচ্ছল হযে ওঠে। ভগৎ এর পর অনেকবার এই বইটা লাইব্রেরী থেকে তার নামে নিয়ে গেছে। বৈলিয়োঁর বিবৃতিটি ভগৎ প্রায় মুখস্থ করে ফেলে। কাগজে বইটা সম্পর্কে লিখে নোট রাখে। রোজ লাইব্রেরীতে আমার কাছে সে জানতে চাইত, ঐ বইটা কারা কাবা নিয়েছে, পড়েছে এবং পড়ার পর তাদের ওপর বইটার প্রভাব কেমন।'

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ১৯২৯ সালের, ৮ই এপ্রিল, দিল্লীর আইনসভায় (তখনকার নাম ছিল এসেম্বলি) সাথী বটুকেশ্বর দত্ত'র সঙ্গে বোমা ছোঁড়ার পর, ভগৎ সিং তাঁর তৈরি ইস্তেহারের মাধ্যমে প্রথম যাঁর নাম ও কথা উচ্চারণ করেছিলেন তিনি ঐ ফরাসী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বৈলিয়োঁ। একই সঙ্গে বৈলিয়োঁ'র স্লোগান তুলে ভগৎও বলেছিলেন, 'বধিরকে শোনাতে হলে খুবই উঁচু গলায় বলার প্রয়োজন হয়।'

১৯২৩-২৪ সালের গভীর অধ্যয়নের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল ভগৎ সিং-এর ওপর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ভগৎ সিং-এর সক্রিয় সাহিত্যচর্চা। উর্দুভাষায় লেখার সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ এইসময় হিন্দী ভাষাতেও লিখতে থাকেন। বন্ধু যশপাল লিখেছেন : 'ভগৎ সিং-এর লেখার প্রতি প্রবল উৎসাহ ছিল। আমি কেবল হিন্দীতে লিখতাম। কিন্তু ভগৎ হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে উর্দুতেও লিখত। স্থানীয় উর্দু পত্র-পত্রিকায় ভগৎ-এর লেখা ছোট ছোট উর্দু রচনা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হতে থাকে।'

'পাঞ্জাবের ভাষা ও লিপির সমস্যা' সম্পর্কে ভগৎ সিং :

গভীর জ্ঞানানুসন্ধান ও সাহিত্যপ্রীতি ১৬/১৭ বছরের ভগৎ সিং-কে এক বিস্ময়কব স্তরে উত্তীর্ণ করে। সেই সময়, অর্থাৎ, এই শতাব্দীর বিশের দশকে, লাহোরে, উর্দু ভাষারই প্রভাব ও প্রচলন ছিল বেশি। অধ্যাপক জয়চন্দ্রজী, পুত্তুলালজী প্রমুখ কিছু অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও ন্যাশনাল কলেজের ছাত্রদের প্রেরণায় তখন হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হত। এই রকমেরই এক সম্মেলন থেকে, ভাষা-সাহিত্য সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহ্বান জানান হয়। শ্রেষ্ঠ লেখার জন্য পঞ্চাশ টাকার পুরস্কারও ঘোষিত হয। এই উপলক্ষেই ভগৎ সিং রচনা করেন তাঁর ঐ ১৬/১৭ বছরের লেখা এক বিস্ময়কর প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির নামকরণ করেন, 'পাঞ্জাবেব ভাষা ও লিপি সম্পর্কিত সমস্যা।' প্রবন্ধটি হিন্দী ভাষায় লেখা।

ভগৎ সিং একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু করেন। উদ্ধৃতিটি হল, "কোন দেশ অথবা তার সমাজ সম্পর্কে পরিচিত হতে চাইলে সেই দেশ এবং তার সমাজের সাহিত্য সম্পর্কে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কারণ, সমাজ ও দেশের প্রাণ, চেতনা একমাত্র তার সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়।"

এরপব লেখেন, "ইতিহাসই এই কথার সত্যতার সাক্ষী।··· প্রতিটি জাতিরই তার উত্থানের জন্য উন্নত সাহিত্যের প্রয়োজন। যে যে দেশের সাহিত্য উন্নত হতে থাকে, সেই সেই দেশও উন্নত হতে থাকে। যিনি দেশ্রপ্রেমিক, দেশভক্ত বা একজন সাধারণ সমাজ-সংস্কারক অথবা রাজনৈতিক নেতাই হোন, সবচাইতে বেশি দৃষ্টি দেন দেশের সাহিত্যের উন্নতির জন্য। কারণ, তাঁরা জানেন দেশের প্রযোজনের দিকে চেয়ে তার সমসাময়িক অবস্থা ও বিষয়গুলি সম্পর্কে যদি নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাঁদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হয়ে যাবে এবং তাঁদের কাজের ওপর কোন স্থায়িত্বের দাগ কাটবে না।

"হয়ত গ্যারিবল্ডি তাঁর সৈন্যসংগ্রহ ও সমাবেশে এত সহজে সাফল্য পেতেন না যদি না মাৎসনী দীর্ঘ তিরিশ বছর যাবৎ দেশের মানুষকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাগ্রত করতেন।··· ফরাসী বিপ্লবও অসম্ভব হোত, যদি না রুশো, ভল্‌তেঁয়ার তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করতেন। সাম্যবাদের প্রচার, প্রসার ইত্যাদির কথা তো অনেক দূরের ব্যাপার। যদি টলস্টয়, কার্ল মার্কস, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখরা তাঁদের জীবনের দীর্ঘ সময় নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিযুক্ত না থাকতেন, রাশিযার বিপ্লবই সংগঠিত হোত না।

"...ঠিক একই কথা গুরু নানক সম্পর্কে বলা যায়।... যেমন গুরুমুখী ভাষার উৎপত্তি। শিখ গুরু অঙ্গদদেব গুরুমুখী লিপির সৃষ্টি করেন। গুরু নানকের পর থেকে, বিভিন্ন শিখ গুরুরা, তাঁদের মত ও পথের প্রচারের জন্য যে নতুন সাহিত্যের প্রয়োজন অনুভব করেন, তার প্রেরণা থেকেই এই নতুন গুরুমুখী লিপির সৃষ্টি। শতাব্দীব্যাপী নিরন্তর যুদ্ধ এবং মুসলমান আক্রমণের ফলে, পাঞ্জাবের সাহিত্য দুর্বল নিষ্প্রাণ হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। হিন্দী ভাষাও প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময় শিখ গুরু অঙ্গদদেবজী, শিখ সম্প্রদায়ের নয়া চিন্তা-চেতনাকে উপযোগী ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত করার অন্বেষণে, কাশ্মীরী লিপিকেই স্বীকার করে নিলেন এবং নিজের মত করে 'গুরুমুখী' লিপিতে পরিবর্তিত করে নিলেন।

"...শিখ গুরু শ্রী তেগ বাহাদুরজীর আত্মদানের পর, আমরা হঠাৎ-ই গুরু গোবিন্দ সিংজীর বাণী ও প্রচারে যোদ্ধা এবং ক্ষাত্রধর্মের প্রভাব লক্ষ করলাম। যখন গুরু গোবিন্দজী দেখলেন যে আগের মত কেবল ভক্তিবাদেই কাজ চলবে না, তখন তিনি চণ্ডিমাতার পূজার সূচনা করলেন। ভক্তিবাদ ও ক্ষাত্রধর্মকে একীভূত করে তিনি শিখ সম্প্রদায়কে একাধারে ভক্ত ও যোদ্ধা হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁর কাব্য সাহিত্যে তাই তৎকালীন অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি লিখলেন :

'সুরা সো পহিচানিয়ে, জো লড়ে দিন কে হেত।
'পূর্জা পূর্জা কট মরে, কভুঁ ন ছোঁড়ে খেত॥' (গুরুমুখী)

(অর্থাৎ, বীর তাকেই বলা চলে যে দীন গরীবের জন্য লড়াই করে। এই বীরকে, কেটে টুকরো টুকরো করে হত্যা করলেও, সে তার কর্ম থেকে সরে যায় না।) গুরু গোবিন্দ সিংজীর এই নয়া গুরুমুখী সাহিত্য প্রচারের পরই দেখা গেল চারদিকে খড়্গ বা তলোয়ার-পূজা ছড়াতে থাকল।

"এই ক্ষাত্রধর্ম ও যোদ্ধার মানসিকতা থেকেই বাবা বন্দা ও অন্যান্যরা মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ চালাতে থাকলেন।"

ভগৎ সিং পাঞ্জাবের ভাষার দৈন্যের কথা উল্লেখ করে, এই প্রবন্ধে বলেছেন যে, বাংলার স্বামী বিবেকানন্দ এবং পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থ সমসাময়িক এবং চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে খুবই কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও, বাংলা ও সমগ্র ভারতে বিবেকানন্দ যেমন সমাদৃত হয়েছেন, সেভাবে পাঞ্জাবে ভাষার দুর্বলতার জন্য, স্বামী রামতীর্থ অতটা গভীর প্রভাব ফেলতে পারেননি।

ভগৎ সিং ঐ প্রবন্ধে বলেছেন যে, ভাষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার দরুণই, বাংলার দিকপাল দেবেন্দ্র ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেনদের মত পাঞ্জাবের সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব, গুরু জ্ঞান সিংজীরাও প্রতিষ্ঠা পাননি। 'এর পেছনে সত্য হল, কোন দেশ ও তার সম্প্রদায় উন্নতি করতে পারে না তার নিজস্ব উন্নত ভাষা ভিন্ন।'

বাংলার বিপ্লবী, বিদ্রোহী কবি, কাজী নজরুল ইসলামের নামোল্লেখ করে ভগৎ সিং লিখেছেন যে, ইনি বাংলা সাহিত্যের জগতে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। ভগৎ লিখেছেন,

"কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় আমরা প্রায়ই 'ধূর্জটী', 'বিশ্বামিত্র', 'দুর্বাসা' ইত্যাদি শব্দ শুনতে পাই (যার মধ্যে কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চিন্তা নেই), কিন্তু আমাদের পাঞ্জাবের হিন্দী-উর্দু কবিরা এসব কল্পনাই করতে পারেন না। এটা কি দুঃখের কথা নয়? এর মূল কারণ হল, এঁদের মধ্যে ভারতীয় বোধের অভাব এবং অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা। এদের সাহিত্যবোধের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় চেতনাই নেই। তাহলে এদের সৃষ্ট সাহিত্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি বানাবে কি করে?"

ভগৎ লিখছেন, "ভাষার প্রশ্নকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার দৃষ্টিতে না দেখে একে মুক্ত ও সমগ্র জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে।..."

অবিশ্বাস্যভাবে, মাত্র ১৬/১৭ বছরের একজন সদ্য যুবকের চিন্তা থেকে দেশের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে এক সুদৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হল। ভগৎ লিখলেন, "আমাদেব গোটা ভারতবর্ষে এক ভাষা, এক লিপি, এক সাহিত্য, এক জাতীয় আদর্শ ও এক রাষ্ট্র নিশ্চযই বানাতে হবে, কিন্তু সেই একতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটিমাত্র জাতীয় ভাষার প্রয়োগও অত্যন্ত জরুরী, যাতে আমাদের মধ্যে সহজেই চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান হতে পারে।"

ভগৎ লিখছেন, "এখন অবধি পাঞ্জাবী ভাষা, সাহিত্যের যোগ্য ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। এমনকি এই ভাষা সমগ্র পাঞ্জাবের ভাষা বলেও দাবী করতে পারে না। মধ্য পাঞ্জাবের জনপ্রিয় কথ্য ভাষা, যা কিনা গুরুমুখী লিপিতে লেখা হয়ে থাকে, সেটাই পাঞ্জাবী ভাষা বলে পরিচিত। এই ভাষা এখনও সমগ্র পাঞ্জাবের জনপ্রিয় ভাষা হতে পারেনি। এছাড়া এই ভাষার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি সামর্থও সৃষ্টি হয়নি।" এর পর ভগৎ পাঞ্জাবী ভাষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আশ্চর্যের কথা, ঐ বয়সেই ভগৎ কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জেনেছেন ও পড়েছেন। তার প্রমাণ মেলে, এই লেখায়, পাঞ্জাবী ভাষার শত দুর্বলতা সত্ত্বেও, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ভাবালুতা রবীন্দ্রনাথকেও যে নাডা দেয়, এবং তিনি যে পাঞ্জাবী গানের ইংরাজী অনুবাদে লেখেন, 'O Lachi, where thou spilt water, etc...etc..' এর বিশেষ উল্লেখ করার মধ্যে।

'পাঞ্জাবের ভাষা ও লিপির সমস্যা', এই নামে ভগৎ সিং-এর লেখা প্রবন্ধটির সন্ধান মেলে তাঁর ফাঁসির পর, ১৯৩৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, 'হিন্দী সন্দেশ' পত্রিকায়। তৎকালীন হিন্দী সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক ভীমসেন বিদ্যালঙ্কার অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রবন্ধটি রক্ষা করেন এবং পরে ছাপতে দেন। কিন্তু পুরস্কার স্বরূপ ভগৎ সিং-এর পঞ্চাশ টাকা পাওয়ার কথাটা সম্পর্কে একটু ধন্দ থাকে। কারণ ভগৎ-এর সাথী যশপাল তাঁর 'সিংহাবলোকন' গ্রন্থে লিখেছেন যে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের ডাকে একটা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু কারও কাছেই পুরস্কার পৌঁছয় না। উনি লিখছেন, "আমিও প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বেশ কয়েকমাস প্রতিযোগিতার ফলের প্রতীক্ষা করার পর খবর নিলাম। জানলাম, যেহেতু তিন জন প্রতিযোগীর প্রবন্ধের মান প্রায় একই স্তরের, তাই

কাউকেই পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। এও জানলাম, ঐ তিনজনের একজন আমি, বাকী দুজনের নামের অনুসন্ধান করতে জানা গেল একজনের নাম ভগৎ সিং, অপরজন অধ্যাপক জয়চন্দ্রজীর ভাগ্নীর।"

ভগৎ সিং-এর বিবাহের প্রস্তুতি :

সময়টা ১৯২৩ সাল। কলেজে বি. এ. ক্লাসের ছাত্র হিসেবে পডাশুনার সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কাণ্ডের সম্পর্কেও উৎসাহী হযে উঠছিলেন। প্রায়ই দেখা যেত সাথী সুখদেব সহ ভগৎ কলেজ থেকে উধাও। ছাত্রসুলভ কোন চপলতা নেই আচার-আচরণে। বরং তাঁকে ঐ বয়সেই বেশ চিন্তাশীল, গম্ভীরই দেখাত।

ওদিকে বাড়িতে ঠাকুরমা তাঁর অতি আদরের ভগৎকে ঘরমুখী করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। বাডির বড ছেলে, ভগৎ-এর দাদা জগৎ সিং-এর মৃত্যু হয় নিতান্ত ছোট-বেলায়। আঘাতের শোক সামলে সমস্ত স্নেহ উজাড হযে যায় ভগৎ-এর ওপর। সেই এখন বাড়ির বড ছেলে। ঠাকুরমার আন্তরিক ইচ্ছা ঘরে নাত-বৌ আনার। ভগৎ-এর বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরে ফেরাবার। নিজের কাছে রাখার। পবিবারে আর কোন অঘটন ঘটতে দিতে চান না তিনি।

নিরুপায় হয়ে, মায়ের অনুরোধে ভগৎ এর বাবা কিষেণ সিং খোঁজ খবর করে পাত্রী পছন্দ করলেন। পাত্রী শেখপুরা জেলার মান্নাওয়ালা গ্রামের জমিদার তেজা সিং মানেব বোন। এঁদের পরিবার শিখ ধর্মাবলম্বী। গ্রামের ধনী ও প্রভাবশালী পরিবার। বিয়েতে তাঁবা প্রচুর অর্থ ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিলেন কিষেণ সিংকে। যার মধ্যে মোটা অঙ্কের পণও আছে। বিয়েব প্রস্তুতি পর্ব এগোতে থাকল। কিন্তু ভগৎ নিরুত্তাপ।

বাবা কিষেণ সিং জানতে চাইলেন, 'তোর কোন আপত্তি নেই তো?'

ভগৎ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আপত্তি আছে।'

কিষেণ সিং বললেন, 'কেন আপত্তির কাবণ কি?'

ভগৎ উত্তর দিলেন, 'যতক্ষণ নিজের পাযে দাঁডাতে না পারছি, আর্থিক সঙ্গতি পাচ্ছি, ততক্ষণ বিয়ে করাটা উচিত নয়।'

কিষেণ সিং বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুই আমাকে রাস্তা দেখাতে চাইছিস? দেশে আমাদের ক্ষেত, জমি নেই? তার চাষাবাদ থেকে জীবিকা নির্বাহ হয় না? বিয়ে করে নে, তারপর এসব কাজে লেগে পড়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা চালা। এসবে তো কোন মানা নেই। বিয়ে করলে তোর কিসের ঝঞ্ঝাট?'

এবার সরাসরি এডিযে যাবার জন্য ভগৎ বলল, 'কিন্তু আমার এখন বয়স অল্প। এই বয়সে বিয়ে করা চলে না।'

কিষেণ সিং শ্লেষ দিয়ে বললেন, 'অন্যান্য বিষয়ে তো বেশ বৃদ্ধের মত কথাবার্তা বল! বিয়ের ব্যাপারেই বাচ্চা ছেলে হয়ে গেলে? ঠিক আছে, বিয়েটাতো সেরে নে। বউকে না হয় বাপের বাড়ি থেকে পরে যখন প্রয়োজন হবে, নিয়ে এলেই হবে।'

ভগৎ এর পাত্রীর শিক্ষার দিকটা জানা ছিল যে, সে, তেমন পড়া-লেখা পাত্রী নয়। তাই এবার মরিয়া হয়ে বাবাকে বলল, 'কিন্তু আমি তো কমসে কম ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে ছাড়া বিয়ে করব না।'

এবার ক্রুদ্ধ পিতা ছেলের সঙ্গে আর মার্জিত ভাষায় কথাবার্তা চালাতে পারলেন না।

ভগৎও ক্রুদ্ধ পিতা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করতে থাকলেন। কিন্তু বিয়ের প্রস্তুতি পর্বে এসব ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া হল না। একদিন জমিদার স্বয়ং ভগৎকে দেখতে এলেন। ভাবী জামাই ভগৎকে দেখে তো তাঁর ভারী পছন্দ হল। তিনি আর দেরি করতে চান না। শুভ বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল।

বিযের জোয়াল অবশ্যই তাঁর কাঁধে চাপবে। কোনরকমেই তাঁর আর নিস্তার নেই। এই অবস্থায় ভগৎ বিয়ের নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন আগে ১৯২৩ সালের শেষার্ধে ঘর ছেড়ে লাহোর চলে এলেন। যাবার সময় তাঁর বাবার টেবিলের ড্রয়ারে সযত্নে লুকিয়ে রেখে এলেন এই চিঠিটা। চিঠিটা ছিল উর্দুতে লেখা।

"পূজনীয় বাবা,

"নমস্কার!

"আমার জীবন অনেক আগেই এক উচ্চ আদর্শ, অর্থাৎ, ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে দান করা হয়ে গেছে। এই কারণেই আমার জীবনে আরাম, জাগতিক পাওযা এবং সাংসারিক ইচ্ছার কোন আকর্ষণ নেই।

"আপনার মনে পড়বে যে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বাপুজী (ঠাকুর্দা) আমার উপনয়নের সময় এই বলে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমাকে দেশ সেবার জন্য দান করা হল। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে দান করার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করছি।

"আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

"আপনার অনুগত,

"ভগৎ সিং"

ভগৎ সিং-এর বিবাহ প্রস্তুতি সম্পর্কে পাঞ্জাবের বিখ্যাত গবেষক ও 'শহীদ ভগৎ সিং' (ইংরাজী) গ্রন্থের লেখক G. S. Deol আরও কিছু তথ্য-সমৃদ্ধ বিষয় উল্লেখ করেছেন।

ভগৎ সিং-এর সহপাঠী ও বন্ধু জয়দেব গুপ্তার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি চিঠির আদান-প্রদানের কথা উল্লেখ করছে। যদিও এগুলোর সন্দেহাতীত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ দেননি তিনি। দেয়ল লিখেছেন যে, বিবাহ প্রস্তুতির প্রথম পর্বে ভগৎ তাঁর বাবাকে লেখেন,

"পূজনীয় বাবা,

"এই সময়টা আমার বিবাহের উপযুক্ত সময় নয়। দেশ আমাকে আহ্বান করছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তন, মন, ধন, সর্বস্ব দিয়ে দেশের সেবা করব। তাছাড়া এই প্রতিজ্ঞা আমাদের পরিবারে নতুন নয়। আমাদের গোটা পরিবারই দেশপ্রেমিক পরিবার।

আমার জন্মের দুই তিন বছরের মধ্যেই ১৯১০ সাল নাগাদ আমার কাকা স্বর্ণ সিং জেলে শহীদ হয়েছেন। আর এক কাকা অজিত সিং বিদেশে নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছেন। আপনিও জেলের কষ্ট স্বীকার করেছেন। আমি কেবলমাত্র আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, দেশ সেবার সাহস অর্জন করেছি। আপনি আমাকে দয়া করে বিবাহ বন্ধনে বাঁধবেন না। বরং আপনি আশীর্বাদ করুন আমি যেন আমার আরাধ্য কাজে সফল হই।"

এই চিঠি পড়ে ভগৎ-এর পরিবারের সকলেই আশাহত হন। ভগৎ-এর ঠাকুরমা চাইছিলেন যে কোন মূল্যেই ভগৎ-এর বিয়ে দিতে। ভগৎ-এর বাবা কিষেণ সিং, তাঁর মার এই জিদের সামনে এক অসহায় অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। একদিকে তাঁর মার প্রবল ইচ্ছার চাপ, অপরদিকে তাঁর স্নেহের পুত্রের দেশসেবার স্থির অবিচল সিদ্ধান্ত। দীর্ঘ চিন্তা ভাবনার শেষে কিষেণ সিং পুত্র ভগৎকে লিখলেন,

"প্রিয় ভগৎ

"আমরা তোমার বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি। আমরা পাত্রী দেখেছি। পাত্রী এবং তার পরিবারের সকলকেই আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। এখন আমার এবং তোমার উচিত বৃদ্ধা ঠাকুরমার মনের বাসনাকে সম্মান জানান। কাজেই, এটা আমার আদেশ, যে, আসন্ন বিবাহের ক্ষেত্রে তুমি কোন অসুবিধে সৃষ্টি করবে না এবং আনন্দের সঙ্গে প্রস্তুত হবে।"

এই চিঠি পেযে ভগৎ বেজায মুষড়ে পডলেন। শেষে অনেক ভাবনা-চিন্তা, বিচার-বিবেচনা করে, বাবাকে লিখলেন,

"পূজনীয় বাবা,

"আমি আপনার চিঠি পেয়ে এবং তার বিষয়টা পড়ে অবাক হয়েছি। আপনার মত একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং বীর যদি এসব (বিবাহ সম্পর্কে) তুচ্ছ বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে পড়েন, তাহলে একজন সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে?

"আপনি কেবল আমার ঠাকুরমা সম্পর্কেই ভাবছেন। কিন্তু আমাদের ৩৩ কোটি দেশবাসীর যিনি মা, ভারত-মাতা, তাঁর দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশার কথা কে ভাববে? আমি মনে করি, ভারত-মাতার দুঃখ দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে আমাদের সর্বস্ব দিতে হবে, আত্মবলিদান করতে হবে।

"আমি জানি, এ সত্ত্বেও আমাকে বিবাহে বাধ্য করা হবে। কাজেই, আমি দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছি।"

দেশপ্রেমের প্রবল টানে, সামান্য ১৬/১৭ বছরের একটি যুবক, দৃঢ়চিত্তে প্রিয় আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, বান্ধব সব কিছুকে ত্যাগ করে, কলেজের প্রথাগত শিক্ষায় ইতি টেনে, নৌকো ভাসালেন অজানা অচেনা তরঙ্গসঙ্কুল উত্তাল বহির্সমুদ্রে।

বন্ধুমহলে ভগৎ সিং-এর বিবাহ প্রস্তুতির খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাই, গৃহত্যাগ প্রস্তুতি পর্বে ভগৎ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লিখে গেলেন এক পত্র: "বন্ধু, আজ যাবার আগে তোমাদের বলে যাই, যদি এই পরাধীন ভারতবর্ষে আমার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাহলে

সেটা হবে, একমাত্র 'মৃত্যু' নামের কনে বা পাত্রীর সঙ্গে। বরাত, অর্থাৎ বরযাত্রীরা হবে শবযাত্রী। আর আমার সঙ্গে যারা কনের বাড়ি যাবার সাথী হবে অর্থাৎ বরাতীরা হবে দেশের শহীদ।"

দেশের মুক্তিযজ্ঞে, সামান্য ১৬/১৭ বছরের একটি উৎসর্গীকৃত প্রাণ যুবকের, কি দৃঢ়, আবেগময়, আশ্চর্য ঐশ্বর্যশালী রসবোধ ও ভাষার প্রকাশভঙ্গি!

ভগৎ সিং-এর কলেজ শিক্ষার সমাপ্তি ও গৃহত্যাগ :

ভগৎ-এর বন্ধু জয়দেব গুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে ভগৎ সিং-এর জীবনীকার গবেষক G. S. Deol বলেছেন যে, ভগৎ ১৯২৪ সালে ন্যাশনাল কলেজ ছেড়ে, ঐ বছরেই, অর্থাৎ ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকেই, লাহোর ত্যাগ করেন; আসন্ন অবশ্যম্ভাবী বিবাহকে এড়াবার জন্য।

ভগৎ সিং-এর অপর জীবনীকার, গবেষক বীরেন্দ্র সিঁধু বলেছেন যে, কলেজের ছাত্রাবস্থায় ভগৎ যখন অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের সংস্পর্শে এসে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও সন্ত্রাসবাদী পথ সম্পর্কে পরিচিত হতে থাকেন তখনই একদিন জয়চন্দ্রজীর বাড়িতে যুক্ত প্রদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের দেখা পান। এই পরিচয় ও কথাবার্তা থেকেই ভগৎ বিপ্লবী দলে যুক্ত হন। কলেজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দলের কাজও করতে থাকেন।

'কেন আমি নাস্তিক', এই পুস্তিকাতে ভগৎ সিং বলেছেন তিনি পরবর্তীকালে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং দ্বিতীয় যে নেতার সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর নাম, 'শ্রদ্ধেয় কমরেড শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যিনি বর্তমানে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।' প্রথম যে নেতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তিনি নিশ্চয়ই জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, ন্যাশনাল কলেজে ভগৎ-এর শিক্ষক।

বনারস-সহ সমগ্র উত্তর ভারত এবং একসময় সারা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ভিত্তিতে যিনি সারা ভারতে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন' গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন, সেই প্রখ্যাত বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সংস্পর্শে এসেই ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী দলের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে।

বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে ভগৎ সিং-এর দলের সঙ্গে যুক্ত হবার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এইভাবে, "ভগৎ সিং বাংলার বিপ্লবী দলভুক্ত হন এইভাবে: সে লাহোরের ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র। বিয়ের জন্য তার ওপর বাড়ির চাপ আসে। ভগৎ অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকে ধরে পড়েন, বিয়ে করবেন না, দেশের কাজ করবেন। এই সময় শচীন সান্যাল লাহোরে যান। বিদ্যালঙ্কার ভগৎকে শচীনের কাছে পাঠান। শচীন সব শুনে ভগৎকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি সব কিছু ছেড়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে প্রস্তুত আছ কি?'

"ভগৎ বলে, নিশ্চয়ই।

"বিয়ের সমূহ তাগিদ এড়াবার জন্যও ভগৎ লাহোর ত্যাগ করতে চাইছিল। তখন শচীন সান্যাল একটা চিঠি লিখে ভগৎকে কানপুরে পাঠালেন যোগেশ চ্যাটার্জীর কাছে (১৯২৪ এর মার্চ -এপ্রিলে)। যোগেশ ভগৎ-এর সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ পরিচয় করে তাকে all time worker-রূপে সংস্থার মধ্যে গ্রহণ করেন।"

ঐ গ্রন্থেরই আর এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জীর বক্তব্য, "ভগৎ সিংও কানপুরে আমার কাছে এল। জেলায় জেলায় কাজ এগোল। অর্থাভাব চলছিল। ডাকাতির কর্মসূচী নেওয়া হয় এই সময়। এলাহবাদ থেকে ২০ মাইল দূরের গ্রামে আমার নেতৃত্বে ভগৎ সিং, রামপ্রসাদ বিসমিল প্রভৃতি ডাকাতিতে যায়। চেষ্টা ব্যর্থ হয়।"

একসময়ে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতা ও সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষও ছিলেন ভগৎ সিং-এর সাথী ও সহযোদ্ধা। 'ভগৎ সিং ও তার কমরেডবৃন্দ' (ইংরাজী) পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন, "যতদূর মনে পড়ে সম্ভবত ১৯২৩ সাল নাগাদ আমার সঙ্গে সর্বপ্রথম ভগৎ সিং-এর দেখা হয়। প্রায় আমারই বয়সী একজন যুবক। আমার বয়স তখন পনেরো। তার নাম ভগৎ সিং। ওর সঙ্গে কানপুরে আমার পরিচয় করিয়ে দিল বটুকেশ্বর দত্ত।"

এইভাবেই ১৯২৪ সাল নাগাদ ভগৎ সিং-এর প্রথাগত শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় পূর্ণোদ্যমে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন, যখন তাঁর বয়স প্রায় ১৭ বছর।

৫
বিপ্লবী জীবনের সূচনা
(১৯২৪—১৯২৬)

বাংলার অনুশীলন দলের প্রখ্যাত নেতা ও সংগঠক যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী তখন কানপুর অঞ্চলে দলের সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন। বনারসের অপর প্রখ্যাত বাঙালী বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যাঁর সঙ্গে বাংলার অনুশীলন দলের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, তাঁরই নেতৃত্বে ও উদ্যোগে, সারা ভারত জুড়ে সকল বিপ্লবী সংগঠনকে একত্রিত করে ১৯২৩ সালের শেষভাগে তৈরি হয়েছিল 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন'।[১৮] কানপুরে দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের চিঠি নিয়ে দেখা করলেন ভগৎ। 'ভগৎ সিং-ও কানপুরে আমার কাছে এল', কথাটির উল্লেখ আছে 'বাংলার বিপ্লববাদ' গ্রন্থে। এই সাক্ষাৎ-এর সময়টা ১৯২৪ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস।

১৯২৪ সালের এই সময়টা সারা ভারতে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের' সাংগঠনিক বিস্তার ঘটাবার সময়। যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে শচীন্দ্রনাথ সান্যালই কানপুর-কেন্দ্রিক উত্তর ভারতে সংগঠন গড়ার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। যোগেশ চ্যাটার্জীর কথায় তৎকালীন ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে, "কানপুরে ১৯২৪ সনের অক্টোবরে 'হিন্দুস্থান

রিপাবলিকান এসোসিয়েসন' পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অধিবেশনের অল্পদিন পরেই আমি গ্রেপ্তার হই। প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্ট (খসড়া) আমার কাছে ছিল। এতে সংযুক্ত প্রান্তের ২৩টি জেলায় সংগঠনের কাজ কায়েম করা, চাঁদা তুলে খরচ চালান, পুলিশের বিরুদ্ধে এবং সমাজবাদের পক্ষে সক্রিয় প্রচার চালাবার কথা লেখা ছিল।" ('বাংলায় বিপ্লববাদ')।

১৯২৪ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে Criminal Procedure Code-এর ৫৪নং ধারায়, কোলকাতায় যোগেশ চ্যাটার্জীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধরা পড়ার সময় ঐ রিপোর্ট (খসড়া) হস্তগত হয় পুলিশের। রিপোর্টটা এই রকম:

"৩রা অক্টোবর ১৯২৪ তারিখে প্রাদেশিক কমিটির সভায় ৬ জনের মধ্যে ৫ জন সদস্য উপস্থিত হন এবং সেখানে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"১। জেলাস্তরের সংগঠকদের যোগ্যতার বিচারে জেলায় জেলায় প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছে। জেলাগুলি হল, বনারস, এলাহবাদ, প্রতাপগড়, কানপুর, লাক্ষ্ণৌ, ফতেপুর, জৈনপুর, ঝাঁসী, হামিরপুর, ফারাকাবাদ, মৈনপুরি, ইটোয়া, আগ্রা, আলিগড, মথুরা, বুলন্দসর, মীরাট, দিল্লী, ইটা, বেরিলী, পিলিভিট, সাহাজাহানপুর, মুজাফরনগর। যতক্ষণ পর্যন্ত না যোগ্য সংগঠক পাওয়া যাচ্ছে ঐ জেলা সংগঠকদেরই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বাকী জেলাগুলির কাজ দেখার জন্য।...

"২। কমপক্ষে ১০০ টাকা, যেটা বর্তমান অবস্থায় জরুরী প্রযোজনে ন্যূনতম খরচ বলে মনে করা হচ্ছে, সেটা বনারস, কানপুর, ঝাঁসী, আলিগড, মীরাট, এবং সাহাজাহানপুর কেন্দ্র থেকে সমান ভাবে সদস্য ও দরদীবন্ধুদের কাছ থেকে চাঁদা হিসেবে আদায় করতে হবে।... এসোসিয়েসনের সদস্যদের কাছ থেকে কমপক্ষে মাসিক ৪ আনা হারে চাঁদা নিতে হবে। পরবর্তী দুমাসের মধ্যে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে হবে।

"৩। সভা স্বীকার করছে যে এখন পর্যন্ত মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। কেন্দ্রভিত্তিক হিসাব হল, বনারস—১৯, কানপুর—২২, ঝাঁসী—১৫, আলিগড়—১২, মীরাট (এখন অবধি হিসেব পাওয়া যায় নি), সাহাজাহানপুর—৮।

"৪। সভা এই মত গ্রহণ করছে যে, অবিলম্বে সংবাদপত্র, পত্রিকা এসবের মাধ্যমে দলের প্রচার সংগঠিত করা উচিত, যেটা বিভিন্ন কেন্দ্রের সদস্যরা সংগঠনের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারবে। দলের আশু পদক্ষেপগুলি হল,

(ক) পুলিশের C. I. D-দের দলের বিরুদ্ধে ক্ষতিকারক কাজগুলি সম্পর্কে সংগঠিত প্রচার।

(খ) দমন, পীড়নের জন্য তৈরি ইংরেজদের আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রচার।

(গ) জাতীয় কংগ্রেসের যেসব কাজ দলের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে সেগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রচার।

(ঘ) সমাজ বিপ্লবের চিন্তা এবং কম্যুনিস্ট নীতি ও আদর্শের প্রচার ও প্রসার।

(ঙ) সংবাদপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গল্প, ঘটনা ও অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধ সংগ্রহ্ করা।....

"৮। এসোসিয়েসনের (দলের) কার্যাবলী সম্পর্কে যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করতে হ্বে।

"৯। প্রতিটি জেলা সংগঠককে আদর্শভিত্তিক তৈরি স্থানীয় ক্লাব ও সংগঠনগুলিকে এমনভাবে সাহায্য করতে হ্বে যাতে সেটা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিপ্লবের কাজকে ত্বরান্বিত করবে। এসোসিয়েসনের (দলের) নীতি ও আদর্শের কথা মনে রেখেই্ এসব সংগঠনের ছেলেদের, জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য করে, যে যে কাজে প্রয়োজন, সেই্সব রাজনৈতিক কাজে, নিযুক্ত করতে হবে।

"১০। প্রতিটি জেলা সংগঠনকে তার নিকটবর্তী সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও শ্রমিকদের কর্মস্থলে গিয়ে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে চাষী মজুরদের বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রতি সমর্থক ও দরদী করে তুলতে হবে।

"১১। জেলার কর্মীদের কাজ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিভাগে জেলার কাজকে ভাগ করতে হ্বে :

(ক) গ্রামীণ কাজ।

(খ) গোপনীয় কাজ।

(গ) স্থানীয় ক্লাব ও সংগঠনগুলির মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ।"

(তথ্য, 'Terrorism in Bengal', Vol I, Page 415')

এই্ ব্যাপক সুসংগঠিত কর্মকাণ্ডের কর্মসূচীর মধ্যে ভগৎ সিং হাজির হন, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছে, ২৩টি নির্বাচিত জেলার অন্যতম কর্মচঞ্চল জেলা, বিপ্লবকেন্দ্র কানপুরে।

প্রথমদিকে কানপুর শহ্রে, মন্নীলালজী অবস্থী'র বাড়িতে ভগৎ সিং-এর থাকার ব্যবস্থা করা হ্য়। এই্ সময়টা ভগৎ-এর কাটে বেশ কষ্টের মধ্য দিয়ে। সাথী শিব বর্মা তাঁর 'শহীদ স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রতাপে (পত্রিকা) কাজ শুরু করার আগে কিছু দিন সে (ভগৎ) কাগজ বেচে চালিয়েছে।" অপরসাথী যশপাল তাঁর 'সিংহাবলোকনে' লিখেছেন, "কানপুরে প্রথমদিকে ভগৎ সিং খবরের কাগজ বেচে পেট চালিয়েছে। পরে, স্বর্গীয় গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর বিশ্বাসভাজন হ্য়ে, সে 'প্রতাপ'-এ কাজ করতে থাকে। কানপুরে থাকার সময় ভগৎ সেই্সময়ের যুক্তরাজ্যের বিপ্লবী যুব ছাত্র নেতা শিব বর্মা, জয়দেব কাপুর, বিজয় কুমারদের সঙ্গে পরিচিত হ্য়। কিন্তু অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে তখন অবধি তাঁর পরিচয় হ্য়নি।" আর এক জীবনীকার বীরেন্দ্র সিঁধু লিখেছেন, "কানপুর কেন্দ্রের কাজ সেসময় যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী দেখছিলেন। ভগৎ সিং তাঁর সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। ঐখানেই্ বটুকেশ্বর দত্ত, অজয় ঘোষ, বিজয়কুমার সিন্হ্া প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ্য়। প্রথমদিকে তো ভগৎ সিংকে খবরের কাগজ বিক্রী করে খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করতে হ্য়। এর পর গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর

'প্রতাপ' কাগজের সম্পাদনা বিভাগে ছদ্মনাম 'বলবন্ত সিং'—এই নামে ভগৎ কাজ করতে থাকেন।…"

ঘটনার উল্লেখ থেকে মনে হয়, কানপুরে পাটকাপুর অঞ্চলে অবস্থিত, মূলত বাঙালী বাসিন্দাদের এক মেসবাড়িতে, যোগেশ চ্যাটার্জী ভগৎ সিং-এর থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু চেহারা ও সাজপোশাকে একজন শিখ যুবক সম্পর্কে সন্দেহবশে পুলিশী তৎপরতা হতে পারে, এই চিন্তা করে, যোগেশ চ্যাটার্জী ভগৎ-এর অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করেন।

যোগেশ চ্যাটার্জীর লেখা 'In search of Freedom'-এর বাংলা অনুবাদ 'স্বাধীনতার সন্ধানে' গ্রন্থে এই বিষয়টার উল্লেখ আছে। "ভগৎ সিং পাটকাপুর মেসে আসিবার পর হইতেই আমরা বিশেষ সতর্ক থাকিতাম। কারণ, বাঙালী মেসে এক শিখ যুবকের উপস্থিতি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে।… এই সময় হঠাৎ ঘটনাচক্রে এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল।

"জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কোন কাজে অপ্রত্যাশিতভাবে কানপুরে আসিয়াছিলেন। পাটকাপুর মেসে ভগৎ সিং-এর বসবাসের ফলে অসুবিধা হইতেছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যার্থীর (গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী) সহিত সাক্ষাৎ করিযা তাঁহাকে একথা জানাইয়াছিলেন।

"বিদ্যার্থীজী খুব আনন্দের সহিত-ই ভগৎ সিংকে 'প্রতাপ' অফিসে একখানি ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ভগৎ সিং সাংবাদিকতা শিক্ষার্থী হিসাবে সেখানে থাকিবেন এবং সেখানে বহুলোকের যাতায়াত থাকায় ভগৎ সিং-এর উপস্থিতি কোন সন্দেহের উদ্রেক করিবে না। তিনি ভগৎ-সিংকে সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য মাসিক দশ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছিলেন।…সুতরাং, এইভাবে তাঁহার বাসস্থানের ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলাম।"

গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী ছিলেন সে সময়ের বিপ্লবীদের কাছে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। মহান দেশপ্রেমিক বিদ্যার্থীজী সম্পর্কে ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী পরবর্তীকালের কম্যুনিস্ট নেতা শিব বর্মা লিখেছেন, "কানপুরের অপর বিখ্যাত ব্যক্তি, যিনি বিপ্লবীদের নানান ভাবে সাহায্য করেছিলেন, তিনি হলেন গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী। তিনিই বিশেষ জোর দিয়ে সকলকে রাজনৈতিক তত্ত্ব, চিন্তার বিষয়ে অধ্যয়ন করতে বলতেন আর বলতেন জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে।" (Selected writings of Shaheed Bhagat Singh—Edited by Shib Verma & foreword by B. T. Ranadive.)

এই বিদ্যার্থীজীই ঘটনাচক্রে কানপুরে শহীদ হয়েছিলেন ভগৎ সিং-এর ফাঁসির (২৩শে মার্চ ১৯৩১) পরদিন, ২৪শে মার্চ, ১৯৩১ তারিখে। যখন সারাভারতের সঙ্গে কানপুরেও ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরুদের হত্যা অর্থাৎ ফাঁসির বিরুদ্ধে হরতাল পালনকে উপলক্ষ করে, বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান হয়। বিদ্যার্থীজী সেই দাঙ্গায় মুশলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হন। (Foreward note of B.T. Ranadive on the Book, 'Selected writings of Shaheed Bhagat

Singh' & G. S Deol on his Book— Page 19, 'Shaheed Bhagat Singh, a Biography')। অন্য অধ্যায়ে, উপযুক্ত স্থানেও এর উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যার্থীজীর 'প্রতাপ' প্রেসে এসে ভগৎ সিং নিজের পরিচয় দিলেন এবং কানপুরে আসার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। বিদ্যার্থীজী ভগৎ-এর কথা শুনে এবং দেশের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা দেখে মোহিত হলেন। ভগৎকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তিনি উপদেশ দিলেন, "দেখ ভাই, স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসা কিন্তু একটি মথের আলোর প্রতি, অগ্নিশিখার প্রতি ভালবাসার পরিণতি ডেকে আনে। আলোর আকর্ষণে অগ্নিশিখার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর কিন্তু সেই মথ আর অন্য মথদের কাছে ফিরে এসে বলার সুযোগ পায় না যে, ভাই ওটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা এবং তোমরাও এসো নিজেদের আত্মাহুতি দিতে।"

বিদ্যার্থীজীর এই ব্যাখ্যা শুনে ভগৎ বললেন, "আমি এখানে দেশের মুক্তির জন্য এই প্রতিজ্ঞা করেই এসেছি যে, করঙ্গে ঔর মরেঙ্গে, Do and die."

বিদ্যার্থীজী বললেন, "দেশের মুক্তি আন্দোলনের সৈনিককে কিন্তু সমস্ত রকম প্রলোভনের উর্ধ্বে উঠতে হবে, নারীর প্রতিও কিন্তু লোভ বা মোহ থাকা চলবে না।"

শোনা যায়, পরম আবেগ ও শ্রদ্ধায় বিদ্যার্থীজীর পদস্পর্শ করে ভগৎ ঐ সমস্ত উপদেশ ও বিপ্লবী জীবন যাপনের শর্ত মানার প্রতিজ্ঞা করেন এবং বলেন, "দেশের মুক্তিযজ্ঞে আমি একজন সৈনিক হিসেবে আপনার উপদেশাবলী মেনে চলব এবং হাসিমুখে সমস্ত প্রকার অবস্থার মোকাবিলা করব।"

বিদ্যার্থীজীর পরামর্শে ভগৎ তাঁর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম নিলেন, বলবন্ত। 'প্রতাপ' প্রেসে তাঁর কাজ চলতে থাকল। কাজের ফাঁকে, অবসর সময়ে, ভগৎ তাঁর গভীর অধ্যয়নের কাজ চালাতে থাকলেন। দেশ-বিদেশের মুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লবের বিস্তৃত ইতিহাস, সমাজতন্ত্রের আদর্শ, কম্যুনিস্ট নীতি ও পথ ইত্যাদি নানান বিষয়ের ওপর পড়াশুনা করতে থাকলেন। 'প্রতাপ' প্রেস ছিল সেই সময়ের রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও বিপ্লবীদের মিলন কেন্দ্র। সেই সূত্রে একে একে বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে ভগৎ-এর পরিচয় হতে থাকল। ঘনিষ্ঠতা হল, চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত, বিজয় কুমার সিন্‌হা, অজয় ঘোষ, যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে। নিজেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন, 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের' কাজের সঙ্গে।

ভগৎ সিং-এর সাথী ও পরবর্তীকালে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা, সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ ১৯৪৫ সালে বম্বে থেকে প্রকাশিত 'ভগৎ সিং এণ্ড হিজ কমরেডস' পুস্তিকায় এই সময়ের ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন, "কিছুদিন বাদে ভগৎ-এর সঙ্গে আবার দেখা হল। দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা হল। এটা সেই সময় যখন আমরা অপরিণত বুদ্ধির বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম।…অনেক কথা ভুলে গেছি, কিন্তু ভগৎ-এর সেইসব আলোচনার কথা মনে আছে যাতে সে ঐ বয়সেই দেশের বুকে মানুষের আন্দোলন সম্পর্কে অনীহা, ঔদাসীন্য, নিস্ক্রিয়তার অবস্থা নিয়ে মতামত দিত। আলোচনা করত এই কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করে, কিভাবে মানুষকে জাগানো যায় এইসব বিষয়ে।…

"এলোমেলো ভাবে চলতে চলতে আমাদের কথাবার্তা অতীত দিনের বিপ্লব-প্রয়াসের ঘটনাবলীতে নিবদ্ধ হোত। সেই সময় দেখতাম, ১৯১৫-১৬ সালের বিপ্লবী শহীদ, বিশেষ করে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কেন্দ্রীয় চরিত্র বিপ্লবী শহীদ সর্দার কর্তার সিং-এর কথা বলতে বলতে ভগৎ-এর মুখচোখ পাল্টে যেত।··· আক্ষরিক অর্থেই আমি ছিলাম কর্তার সিং-এর পূজারী। কাজেই যখন কাউকে আমার জীবনের মহান নায়ককে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে দেখতাম, তার প্রতি আমার ভালাবাসা ও প্রীতিও গভীর হোত। এইভাবে, ধীরে ধীরে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে গড়ে উঠল আমার গভীর প্রীতির বন্ধন। ভগৎ কানপুর ছেড়ে যাবার আগে অবধি সে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যদিও তাঁর আপাত দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বন্ধুসুলভ মজা করতেও আমি ছাড়তাম না।"

প্রখ্যাত বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর ভগৎ সিং সম্পর্কে সেই সময়ের মূল্যাযন ছিল উল্লেখযোগ্য :

"তিনি (ভগৎ সিং) অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং বহু বিষয়েই তিনি কৌতূহল প্রকাশ করিতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা আলোচনা করিতাম, দেশের ব্যাপক রাজনৈতিক পবিস্থিতি, কি ধরনের বিপ্লব ভারতের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী ও অন্যান্য দেশের বিপ্লবেব ভিন্ন ভিন্ন দিক।

"বিশেষ করিয়া আলোচিত হইত রাশিয়ার বিপ্লবের প্রকৃতি ও রূপরেখা। কারণ, দেশ জুড়ে লোক তখন ভাবতে শুরু করেছিল যে, আগামী দিনের বিশ্বব্যাপী মহান্ বিপ্লবের ফলে যে সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তন দেখা দিবে, তাহার প্রকল্পরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা রুশ দেশের বিপ্লবের মাধ্যমেই রচিত হইতেছিল। ভগৎ সিং কমিউনিস্ট নীতি কি, তাহাও জানিতে চাহিতেন। তাঁহার জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে চাহিত না এবং তিনি অন্ধভাবে কোন নীতি অনুসরণ করিতেন না। তাহার তরুণ মন নূতন আদর্শকে বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য সর্বদা সচেতন থাকিত।" ('স্বাধীনতার সন্ধানে')।

মাত্র ১৭ বছরের এক সদ্য যুবক সম্পর্কে এই ধরনের সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন বলেই, শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জী ভগৎকে পাঠিয়েছিলেন, আলিগড জেলার, শাদীপুর গ্রামের ন্যাশনাল স্কুলে ; হেড মাস্টার নির্বাচন করে। সাধারণ অবস্থায় যা চিন্তাই করা যায় না, তেমনি এক দুঃসাহসিক কাজের দায়িত্ব চাপান হয়েছিল সত্যিকারের উপযুক্ত ১৭ বছরের যুবক ভগৎ সিং-এর কাঁধে। যোগেশ চ্যাটার্জীর এ এক বৈপ্লবাত্মক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত। তাঁর নিজের বিশ্লেষণে :

"ভগৎ সিংকে আলিগড়ে প্রেরণ করিবার পশ্চাতে আমার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। অর্থ সঙ্কট খুবই তীব্র ছিল. তবে আমরা কোন রকমে চালাইয়া যাইতেছিলাম। আমাদের সংগঠন প্রসারের প্রয়োজন ছিল এবং ভগৎ সিং একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হওয়ার ফলে আমাদের নিকট এই ব্যাপারে একটি বিরাট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার আলিগড় যাওয়ার অর্থই ছিল আমাদের সংগঠনের অপর একটি সার্থক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।"

প্রখ্যাত গবেষক G. S. Deol লিখেছেন, "তিনি (ভগৎ) প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব, কর্তব্য এমন যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন যে এই বিষয়ে তাঁর কর্মক্ষমতা সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্ররা ভগৎ-এর আকর্ষণীয় মধুর ব্যক্তিত্ব, কর্মের যোগ্যতা ও সাংগঠনিক কুশলতায় প্রভাবিত হয়েছিল।"

এই সময়ের আরও ঘটনা উল্লেখ করে G. S. Deol লিখেছেন, "ভগৎ সিং উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাবের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সেইসব যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন যাদের মধ্যে বিপ্লবের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস আছে। এইসব যুবকদের 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনে'র সঙ্গে যুক্ত করতে প্রেরণা যোগাতেন ভগৎ। দেশের মানুষকে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে ভগৎ নানান প্রচারপত্র লিখতেন ও ছাপিয়ে প্রচার করতেন। তিনি জেলায় অনুষ্ঠিত মেলাগুলিকে এই প্রচারের কাজে ব্যবহার করতেন, যেহেতু, মেলার মুক্ত পরিবেশে মানুষ খোলা মনে তাঁদের বক্তব্য শুনতে পারতেন। মানুষ এখানে স্বেচ্ছায় সমবেত হয়, ফলে জন সমাবেশ করার সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় না। এছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের শিথিলতার কারণে মেলাগুলিতে মানুষ মন খুলে বক্তব্য শুনতে পারে এবং রাজনৈতিক বক্তব্য মানুষের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়। এই বিষয়ে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেটা প্রমাণ করবে, ভগৎ সিং কি দুর্দমনীয় সাহসের সঙ্গে নির্ভয়ে এই গণপ্রচারের কাজে অংশ নিতেন। ঘটনাটি এইরকম :

"তখন পূজার (দশেরা) উৎসবের সময়, কানপুরের প্রতাপ প্রেসে বিপ্লবী চিন্তা সম্বলিত হিন্দীভাষার প্রচার পত্র ছাপান হযেছে। ভগৎ সিং তাঁর পাঁচজন সাথীকে নিযে বেরুলেন এই প্রচারপত্র বিতরণে। প্রতাপগডে তাঁরা এলেন এক মেলায। উৎসবের পোষাকে সুসজ্জিত মানুষজন নাচে গানে মেলাপ্রাঙ্গণকে উৎসব মুখর করে তুলেছে। ভগৎ সিং-দের হাতে হিন্দীতে লেখা ছাপান প্রচারপত্র, 'জাগো মেরে দেশ কে লোকো' (দেশের মানুষ জেগে ওঠো)। দেখে শুনে একটা জায়গা নির্বাচন করলেন ভগৎ, যেখানে মানুষজনের ঘন জমায়েত, জমাট ভীড়। বিলি হতে থাকল ছাপান প্রচারপত্র। চলতে থাকল প্রচার অভিযান।

"ভীড়ের মধ্যে সাদা পোষাকে ছিল কয়েকজন পুলিশের লোক। তারা প্রচারপত্র হাতে আসা মাত্র প্রচারকারীদের আক্রমণ করল এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করল। দুজন সাথীকে পুলিশের হাতে বন্দী হতে দেখে ভগৎ এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি দ্রুত একটু দূরে একটা ভীড়ের মধ্যে অতি গোপনে সমস্ত প্রচারপত্র ছুঁড়ে দিলেন। লোকেরা সেগুলি যেই সংগ্রহ করতে ছুটল অমনি ভগৎ পুলিশের লোকজনের কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখ ওদিকে কংগ্রেসের লোকেরা প্রচারপত্র বিলি করছে আর লোকে সেদিকে ছুটছে।' গ্রেপ্তার করা সাথীদের পাহারা দেবার জন্য রইল মাত্র দুজন পুলিশ, বাকীরা ছুটল সেদিকে। সেই ফাঁকে ভগৎ তার বাকী সাথীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাহারারত দুই পুলিশের ওপর। সাথীদের মুক্ত করে সকলে ছুট লাগালেন মেলা থেকে। অবস্থা দেখে, পুলিশও তাড়া করল তাঁদের। পেছনে ছুটে আসা পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ভগৎ তাঁর পিস্তল

থেকে তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়লেন আকাশে। আতঙ্কিত পুলিশ বিপ্লবীদের ধরার আশা ছেড়ে দিয়ে, ভয়ে থমকে দাঁড়াল।"

শিক্ষকতা, জ্ঞানার্জন, সাহসিকতাপূর্ণ সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ নিজেকে ঐ বয়স থেকেই যুক্ত করেছিলেন সামাজিক সেবামূলক কাজে। ১৯২৪ সালের ২৬ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর অবধি টানা চারদিনের প্রবল বর্ষণে তৎকালীন যুক্ত রাজ্যের গঙ্গা, যমুনা ও রামগঙ্গা নদীতে প্রবল প্লাবন দেখা দিয়েছিল। ভেসে গিয়েছিল অসংখ্য জনপদ। অতীতের বন্যার সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দেওয়া এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভগৎ সিং, অক্টোবর ১৯২৪ সালে ব্যাপক ত্রাণকাজে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

ভগৎ সিং-এর ঘরে ফেরা :

১৯২৪ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ভগৎ সিং লাহোর ছেড়ে পলাতক হয়েছিলেন। হাজির হয়েছিলেন যুক্ত রাজ্যের কানপুরে। যুক্ত হয়েছিলেন বিপ্লবী দলের কাজ-কর্মে। এমনি করে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। পরিবারের মানুষ প্রবল দুশ্চিন্তায় দিন কাটিয়েছেন। ভগৎ-এর ঠাকুরমা দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তিনি তাঁর আদরের নাতিকে একবার দেখতে চান। ভগৎ-এর পিতা কিষেণ সিং-এর কাছে তাঁর দাবী, যেভাবেই হোক, আদরের নাতিকে নিয়ে এসো আমার কাছে, আমি তাকে একবার দেখব। কিন্তু কোথায় ভগৎ সিং? সে তো ঘরে চিঠি লিখে রেখে, সেই যে পলাতক, নিরুদ্দেশ, কোথাও তার হদিশ মিলছে না।

নিরুপায় কিষেণ সিং, 'বন্দেমাতরম' কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপালেন। 'ভগৎ সিং যেখানেই থাক, ফিরে এসো। ঠাকুরমা গুরুতর অসুস্থ।' কিন্তু, এই বিজ্ঞাপন হয়ত নজর এড়িয়ে গেছে। কিংবা, 'বলবন্ত' নামের ভগৎকে এ খবর পৌঁছে দেবার প্রয়োজন দেখেনি কেউ।

তাহলে ঘরে ফেরার পর্বটা ঘটল কি করে?

G. S. Deol লিখেছেন, "সৌভাগ্যক্রমে, ভগৎ সিং মন্টগোমারীর জিক্কারা নিবাসী বন্ধু রামচন্দ্রকে একখানা চিঠি লেখেন। ভগৎ-এর আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জয়দেব গুপ্তা কোনভাবে ঐ চিঠির খবর জানতে পারে।

'কানপুর থেকে বাড়ি ফেরার বিষয়ে লোকেদের মধ্যে ভিন্ন মতও আছে। কেউ বলে, ভগৎ-এর নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। আবার কেউ বলে, না টেলিগ্রাম নয়, একখানা চিঠি এসেছিল সেটাই ঘটনার মোড় ফেরায়। কিন্তু, সত্যি ঘটনা হল বন্ধু জয়দেব গুপ্তার কাছে খবর পৌঁছান। জয়দেব বন্ধু রামচন্দ্রকে অনুরোধ করে তার সঙ্গে ভগৎ-এর খোঁজে কানপুর যাবার জন্য। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসের কোন এক সময় দুই বন্ধু কানপুরে আসে। 'প্রতাপ' প্রেসের ঠিকানায় তারা গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীজীর সঙ্গে দেখা করে। বিদ্যার্থীজীকে তারা ভগৎ-এর ঠাকুরমার গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হবার কথা জানায় এবং নাতিকে একবার দেখবার বাসনার আর্তির কথাও শোনায়। জয়দেব গুপ্তার বিশ্বাস

ভগৎ তাদের দেখে লুকিয়ে থাকে। কাছে আসে না। ফলে, তারা বিদ্যার্থীজীর কাছে দুটি সংবাদ রেখে আসে। এক, ঠাকুরমার গুরুতর অসুস্থতার কথা। দুই, ভগৎ-এর গুরুজনদের আশ্বাস, যে ভগৎ ঘরে ফিরলে তাকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলা হবে না। দুই বন্ধু বিদ্যার্থীজীর কাছে এই দুটো সংবাদ রেখে লাহোরে ফিরে আসে। জয়দেব ভগৎ-এর বাবা কিষেণ সিং-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর কানপুরের বন্ধু মৌলানা হসরৎ মোহানির[১১] কাছে ভগৎ সিং-এর উদ্দেশ্যে, একটা চিঠি পাঠাতে অনুরোধ করে ; যাতে পরিষ্কার করে ভগৎকে এই আশ্বাস দেওয়া হবে যে, সে ঘরে ফিরলে তাকে কেউ বিয়ের জন্য বলবে না। সেটাই বাস্তবায়িত হয়। ভগৎকে তাঁর বাবা কিষেণ সিং-এর চিঠি দেখান হয়। কিষেণ সিং-এর বন্ধু, মৌলানা হসরৎ মোহানিও বিদ্যার্থীজীকে অনুরোধ করেন, যাতে ভগৎ লাহোরে ফিরে যায়। সকলের এই সমবেত প্রচেষ্টায় এবং বাবা কিষেণ সিং-এর লিখিত পত্রের আশ্বাস পেযে ১৯২৫ সালের শুরুতে ভগৎ সিং তাঁর ঘর, লাহোরে ফিরে যান।

"লাহোরে ফিরে ভগৎ দিবা রাত্রি তাঁর শয্যাশায়ী ঠাকুরমার সেবা করতে থাকেন। ঠাকুরমা কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঠাকুরমা সুস্থ হয়ে উঠলেও, ভগৎ তৎক্ষণাৎ কানপুরে ফিরে যাননি।"

কানপুরে থাকাকালীন ভগৎ-এর দিন কেমন কেটেছিল, সেটা টের পাওযা যায় তাঁর লাহোরে ফিরে আসার পর। সাথী, সহযোদ্ধা ও পরবর্তীকালে সাহিত্যিক যশপালের 'সিংহাবলোকন' এবং শিব বর্মার 'শহীদ স্মৃতি' গ্রন্থে এই চেহারার উল্লেখ আছে এইভাবে :

"মাথার পাগড়ির স্থান নিয়েছে এক টুকরো মামুলি কাপড়ের মত গামছা। দেহে কেবল একখানা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট। এটা সেই কোট, যেটা ভগৎ লাহোর ছাড়বার সময় জামার ওপরে পরে গিয়েছিল। এখন সেই জামাটা অদৃশ্য, লুপ্ত হযে গেছে। পরনেব পাজামার জায়গায় রয়েছে একটা লুঙ্গি। পাজামার পা আর কোর্টের আস্তিন ফেটে ছিঁড়ে যাওয়ায়, পাজামার পা কোটের হাতা বা আস্তিনের সঙ্গে সে জুড়ে নিয়েছে। এইভাবে কোনরকমে সে শরীরটুকু ঢাকার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু পোশাকের এই করুণ অবস্থার মধ্যেও ভগৎ-এর কোটের পকেটে কিছু না কিছু বই সর্বদা অবশ্যই থাকত।"

বিপ্লবী জীবনের সূচনা পর্বেই, ভগৎ সিং এইভাবে কষ্টসহিষ্ণুতা এবং প্রথাগত প্রাত্যহিক সুখের প্রতি নির্লিপ্ততার, জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখেছেন।

গোপন ইশ্‌তেহারের প্রচার ও প্রসার প্রয়াস :

এই সময়, 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের' নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দলের চিন্তা ও কর্মসূচীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য নানান পুস্তিকা ও ইশ্‌তেহার প্রকাশ করতে থাকেন। সমস্ত রকম গোপনীয়তা অবলম্বন করে সুকৌশলে তিনি বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, যুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে নানান ভাষায় ইশ্‌তেহার বিলির ব্যবস্থা করেন। পুলিশী রিপোর্টে এমন অনেকগুলি ইশ্‌তেহারের উল্লেখ আছে। ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীরা এইসব প্রচারপত্র বিলির কাজে সক্রিয় অংশ নেন।

'ওঠো জাগো', ইশ্‌তেহারটি ১৯২৪ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার স্কুল, কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক হারে বিলি করা হয়। সে সময় রেগুলেশন থ্রি, এবং 'অর্ডিনান্সে'র বলে যে পাইকারী হারে গ্রেপ্তার হয়, তার বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগাতেই এই ইশ্‌তেহার।

'ওঠো জাগো'—নামে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইশ্‌তেহারের আহ্বান ছিল : "হে বাঙালী, তুমি আর কত ঘুমোবে? কানাইলাল (দত্ত, বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য ১৯০৮ সালে যাঁর ফাঁসি হয়) চলে গেল, ক্ষুদিরাম (বসু, মিস্ ও মিসেস কেনেডি হত্যায ১৯০৮ সালে যাঁর ফাঁসি হয়) চলে গেল, প্রফুল্ল (চাকী, ক্ষুদিরামের সহযোগী যিনি আত্মহত্যা করে শহীদ হন) চলে গেল, যতীন (মুখার্জী, যুগান্তব দলের নেতা, পুলিশেব সঙ্গে সংঘর্ষে বালেশ্বরের কাপটিপোডায ১৯১৫ সালে যিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন) চলে গেল। শত শত তরুণ তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন দিল, বুকের রক্ত ঢেলে দিল। কিন্তু তুমি আর কতদিন ঘুমোবে আর সুসময়ের প্রতীক্ষা করবে? দাসত্বের পাঁকে নিমগ্ন থেকে কতদিন তোমার দেশের মানুষকে এভাবে মরতে দেখবে? হায় বাঙালী! এই শেয়াল কুকুরের মত বেঁচে থাকা কি তোমায মানায?

"তুমি ছাড়া এই ভারবর্ষকে পরাধীনতা থেকে কে মুক্ত করবে? তোমাকেই না পরাধীনতার শৃঙ্খলকে সশব্দে ভাঙতে হবে? তাহলে কেন তুমি জেগে ঘুমোচ্ছ? আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী ডি ভেলেরা, রাশিয়ার লেনিন, সর্বজনমান্য ইটালীর মাৎসিনী, গ্যারিবল্ডি, ভারতের রাজপুত বীর এবং পৃথিবীর অন্যান্য বীরদের কথা স্মরণ করো।

"আজ প্রতিজ্ঞা কব, শপথ নাও, স্বাধীনতার পথের সমস্ত কাঁটা উপডে ফেলবে। ভেবে দেখ, পৃথিবীব ইতিহাসে প্রতিটি মানুষ, সে শক্তিমান রাজা, যে মানুষেব স্বাধীনতাকে খর্ব করে, সেই রাজাসহ, একজন অতি সাধারণ মানুষকেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয। ভেবে দেখ, গ্রীস, রোম, আমেরিকা, জাপান, সমস্ত দেশই স্বাধীন। কিন্তু তোমার ভারতবর্ষই একমাত্র পরাধীন।

"আজ থেকে তোমার প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, ভারতের মুক্তির কাজে লাগুক। জীবন কি এতই প্রিয, সুখ কি এতই মধুব যে তার বিনিময়ে বন্দীত্ব এবং দাসত্বকে মেনে নিতে হবে? "বন্দে মাতরম"

(Terrorism in Bengal , Vol-I, Page- 401)

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল নিজের নামে আর একটি সাড়া জাগানো বাংলা ইশ্‌তেহার, 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন' প্রকাশ করেন ১৯২৫ সালের জানুযারী মাসের প্রথমদিকে। এটি প্রকাশিত হয় কাশ্যপাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া জেলা থেকে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ভিন্ন ভাষায় এর প্রচার হয়। জাপানের টোকিওতে রাসবিহারী বসুর কাছে পাঠান এই ইশ্‌তেহারের কিছু কপি মাদ্রাজ পুলিশের হস্তগত হয।

এই ইশ্‌তেহারের শুরুতেই পাঠকদের প্রতি আবেদন ছিল, "দয়া করে আপনি নিজে

এই আবেদনটি সম্পূর্ণভাবে পড়ুন এবং তারপর আপনার বন্ধুদের পড়ান। লক্ষ্য রাখুন, যাতে প্রতিটি ইশ্‌তেহারের কপি কমপক্ষে ২০ জন পড়েন।”

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, Bengal Criminal Law Amendment Ordinance 1 of 1924 আইনবলে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ তারিখে গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর এইভাবে ফের গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান তিনি। অথচ গ্রেপ্তার হবার আগেই খবরের কাগজে তাঁর গ্রেপ্তারের কাহিনী ছাপা হতে থাকে। তাই এই ইশ্‌তেহারের শুরুতেই সে কথার উল্লেখ করেন তিনি, “…যারা আমাকে ভালবাসেন এবং আমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাঁদের জানাই যে এখনও অবধি আমি গ্রেপ্তার হইনি, যদিও এটা খুব সত্য যে আমাকে যে কোন মুহূর্তে জেলে যেতে হতে পারে, কারণ কোন পরাধীন ভারতবাসীর জীবনই আজকের দিনে নিরাপদ নয়। পরাধীনতার ফল ভুগতেই হবে। আমি কোন অবস্থাতেই বৃটিশ অফিসারদের দোষ দিই না। এদের একমাত্র দোষ যে এরা আজকের দিনের ভীরু, দুর্বল ও পুরুষত্বহীন ভারতীয়দের প্রভু। ভারতবাসী আজ দুর্বল এবং পৌরুষহীন। তারা ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না।… এই কারণেই ইংরেজরা আমাদের প্রভু এবং আমরা তাদেব দাস।

“…যারা বলে যে, দেশে কোন বিপ্লবীদল নেই, কাজেই বর্তমানের দমনমূলক আইন অপ্রয়োজনীয়, তারা সত্যি কথা বলে না। কারণ, বাস্তবে সারা ভারত জুড়ে একটা বড় মাপের বিপ্লবী দল সচল আছে। এইদল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা আনবার চেষ্টা চালাচ্ছে। মহাত্মা গান্ধীর মত একজন বড মাপের মানুষ ও অন্যান্য নেতারা থাকা সত্ত্বেও এই দলের সদস্যরা কিন্তু কোন প্রকার প্রভাবিত হয়ে তাদের বিপ্লবের পথ থেকে সরে আসেনি।…

“…বিপ্লবী দল, ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানাতে চায়। এই দল চায় এমন রাষ্ট্র, যেখানে দরিদ্র ভারতবাসীর ওপর ধনিক শ্রেণী তাদের বিশেষ সুবিধা, বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিক সমান অধিকার, সমান ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে।…

“যারা এই বলে অপপ্রচার করেন যে বিপ্লবীদের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের বুকে অরাজকতা ছড়ান, তারা হয় সত্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত নন, অথবা সত্য কথা বলার সাহস রাখেন না। একথা সত্যি যে, বিপ্লবীরা কি চান, সেটা দেশের মানুষের কাছে প্রচারের মাধ্যমে যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারেননি। এর জন্য নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের দোষী সাব্যস্ত করা চলে। কিন্তু, এটা বাস্তব সত্য যে বিপ্লবীরা কখনই কিছু মানুষকে হত্যা করা তাদের কর্তব্য বলে মানেন না।…

“ইংরেজ পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা টেগার্ট, রিডিং অথবা লিটনরা তাদের দমন পীড়ন মূলক ‘রেগুলেশন থ্রি, এবং ‘অর্ডিনান্সের’ স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে, দেশের বুকে যে অরাজকতার কথা বলছে সেটা সর্বৈব মিথ্যা। আসল কথা এবং সত্য হল, ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের বুকে মনুষ্যত্বের জাগরণকে ভয় পেয়ে তার পাশবিক শক্তি

দিয়ে সেই জাগ্রত মানবাত্মাকে গুঁড়িয়ে দিতে চায়, ধ্বংস করতে চায়। এই দুষ্কর্মের ক্ষেত্রে ইংরেজ রাজশক্তি নির্বিচার। মানুষ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথই নিক অথবা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিক, তাদের দমন পীড়ন অত্যাচার সমানভাবেই প্রযোগ হয়।···

"এ দেশের মানুষ দেশের কাজে সমস্ত প্রকার ন্যায়সঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিরই প্রয়োগ করেছে, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? আমি তাই দেশবাসীর প্রতি, দেশের নেতাদের প্রতি আবেদন রাখছি, আপনারা, সমগ্র পরিস্থিতির যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করুন এবং ভগবানের নামে, বুকে হাত রেখে নির্ভয়ে বলুন, দেশ তার মুক্তিব জন্য, স্বাধীনতার জন্য কোন্ পথ গ্রহণ করবে।"

এছাড়া আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইশ্‌তেহারের কথা উল্লেখ করা যেতে পাবে, যেগুলির মাধ্যমে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের' দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংগঠনিক বিষয়কে ১৯২৫ সাল নাগাদ সারা দেশের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে প্রচারেব ব্যবস্থা হযেছিল। ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ ভোরা, যশপাল, সুখদেব প্রমুখ বিপ্লবীরা, সেই সময় পাঞ্জাবে দলের নেতা এবং ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কাবের পরিচালনায, অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে, এইসব ইশ্‌তেহারের প্রচারের কাজে অংশ নিযেছিলেন।

সেই সময়, ভগৎ সিং যে বিপ্লবী দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত কবেন, তাব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় এইসব ইশ্‌তেহাবের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন, আপসবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়াসের, সাংগঠনিক বিষয়গুলিব সঙ্গেও, পরিচয ঘটে এই সব প্রচারপত্রের মাধ্যমে। সেই অর্থে, এইসব প্রচারপত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পবিচিতি ঘটলে, পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থারও সম্যক উপলব্ধি ঘটে।

ভগৎ সিং-এর সাথী বিপ্লবী যশপাল তাঁব 'সিংহাবলোকনে'র এক জাযগায় লিখেছেন, "এইসময় আমাদের গুপ্ত সংগঠনের কাজের জমি তৈয়ারি করার উদ্দেশ্যে, পাঞ্জাবে H. R A. (হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন)'-র গোপন ইশ্‌তেহাব আনিযেছিলেন অধ্যাপক জয়চন্দ্রজী। কিন্তু এইসব ইশ্‌তেহার বাখা হোত গ্বালমন্ডির ভগবতীচরণের বাড়িতে। সকলের সঙ্গে ভগবতীচবণও এই ইশ্‌তেহারের প্রচারে পুরোপুরি অংশ নিয়েছিল।

"···ভগবতীচরণের সঙ্গে ১৯২৫ সালে H. R. A-র ইশ্‌তেহার বিলি উপলক্ষে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

"এই সময় দলের সংগঠন সম্পর্কে কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট হতে থাকে। হিন্দুস্থান প্রজাতন্ত্রী দলের (হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন) এমনি একটি ইশ্‌তেহার, মুখ্য সেনাপতি 'বলরাজের' নামে বিলি হয়। উপযুক্ত সংগঠন এবং সুষ্ঠু কর্মসূচী ছাড়া এইসব বিপদজনক ইশ্‌তেহার বিলি করা যেত না। সকলের সঙ্গে আমিও এই কাজে অংশ নিই···।"

উল্লিখিত দুটি ইশ্‌তেহার সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। প্রথমটি 'দি রেভলিউশন্যারি' আর দ্বিতীয়টি "ইওলো পেপার"[২০] বা H. R. A-র দলীয সংবিধান। হলদে কাগজে ছাপা হয়েছিল বলে এই ইশ্‌তেহারটিকে সংক্ষেপে বলা হোত, 'ইওলো পেপার'। ১৯২৪

সালের শেষ নাগাদ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এটি তৈরি করেছিলেন এবং অত্যন্ত গোপনে দলের মধ্যে এটি সুসংগঠিতভাবে বিলি করা হয়েছিল। যশপাল সম্ভবত 'বলরাজ' নামাঙ্কিত ইশ্‌তেহার বলতে এটিকেই উল্লেখ করেছেন। কারণ, দলের সাংগঠনিক কাঠামোটি এখানেই বিশ্লেষণ করা হযেছিল।

উল্লিখিত প্রথম ইশ্‌তেহার, 'দি রেভলিউশন্যারি'-র লেখকও ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। কিন্তু, ইশ্‌তেহারটি প্রচাবিত হযেছিল 'রেভলিউশন্যারি পার্টি অব ইন্ডিয়া'র সভাপতি বিজয়কুমারের নামে। প্রকাশকাল, ১৯২৪ সালের শেষভাগ। উত্তর ভারতের সমস্ত বড শহরে এই ইশ্‌তেহার বিলি হযেছিল সুসংগঠিত ও নিপুণ ভাবে, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৪ থেকে ১লা জানুযারী ১৯২৫ সালের রাত্রেব মধ্যে। শিব বর্মার 'Selected writings of Shaheed Bhagat Singh' গ্রন্থে এর যেমন উল্লেখ আছে, তেমনিই, ভগৎ সিং-এব নিজের লেখা 'কেন আমি নাস্তিক' পুস্তিকায এই ইশ্‌তেহার বিলিব সময উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২৫ সালের জানুযারী মাসের শেষভাগ। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টেও এই সমযের কথাই উল্লেখ করা হযেছে। ইশ্‌তেহারের প্রকাশ তারিখ ছিল, ১লা জানুয়ারী, ১৯২৫। ফলে, সম্ভবত এর প্রচারেব সুবন্দোবস্তেব কারণে বাস্তবিক বিলি বন্টন হতে হতে জানুয়ারী মাসেব শেষভাগে পৌঁছতে পারে।

গোযেন্দা পুলিশের তৈরি ১।৯।২৪ থেকে ৩১।৩।২৫ তারিখের সময়ের রিপোর্টে বলা হযেছে, 'পরিষ্কারভাবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এই ইশ্‌তেহারটিব লেখক শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। কেবল বাংলা নয়, সমগ্র উত্তর ভারত, পাঞ্জাব সহ সারা দেশে এটিকে ব্যাপকভাবে প্রচাব করা হয়েছে। এসব জাযগা ছাড়াও ইশ্‌তেহাবটিকে পাঠান হয়েছে বম্বে, রেঙ্গুন এবং পেশোযারে।' ('Terrorism in Bengal,' Volume I, Page 366)।

'দি রেভলিউশন্যারি'-র পরিচয দেওযা হয়েছিল, 'রেভলিউশন্যারি পার্টি অব ইন্ডিযা'র মুখপাত্র হিসেবে। সংখ্যাটি ছিল, ভলিউম ১, সংখ্যা-১। প্রকাশকাল ১লা জানুযারী, ১৯২৫। এর মুখবন্ধে বলা হযেছিল, 'বিনামূল্যে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যাযবিচাব চাই। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য বেঁচে থাকার সমান ও বাস্তব সুযোগ চাই।

'(প্রতিটি সাচ্চা ভারতীযকে অনুরোধ করা হচ্ছে এটি সম্পূর্ণভাবে পড়ুন ও সাথী-বন্ধুদের কাছে প্রচার করুন)'

—'রেভলিউশন্যারী পার্টি অব ইণ্ডিযার ইশ্‌তেহার'

সমগ্র ইশ্‌তেহারটি ছিল চার পৃষ্ঠার। আবেগমযী ভাষায় দেশের মানুষকে, বিশেষত যুব সম্প্রদায়কে হতাশা, ক্লীবত্ব থেকে মুক্ত করে দুর্জয় সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে, সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পডার আহ্বান জানানোর চমৎকার এক ইশ্‌তেহার এটি। কিছু কিছু উদ্ধৃতিই এর জ্বলন্ত প্রমাণ :

"...ইংরেজ রাজশক্তি তলোয়ার ছাড়া এ দেশের ক্ষমতা দখলে রাখতে পারবে না। কাজেই বিপ্লবীদেরও তলোয়ারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কিন্তু এ তলোয়ারের আসল ধার, তীক্ষ্ণতা হল এর নীতি ও আদর্শবাদের মধ্যে।

"দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এই বিপ্লবী দলের আশু উদ্দেশ্য হল, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতীয় রাজ্যগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র, (Federal Republic of United States of India) গঠন করা। এই প্রজাতন্ত্রের চূড়ান্ত সংবিধান তখনই তৈরি হবে এবং ঘোষিত হবে, যখন এ দেশের জনপ্রতিনিধিরা জনসাধারণের দ্বাবা নির্বাচিত হয়ে এই কাজ করার উপযুক্ত ক্ষমতা পাবেন। সর্বজনীন ভোটাধিকার হবে এই প্রজাতন্ত্রেব মৌলিক ভিত্তি। এই প্রজাতন্ত্রের মৌলিক নীতি হবে সেই সমস্ত ব্যবস্থার সমূল উৎপাটন, যার মাধ্যমে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ করা হয়।··· এই প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে বিদ্রুপ বা উপহাসের বস্তু হযে না পড়ে, সেইজন্য এই প্রজাতন্ত্রে ভোটদাতাদের তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ইচ্ছে হলে, আইনসভা থেকে ফিরিযে আনার অধিকার, যাকে Right to recall বলা হয, সেই অধিকার নিশ্চিত সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। এই প্রজাতন্ত্রে আমলাতন্ত্রকে প্রযোজনে দমন করার ব্যবস্থা হিসেবে, জনপ্রতিনিধিদের উপযুক্ত ক্ষমতা দেওযা হবে।

"এই বিপ্লবী দল আদৌ সঙ্কীর্ণ জাতীয় দল নয়। এই দল আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী।···

"এই বিপ্লবী দল তার নীতি হিসাবে, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে, যখন সম্ভব এবং উচিত হবে, তখন সহযোগিতা কববে এবং প্রযোজনে এদের থেকে দলকে বিচ্ছিন্ন রাখবে। এই বিপ্লবী দল তথাকথিত নিযমতান্ত্রিক আন্দোলনকে ঘৃণা কবে এবং বিদ্রুপের দৃষ্টিতে দেখে। নিযমতান্ত্রিক পথে দেশের মুক্তি আসবে—এটা একটা উপহাসাত্মক বা ব্যাঙ্গাত্মক কথা। যে দেশে নিয়মই নেই, সংবিধানই নেই, সেখানে নিয়মতান্ত্রিক পথের কথাটা একটা বিদ্রুপাত্মক কথা।

"শান্তিপূর্ণ এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে ভাবতেব রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনা সম্ভব বলে যা বলা হচ্ছে সেটা নিছক আত্ম-প্রতারণা।···

"আমাদের জননেতারা বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বশাসন অর্থাৎ, স্বাধীনতা চাই, মুক্তকণ্ঠে এটুকু বলতেও দ্বিধাগ্রস্ত···

"···ভারতের যুবকগণ, মোহ ঝেড়ে ফেল, দৃঢ়চিত্তে যা সত্য, যা বাস্তব, তার মোকাবিলা কর। চলার পথের সমস্যা, সংগ্রাম ও আত্মবলিদানকে পাশ কাটাতে চেয়ো না। যা অবশ্যম্ভাবী তা ঘটতে দাও। আর বিপথগামী হয়ো না। মনে রেখো, শান্তিপূর্ণ এবং বৈধপথে তোমার ঈপ্সিত শান্তি ও সুস্থিতি মিলবে না।···

"সন্ত্রাসবাদ এবং অরাজকতাবাদ সম্পর্কে আরও দু-একটা কথা। আজকের ভারতে এই দুটিকথা সবচাইতে ক্ষতিকারক বা অনিষ্টকারী কাজ করছে। যেখানেই বিপ্লব সংক্রান্ত বিষয়ের অবতারণা হয়, সেখানেই এই কথাগুলির অপপ্রয়োগ ঘটান হয। কারণ, ঐসব শব্দ, বা কথা ব্যবহার করে বিপ্লবীদেব বেশ সহজেই দোষারোপ বা নিন্দা করা চলে। ভারতীয় বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদীও নয়, অরাজকতাবাদীও নয়। এরা কখনোই দেশের বুকে অরাজকতা ছড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে চলে না। সুতরাং এদের কখনোই অরাজকতাবাদী বলা যায় না। সন্ত্রাসবাদও এদের লক্ষ্য নয়। তাই এদের সন্ত্রাসবাদীও বলা যায় না।

এরা কখনোই বিশ্বাস করে না যে অন্যান্য কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদের পথেই দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব। যদিও কখনো কখনো প্রতিশোধাত্মক পদ্ধতি হিসেবে এরা এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটায়, কিন্তু কখনোই এরা নিছক সন্ত্রাসবাদের জন্যই সন্ত্রাসবাদ এই নীতিতে বিশ্বাসী নয়।

"মনে রাখা দরকার, বর্তমান সরকার টিঁকে আছে কেবলমাত্র একটি কারণে যে, বিদেশী রাজশক্তি সাফল্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতে পেরেছে। ভারতের মানুষের বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের প্রতি কোন প্রেম নেই। ওই বিদেশীরা এ দেশে জাঁকিয়ে বসে থাকুক, মানুষ এটাও চায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এই বিদেশীদের জন্যই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ, মানুষ এদের সম্পর্কে ভীত। আর এই ভয় ভীতিই মানুষকে বাধাগ্রস্ত করছে, তার সাহায্যের হাত বিপ্লবীদের দিকে বাড়িয়ে দিতে। বিপ্লবীদের প্রতি মানুষের ভালবাসা নেই, এটা কখনোই সত্য নয়।

"সরকারী সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা পাল্টা-সন্ত্রাসবাদের পথেই করা হবে। সরকারী সন্ত্রাসের ফলে, আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষের মধ্যে এক অসহায়ত্ববোধ ছেয়ে আছে। এই অসহায়ত্ব থেকে তাকে সত্যিকারের সংগ্রামমুখী করতে হলে, তাদের মধ্যে ভরসা জাগাতে হলে, সমাজ প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে, পাল্টা সন্ত্রাসবাদ একটা কার্যকরী পদ্ধতি। তাছাড়া, আমরা এই ইংরেজ প্রভু ও তাদের ভাড়া করা হীন চাকরদের, বাধাহীন নির্লজ্জভাবে, এ দেশের বুকে যা খুশি তাই করতে দিতে পারি না। এদের এসব কুকর্ম রুখবার জন্য, বাধাসৃষ্টি করার জন্য, যা করা দরকার তা করা হবে।···

"কিন্তু এসব সত্ত্বেও দল কখনোই ভুলে যায় না যে সন্ত্রাসবাদ তার পথ নয়। এই কারণেই, তারা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক সর্বস্তরে মুক্তির জন্য সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে একদল আত্মোৎসর্গকারী, নিবেদিত প্রাণ যুবক, কর্মীকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করতে চায়। অপ্রতিহত গতিতে এই প্রচেষ্টা চলেছে।

"বিপ্লবী দল সর্বদা একথা মনে রাখে যে, নতুন একটা জাতিকে গডতে হলে হাজার হাজার নিঃস্বার্থ যুবক, যুবতীদের প্রয়োজন। যারা অজ্ঞাত, অখ্যাত থেকেও, নিজেদের সুখ, শান্তি, স্বার্থ ও আপন জীবনের চেয়েও বড করে দেখবে তার আদর্শকে, দেশের মানুষের প্রয়োজনকে।"

ভগৎ সিং তাঁর 'কেন আমি নাস্তিক' পুস্তিকায় যে 'রেভোলিউশন্যারি লিফলেটের' উল্লেখ করেছেন, সংক্ষেপে এটাই সেই লিফলেট বা ইশ্‌তেহারের বক্তব্য।

ভগৎ সিং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় যে দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, সেই 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন'-এর গঠনতন্ত্র ছাপান হয়েছিল হলুদ রঙের কাগজে এবং সেই সুবাদে এর পরিচয় ছিল 'ইওলো পেপার'। এই গঠনতন্ত্রের কিছু বিশিষ্ট অংশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যেতে পারে। এটিও তৈরি হয়েছিল শচীন্দ্রনাথ সান্যালের প্রয়াসে ১৯২৪ সালের শেষ ভাগে।

দলের গঠনতন্ত্রে নাম, উদ্দেশ্য ইত্যাদির পরেই এসেছে 'পরিচালক সমিতি'র কথা :

"প্রতিটি প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'কেন্দ্রীয় পরিষদএর হবে দলের পরিচালক সমিতি। এই 'কেন্দ্রীয় পরিষদ'-এর সিদ্ধান্তই সন্দেহাতীত ক্ষমতা হিসেবে প্রযোগ হবে।

"কেন্দ্রীয় পরিষদ সমস্ত প্রদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল থাকার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের কাজকর্মের মধ্যে সংহতি বিধান কবা, সংযোজন করা ও তদারকি করার মুখ্য দায়িত্ব পালন করবে। দেশের বাইরে বিদেশে দলের কার্যাবলীর দেখবহাল করার দায়িত্ব বর্তাবে সরাসরি এই 'কেন্দ্রীয় পরিষদ'-এর ওপর।

"**প্রদেশ সংগঠন :** দলের পাঁচটি বিভাগের সাধারণত পাঁচজন প্রতিনিধি নিযে প্রদেশ কমিটি গঠিত হবে, যারা প্রদেশের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবেন। সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে এই প্রদেশ কমিটি তার সিদ্ধান্ত নেবে। পাঁচটি বিভাগ হল—(১) প্রচার, (২) সভ্য ও কর্মী সংগ্রহ, (৩) দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, (৪) দলের কাজের প্রয়োজনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা ও নিরাপদে মজুত করা, (৫) বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ (সরাসরি কেন্দ্রীয় পরিষদের আদেশের ভিত্তিতে)।...

"চাঁদা এবং স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দানের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রযোগ করে অর্থ সংগৃহীত হবে।...

"যথাসাধ্য চেষ্টা কবা হবে দলের প্রতিটি সভ্যকেই সশস্ত্র রাখার, কিন্তু এই অস্ত্রগুলি দলের বিভিন্ন কেন্দ্রে মজুত রাখতে হবে ; এবং একমাত্র প্রদেশ কমিটির নির্দেশ ও আদেশের বলেই অস্ত্র ব্যবহার করা চলবে।

"বিভাগের প্রধান অথবা জেলার সংগঠক নেতাদের না জানিয়ে জেলার কোন স্থান থেকে কোন অস্ত্র সরিয়ে নিযে যাওয়া চলবে না এবং এদের অনুমতি ছাড়া ব্যবহারও করা চলবে না।...

"জেলার সংগঠক ও নেতারা অবশ্যই নজরে রাখবেন, যাতে দলের সদস্যদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যরা যাতে পরস্পরকে চিনতে না পারে।

"প্রদেশের বিভিন্ন জেলা সংগঠক নেতারাও যাতে পরস্পরের পরিচয় না জানতে পারে তার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে হবে। যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে গোপনীয়তা সুদৃঢ় করতে, এরা যাতে না পরস্পরকে ব্যক্তি বা নামে চিনতে পারে।

"ঊর্ধতন নেতাকে না জানিয়ে কোন জেলা সংগঠক নেতা তার কেন্দ্র ছেড়ে যেতে পারবেন না।...

"**দলের কর্মসূচী :** দলের কার্যাবলীকে দুভাগে ভাগ করা হবে, পাবলিক ও প্রাইভেট।

"**পাবলিক :** (১) ক্লাব, লাইব্রেরী, সেবা সমিতি ইত্যাদি সংগঠন তৈরি করা। (২) শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন গড়া।... কলকারখানা, রেলওয়ে, কযলাখনি ইত্যাদি জায়গায় শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা চেতনা জাগ্রত করা। একইভাবে কৃষকশ্রেণীকেও সংগঠিত করা।...

"বিপ্লবী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কংগ্রেসের প্রভাব এবং অন্যান্য জনসংগঠনের কাজকে দলের প্রয়োজনে ব্যবহার করা।

"**প্রাইভেট** : গোপন প্রচারপত্র ছাপাবার জন্য ছাপাখানার ব্যবস্থা করা, গোপন প্রচার-পত্র বিলি করা, জেলাভিত্তিক দেশের সর্বত্র শাখা কেন্দ্র গড়া, নানান পন্থা পদ্ধতির মাধ্যমে দলের অর্থ সংগ্রহ্ করা, যথাসময়ে প্রকাশ্য গণবিদ্রোহ্ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সভ্যদের বিদেশে পাঠিয়ে সমস্ত দিক থেকে লড়াই পরিচালনার জন্য তাদের শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী এবং স্বদেশে যথাসম্ভব অস্ত্র তৈরির ব্যবস্থা করা, বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহ্‌যোগিতা অক্ষুন্ন রাখা, দেশের সৈন্যবাহিনীতে দলের নির্দিষ্ট সভ্যদের ভর্তি করা, দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে সহানুভূতির আবহাওয়া তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা ও প্রচারের ব্যবস্থা কবা।

"**দলের সদস্য** : সদস্যদের দলের কাজে সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়োগ করা ও প্রযোজনে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সন্দেহমুক্ত মনে দলের জেলা নেতৃত্বের আদেশ কার্যকরী করতে হবে।

"দলের সভ্যকে স্বেচ্ছায় আপন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে মনে রাখতে হবে দলের সাফল্য নির্ভর করছে তার প্রতিটি সদস্যেব উপায় উদ্ভাবনী নৈপুণ্য, স্বেচ্ছা উদ্যোগ এবং কর্তব্য ও দায়িত্বপরায়ণতার ওপর।

"দলের সভ্যরা নিজেদেব এমন কোন আচরণেব সঙ্গে যুক্ত করবে না যেটা দলেব আদর্শ ও সুনামের পরিপন্থী এবং তারা এমন কোন কাজ করবে না যেটা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দলের ক্ষতি করে।

"জেলা নেতৃত্বের অনুমতি ভিন্ন, কোন সভ্য, অন্য কোন সংগঠনেব সঙ্গে, নিজেকে যুক্ত করতে পারবেন না।...

"প্রতিটি সদস্যকে খেয়াল রাখতে হবে যে তার ব্যক্তি আচবণ এবং ত্রুটি দলের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

"কোন সদস্যই জেলা নেতৃত্বের কাছে তাব জীবনের ঘটনাবলী গোপন রাখতে পারবেন না।

"কোন সভ্য বিশ্বাসঘাতকতা করলে শাস্তি হিসেবে বহিষ্কার অথবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

"প্রদেশ কমিটিই একমাত্র শাস্তি দেবার যোগ্য।"

'কেন আমি নাস্তিক' পুস্তিকায় ভগৎ বলেছেন, 'পরবর্তীকালে আমি বিপ্লবী দলে যোগ দিই'। 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন'ই সেই বিপ্লবী দল। যদিও, এর পর, ভগৎ সিং-এর উদ্যোগেই এই দলের নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ ভিত্তিক, নতুন নামকরণ হয় 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসন' ও 'আর্মি'।

H. R. A-দলের সংবিধান, কর্মসূচী, বৈপ্লবিক ইশ্‌তেহারের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে বর্তমান শতকের বিশের দশকে ভারতীয় জাতীয় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের তৃতীয় পর্বে, ভগৎ সিং-রা এমনি একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, যে দলের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়

গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করা এবং যে দলের ওপর ছিল আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ, সোভিয়েত বিপ্লবের সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব। প্রবল নিষ্ঠা, গভীর অধ্যয়ন, জ্ঞান ও চিন্তার অগ্রণী প্রযোগের বৈশিষ্ট্যে, ভগৎ সিং দলের কাজে ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। জীবন সংগ্রামের বৈচিত্রে এগিয়ে যেতে থাকে তাঁর পরবর্তী কার্যাবলী, বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পথে।

জবরদস্ত সংগঠক ভগৎ সিং :

এই ১৯২৫ সালেরই এক ঘটনাব কথা উল্লেখ কবেছেন বীরেন্দ্র সিঁধু, তাঁর 'অমর শহীদ ভগৎ সিং' (হিন্দী) গ্রন্থে: "এই সময় গুরুদ্বারগুলির ওপর স্বার্থবাদী মোহন্তদের প্রভাব দূর কবে, গুরুদ্বাব প্রবন্ধক কমিটিগুলির ওপর গুরুদ্বারেব দেখবহালের দায়িত্ব দেবার উদ্দেশ্যে, অকালী আন্দোলন চলছিল। নানকানা সাহেবে গুলি চালনা ও লাঠি চার্জেব ফলে মৃত শহীদদেব প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ দিবস পালিত হচ্ছিল। নাভার মহারাজও (রিপুদমন সিং) হাতে শোক দিবসের স্মারক কলো ব্যাজ ধারণ করলেন এবং শহীদ দিবসে অংশ নিলেন। ফলে ভাইসরয মহারাজের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁকে গদী থেকে সরিযে দিযে দেরাদুনে নজরবন্দী কবলেন। এরপরই আন্দোলন মোর্চা নানকানা সাহেব থেকে সরে এসে নাভাব 'জৌতো' (Jaitu) তে 'জৌতো মোর্চা' হিসেবে কাজে নামল। সরকারী আদেশে এই আন্দোলনকারী দলকে (Jatha-জাঠা) পানীয় জল দেওয়াও নিষিদ্ধ হল।

"জৌতো যাত্রী একটি দলেব ভগৎ সিং-এর জন্মস্থান, গ্রাম বংগাব ওপব দিযে যাবার কর্মসূচী ছিল। ইংরেজ সরকার ও তার এদেশী ভক্তবা এই কর্মসূচীকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে উঠে পডে লাগে। অপবদিকে, স্বদেশপ্রেমী মানুষ এই দলটিকে সাডম্বরে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দলপতি নেতা সরদার কর্তাব সিং এবং সরদার জোযালা সিং লাহোরে গিযে ভগৎ-এর বাবা কিষেণ সিং-কে অনুরোধ করেন বংগা গ্রামে এসে এই অকালী জাঠা (Jatha) দলকে স্বাগত জানাবার সুবন্দোবস্ত করার। সরদার কিষেণ সিং-এর বোম্বাই যাবার কাজ, (ইনসিওরেন্স কোম্পানীর) আগে থেকেই স্থির ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি ঐ জাঠা দলকে স্বাগত জানাবার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নেন এবং পুত্র ভগৎ সিংকে বংগা গ্রামে পাঠান। গ্রামের মানুষ অকালী দলকে সম্বর্ধনা জানাতে চাইছিল, কিন্তু, সেখানকার অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট সরদার বাহাদুর দিলবাগ সিং (ভগৎ সিং-এর আত্মীয়; এক ইংরেজ-তোষণকারী চাটুকার) এমনি ব্যবস্থা করল যাতে ঐ দল কোন খাদ্যবস্তু না পায়, এমনকি গ্রামের কূঁযাগুলির দডি-দড়া, বালতি, কপিকল অবধি খুলে নেওয়া হল। যাতে তারা পানীয় জলটুকুও না পায়।

"নির্দিষ্ট দিনে অকালী দলের সত্যাগ্রহীরা এল এবং গ্রামের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল। ভগৎ তাদের স্বাগত জানিয়ে জোরদার ভাষণ দিলেন। গুরুদ্বার আন্দোলনের শহীদ-সহ, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের শহীদদের সম্পর্কে, সাহসের সঙ্গে, পরিষ্কার

ভাষায় প্রশংসা করলেন। স্বাগত জানাবার উৎসবে বাজী পোড়ান হল। ভগৎ-এর এসব সাহসিকতাপূর্ণ কাজ দেখে গ্রামের লোকেদের ভয়-আতঙ্ক কাটতে থাকল। সেই রাতেই তারা মণ মণ দুধ, ঝুড়ি বোঝাই রুটি, শাক-সবজি-ডাল বানিয়ে ভগৎ-এর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল। ভোর হবার আগেই ভগৎ, তাঁর বয়সী সাথীদের নিয়ে, মাথায় করে সেসব খাদ্য পানীয় সত্যাগ্রহীদের কাছে পৌঁছে দিলেন। কেবল তাই নয়, অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও গমের খেতে তাদের জন্য খাবার-দাবার রেখে যেতে থাকল এবং সেগুলি তারা সংগ্রহ করে নিলেন। একদিনের জায়গায়, তিনদিন রইলেন সত্যাগ্রহীরা। খাদ্য-পানীয়ের যথারীতি সরবরাহ হল। সারা গ্রামে উৎসবের ধুম-ধাম পড়ে গেল। যাবার সময় সত্যাগ্রহীরা গাইতে থাকল, 'লাজ রখ লী ভগৎ সিং পেয়ারে নে, লাজ রখ লী।' (প্রিয় ভগৎ সিং লজ্জা থেকে সকলকে রক্ষা করল)।"

ভগৎ সিং-এর লাহোর ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন :

সরকার ও তার তোষণকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করার শাস্তি স্বরূপ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরলো ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে। পুলিশ ঘরের দরজায় উপস্থিত। কিন্তু ভগৎ ততক্ষণে নাগালের বাইরে। এলেন লাহোরে। যোগাযোগ করলেন বন্ধু ও সহপাঠী বিপ্লবী সুখদেবের সঙ্গে। সুখদেবের কাছে শুনলেন পাঞ্জাবের ছিন্নভিন্ন বিপ্লবকেন্দ্রের মধ্যেও লাহোরে একটা সেন্টার আছে। তার অধ্যক্ষ একজন বাঙালী। ('বাংলার বিপ্লববাদ', নলিনীকিশোর গুহ)।

কিন্তু, পেছনে তাকাবার সুযোগ নেই তখন। ভগৎ লাহোর ছেড়ে দ্রুত এলেন দিল্লী। লাহোর ছাড়বার আগে বাবা কিষেণ সিংকেও জানিযে আসার সময় পাননি। দিল্লীতে এলেন অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের একখানা সুপারিশ পত্র নিয়ে। সুপারিশ পত্রটি দিল্লী থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'বীর অর্জুন' পত্রিকার কর্মকর্তার নামে। 'সিংহাবলোকন'-এ যশপাল এঁর নাম উল্লেখ করেছেন পণ্ডিত ইন্দ্রজী বিদ্যাবাচস্পতি। যশপাল বলেছেন ভগৎ নিজের নিষ্ঠা ও কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্রুত ইন্দ্রজীর বিশ্বাস ভাজন হন এবং দৈনিক 'অর্জুন' পত্রিকায় কাজ করতে থাকেন। এই ইন্দ্রজী সম্পর্কে উল্লেখ আছে পুলিশের গোপন রিপোর্টে। ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুন ১৯২৭ সালের রিপোর্টে পাঞ্জাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "...বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে পাঞ্জাবের দলের যোগাযোগ রক্ষিত হয় পাঞ্জাবের নেতা জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের ভাই ইন্দ্রচন্দ্র নারাঙ্গ-এর মাধ্যমে। ইন্দ্রচন্দ্র নারাঙ্গ কোলকাতায় ছাত্র হিসেবে কাটিয়েছেন এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবী গোষ্ঠী, ভবানীপুরের বিপ্লবী গ্রুপ ও অনুশীলন দলের কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।" (Terrorism in Bengal, Vol I, Page-556)। দিল্লীতেও এদের সাংগঠনিক কাজকর্মের কেন্দ্র ছিল বলে পরবর্তী গোপন রিপোর্টে উল্লেখ আছে। ফলে, ইনিই হয়ত সেই ইন্দ্রজী, জয়চন্দ্রের সুপারিশ পত্রের ভিত্তিতে যিনি ভগৎকে 'দৈনিক অর্জুনে' কাজ দিয়েছিলেন অতি সহজেই।

গবেষক G. S. Deol লিখেছেন, "দিল্লীতে ভগৎ সিং 'বীর অর্জুন' নামে একটি

দৈনিক পত্রিকায়, বলবন্ত সিং ছদ্মনামে, পাঁচ-ছয় মাস কাজ করেন। ইতিমধ্যে অকালী আন্দোলন স্থগিত হয়ে গেলে তিনি আবার লাহোরে ফিরে আসেন।" G. S. Deol লিখেছেন যে, তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন ভগৎ সিং-এর ভাই কুলতার সিং-এর কাছ থেকে।

লাহোরে ফিরে এসে ভগৎ সিং কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও নেতা কমরেড সোহন সিং জোশের প্রতিষ্ঠিত কীর্তি-কিষাণ পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই সময় সোহন সিং জোশ অমৃতসর থেকে 'কীর্তি' নামে পাঞ্জাবী ও উর্দু একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ভগৎ সিং এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। 'কীর্তি'তে বিভিন্ন নামে বিপ্লবী শহীদদের যেসব জীবন কথা প্রকাশিত হয়, তার বেশির ভাগই ভগৎ সিং-এর রচনা। G. S. Deol এবং শিব বর্মার লেখার মাধ্যমে আরও জানা যায় যে সেই সময়ের (এই শতকের বিশের দশকে) দুটি গ্রুপ, লাহোর গ্রুপ এবং কানপুর গ্রুপের মধ্যে কম্যুনিস্ট চিন্তাভাবনার প্রভাব পড়তে থাকে। শিব বর্মা লিখছেন, "লাহোর গ্রুপে বিশেষ করে ভগৎ সিং এবং সুখদেব রাশিযান অরাজকতাবাদী বাকুনিনের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। এই অবস্থা থেকে ভগৎ সিংদেব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ফিরিয়ে আনাব কৃতিত্ব দুজনের। এঁরা হলেন প্রয়াত কমরেড সোহন সিং জোশ এবং লালা ছবিল দাস। জোশ ছিলেন একজন প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা এবং তাঁবই সম্পাদনায পাঞ্জাবী ভাষায় মাসিক পত্রিকা 'কীর্তি' প্রকাশিত হত। জোশ ভগৎ-এব সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিযে আলোচনা করতেন। তিনিই ভগৎকে 'কীর্তি'তে লেখার জন্য উৎসাহিত কবেন।" ('Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh')।

লালা ছবিল দাস ছিলেন লালা লাজপত বায় প্রতিষ্ঠিত 'তিলক স্কুল অব পলিটিকস'-এর প্রিন্সিপাল। ছবিল দাস ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। তিনিই ভগৎ সিং সহ অন্যান্য যুবক বিপ্লবীদের নির্দেশ ও উপদেশ দিতেন, কোন্ কোন্ বই পড়া দরকার এবং কিভাবে এসব বইয়ের বিষয় অনুধাবন ও অনুশীলন প্রয়োজন। ভগৎ-এর সাথী কমরেড ভগবতীচরণ ভোরাও এঁরই মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চিন্তার সঙ্গে পবিচিত হয়েছিলেন। আর এইসব বিষয়ের বইয়ের যোগান দিতেন লাইব্রেরিযান রাজারামজী শাস্ত্রী, দ্বাবকাদাস লাইব্রেরীর মাধ্যমে। আনারকলী বাজারের পুস্তক বিক্রেতা 'রামকৃষ্ণ অ্যাণ্ড সন্স'ও ছিল এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য। তারাই ছিল বিশেষ পারদর্শী, বিদেশ থেকে, বিশেষত, ইংল্যান্ড থেকে রাজনৈতিক বিষয়ের নিষিদ্ধ বইয়ের যোগান দিতে। ভগৎ সিং এবং ভগবতীচরণ ভোরা এইসব বই পড়া ও অনুশীলনের বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। এই কারণেই রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে লাহোর গ্রুপ ছিল সেই সময়ে অগ্রগণ্য।

সোহন সিং জোশের 'কীর্তি' পত্রিকায় লেখালিখির সময় ভগৎ সিং 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের' কর্মসূচী ও যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবীদের কার্যক্রমের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন।

কাকোরী ট্রেন ডাকাতি :

এই সময়ই ‘হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের’ উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচীর অন্তর্গত রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনাটি ঘটল, এবং এই ঘটনাই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক মহলে সাড়া ফেলেছিল।

৯ই আগস্ট ১৯২৫ তারিখের রাতে, ৮নং ডাউন ট্রেনটি আসছিল হরদৌ (Hardoi) থেকে। যাচ্ছিল লাক্ষ্ণৌ। কাকোরী রেল স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে ট্রেনটিকে থামান হল। পনের-ষোল জনের একটি দল গার্ডের ঘরে সরকারী অর্থভান্ডারের সিন্দুক ভাঙল। সংগৃহীত অর্থের মোট পরিমাণ হল ৪,৬৭৯ টাকা ১ আনা ৬ পাই। দলের লোকেরা যাত্রীদের আশ্বাস দিযেছিল, তাদের কোন আশঙ্কার কাবণ নেই। তা সত্ত্বেও এদের বাধা দিতে গেল কিছু অত্যুৎসাহী যাত্রী। ফলে আত্মরক্ষার্থে চলল গুলি। জখম হবার অনিচ্ছাকৃত ঘটনা ঘটে গেল।[২১]

ভগৎ সিং-এর সাথী যশপাল তাঁর ‘সিংহাবলোকন’ গ্রন্থে লিখেছেন, “দল (H. R. A) যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটাবার পবিকল্পনা নিযেছিল। কিন্তু, প্রশ্ন ছিল সেই পরিকল্পনার কার্যকরী রূপায়ণ নিয়ে। দলের গুপ্ত কাজের জন্য সর্বজনীন পদ্ধতিতে অর্থসংগ্রহ করা যায না। আর্থিক দিক থেকে প্রভাবশালী লোকেদের বিশ্বাসভাজন হযে টাকার কথা বললে তারা শিশুসুলভ প্রশ্নে জানতে চাইত পনেরো-বিশটা পিস্তল নিযে কি বৃটিশ সাম্রাজ্যশাহীর সঙ্গে লড়াই করা যায। অর্থ সমস্যার কিছু সুরাহা করার উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রান্তের বিপ্লবী দল ‘হিন্দুস্থান রিপাবলিকান সেনা’ (H. R. A) লাক্ষ্ণৌ জেলার কাকোরী রেল স্টেশনের কাছে রাজনৈতিক ডাকাতি করে রেলের সরকারী অর্থ লুট করেছিল। এই পরিকল্পনার দুটি প্রয়োজন ছিল। এক, দলের আর্থিক সংকটের কিছুটা নিরসন করা আর দুই, বিদেশী সরকারী শক্তির ওপর আঘাত হেনে তার প্রতিষ্ঠার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানান।

“বিপ্লবীরা চলতি ট্রেন থামিযে যখন সরকারী অর্থ লুট করেছিল তখন তারা যাত্রীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে দেয়, ‘আমরা জনসাধারণের জানমালের ওপর কোন হাত দেবো না, কেবল সরকারী অর্থ নেব। আপনাদের কোন ভয় নেই।’ কাকোরীতে ডাকাতি তো হল, কিন্তু এর পরিণাম ভাল হল না। কিছুদিন বাদে পুলিশের কোন সূত্র মিলে যাওয়ায় গ্রেপ্তারী শুরু হয়ে গেল। কানপুরে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে যারা সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখত তারা ভগৎকে পরামর্শ দিল, তুমি তো আগে থেকেই পুলিশের কাছে সন্দেহজনক। পুলিশ এখন চোখ কান বন্ধ করে গ্রেপ্তার করছে। সেই তালে ওরা তোমার কাছেও চলে আসতে পারে। তুমি কানপুর থেকে অন্য কোথাও সরে যাও।

“ভগৎ সিং কানপুর থেকে দিল্লী চলে আসে। কানপুর থেকে পাওয়া সূত্রের যোগাযোগ ধরে সে দিল্লীতে সংগঠন গড়ার চেষ্টা করতে থাকে। পাঞ্জাবে জয়চন্দ্রজী দলের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিলেন, কিন্তু সেখানে কোন কাজই হচ্ছিল না।

ভগৎ সিং সেসময় পাঞ্জাবের বাইরে ছিল। সুখদেবও মনঃক্ষুন্ন হয়ে তার গ্রাম লায়লপুরে চলে গিয়েছিল। ভগবতীচরণও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের এক শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ভগবতীচরণের প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষণের কারণে আমরা প্রায়ই খালমণ্ডীতে তার নিজেদের বাড়ি 'শিবনিবাসে' যাতায়াত করতাম। ভগবতীচরণের ঘর ছিল গোছান গৃহস্তের ঘব। বিনাকারণে চীৎকার, হৈ হট্টগোল ওর পছন্দ ছিল না। তবে আগে থেকে বলে কয়ে এলে সেখানে বেশ জবরদস্ত খানা মিলত। তবে ভগবতীচরণের বাড়ি, ভগৎ সিংদের বাড়ির মত আমাদের সকলের খোলামেলা ধর্মশালা ছিল না।" ('সিংহাবলোকন')

বিশেব দশকে অনুশীলন, যুগান্তব পার্টিব নেতারা দীর্ঘদিনের কারাবাস এবং বারে বারে পুলিশী হামলা, হয়রানি ও অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে, দেশজুড়ে নতুনভাবে বৃহত্তর আন্দোলন ও বিপ্লব সংগঠিত করার পরিকল্পনা নিযে, সেই সমযে সামযিকভাবে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তরুণ ও নবীন বিপ্লবীদের কাছে এ কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হয় না। তারা আশঙ্কা করতে থাকেন দলের প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ নেতারা বিপ্লবী আন্দোলনকে স্তিমিত করে দিতে চাইছেন। ফলে, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জীদেব সারাভারতব্যাপী গণসংযোগ কাজে লাগিয়ে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের' সহযোগী দল ও গ্রুপ হিসেবে বাংলাব বুকে গডে ওঠে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর নিবাসী প্রখ্যাত বিপ্লবী যতীন দাসের (যাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে শহীদ যতীন দাস পার্ক ও যতীন দাস মেট্রোরেল স্টেশন) ভবানীপুব অনুশীলন গ্রুপ এবং অন্যান্য তকণদের সংগঠিত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর, 'বেঙ্গল নিউ ভাযোলেন্স পার্টি'। এদের সঙ্গে অতি সন্তর্পণে, অতি গোপনে, যোগাযোগ রাখতে থাকেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতা বিপ্লবী সূর্য সেনের চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মি। (সবোজ মুখার্জী-কৃত 'ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা' ও 'Terrorism in Bengal', Vol-I) ।

পুলিশের গোযেন্দা রিপোর্টে কাকোরী ট্রেন ডাকাতির অব্যবহিত পরই সন্দেহ প্রকাশ করা হয যে, এর পেছনে অনুপ্রেরণা জুগিযেছে বাংলা। পবিকল্পনা করেছে বাঙালী বিপ্লবীরা। অস্ত্রশস্ত্রেব যোগান দিযেছে বাংলা মুলুক এবং রাজনৈতিক ডাকাতির প্রয়োগ পদ্ধতিও বাংলার অনুকরণে। বাংলার বিপ্লববাদ এইভাবে সারা ভারতকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। এই আতঙ্ক থেকে ইংরেজ সরকার কডা হাতে দলীয় কাজকর্মকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক ধরপাকড়, জেল, অত্যাচারেব বন্যা বইযে দিল।

ব্যাপক গ্রেপ্তারে, প্রাথমিকভাবে সারা ভারতের নানান প্রদেশ থেকে চুযাল্লিশ জনকে ধরা হল। এদের মধ্যে ছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিডী, আসফাকউল্লা, ঠাকুর রোশন সিং—যাঁদের ফাঁসিতে চড়িয়ে, নৃশংস হত্যা করে ইংরেজ রাজশক্তি রাজনৈতিক বাতাবরণকে আতঙ্কিত করতে চেয়েছিল। এছাড়া গ্রেপ্তারের তালিকায় ছিলেন, শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর, চন্দ্রশেখর আজাদ, শেঠ দামোদর স্বরূপ, মন্মথ গুপ্ত, বিষ্ণু চরণ দুবলিশ, শচীন বক্সী প্রমুখ নেতারা। কিন্তু H.R.A দলের অন্যতম নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ তখনোও পলাতক। তিনি পুলিশের ধরা ছোঁযার বাইরে।

বিচার শেষে দীর্ঘ মেয়াদের সাজা হল অন্যদের। শচীন সান্যাল—যাবজ্জীবন কারাদন্ড। মন্মথ গুপ্ত—১৪ বছর। যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর, মুকুন্দলাল, রাজকুমার সিংহ, রামচরণ ক্ষেত্রী—১০ বছর। সুরেশ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুচরণ দুবলিশ—৭ বছর। বনোয়ারীলাল, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, প্রেমিকিষণ খান্না, প্রণবেশ চ্যাটার্জী (চন্দ্রশেখর আজাদের রাজনৈতিক গুরু) ও রামদুলাল ত্রিবেদী—৫ বছর কারাদন্ড।

সাজা প্রাপ্তদের মধ্যে দশজনই বাঙালী। সারা ভারতের 'অ্যাকসনে' বাংলার সহযোগ সন্দেহাতীত।

কাকোরী ট্রেন ডাকাতির পরবর্তী অবস্থা :

তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে কাকোরী ট্রেন ডাকাতি এবং তার ফলে ঘটে যাওয়া ব্যাপক গ্রেপ্তার ও পুলিশী সন্ত্রাসের ফলে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিযেসন' দলের কাজকর্মের শোচনীয় অবনতি হয়। ভগৎ সিং-এর সাথী শিব বর্মা বলেছেন যে যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) প্রায় সমস্ত নেতা ও সংগঠকরাই কাকোরী ষডযন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৫ সালে জেলে যান। ফলে, দলের সমস্ত সাংগঠনিক কাজই পিছিযে পড়ে এবং প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবলমাত্র চন্দ্রশেখর আজাদ এবং কুন্দনলাল গুপ্তা গ্রেপ্তার এড়িয়ে পালাতে পারেন। দলের বাকীরা, যারা রইলেন, তারা নেতাদের পেছনে দ্বিতীয় সারির কর্মী। এই দ্বিতীয় সারির ওপরই দলকে রক্ষা করা এবং দলের কাজকর্মকে সুসম্বদ্ধ করার দায়িত্ব বর্তাল। ('Selected writings of Shaheed Bhagat Singh', By Shib Verma)।

ভগৎ সিং-এর অপর সাথী এক সময়ে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষ লিখেছেন, "১৯২৫ সালে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত ঘটে গেল কাকোরী ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গ্রেপ্তার। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের দলেব (H. R. A) প্রায় সমস্ত নেতারাই জেলে চলে গেলেন। চলতে থাকল আরো ধর-পাকড়, খানা-তল্লাসী, সন্দেহজনকদের হয়রানি, প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হিসেবে। কিন্তু যা আমার স্বপ্নকে ভেঙে খানখান করে দিল, সেটা হল, এইসব গ্রেপ্তারের পরবর্তী ফল। যারা আমাদের আদর্শের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি দেখাতেন, এখন তারা ভয়ে আমাদের এড়িয়ে চলতে থাকলেন। কানপুরে যে সব ব্যায়ামাগার বানিযেছিলাম, নতুন কর্মী নিয়োগের আখড়া হিসেবে, সেখানকার ছেলেরা, আমাদের সঙ্গে ভয়ে কথাবার্তা অবধি বন্ধ করে দিল। গোটা যুক্ত রাজ্য, গোটা প্রদেশ আতঙ্কে ডুবে গেল।

"১৯২৬ সালে আমি এলাহাবাদ চলে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার জন্য। কাকোরীর ব্যাপক গ্রেপ্তারের পরও আমরা ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন দল গড়ার প্রচেষ্টা চালাই। সে এক কঠিন কাজ। সে সময় বিপ্লব এক সুদূর, বহুদূরের বিষয় বলে মনে হোত।···

"এই সময় ভগৎ সিং পাঞ্জাবে তৎপর এবং সক্রিয় ছিলেন। তিনি এবং তাঁর কমরেডরা সকলে মিলে গড়ে তুলেছিলেন 'নওজওয়ান ভারতসভা'। এটি ছিল লড়াকু যুবকদের

সংগঠন, যারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও আদর্শের প্রচার করত। দেশ থেকে বিদেশী বৃটিশ শাসন হটাবার জন্য সরাসরি সক্রিয় পন্থা গ্রহণের কথা বলত। সর্বোপরি, সন্ত্রাসবাদী দলের কর্মী নিয়োগ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। এই নওজওয়ান ভারতসভা পরবর্তী বছরগুলিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং গোটা পাঞ্জাবের যুবকশ্রেণীকে প্রগতিবাদী চিন্তা ও বিপ্লববাদের দিকে নিয়ে যেতে এক অগ্রণী ভূমিকা নিল।" ('Bhagat Singh and his Comrades', by Ajoy Ghosh)।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা ও ব্যাপক ধরপাকড়ের পর, দলের বিপর্যয়ের মুখে ভগৎ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন দলকে বাঁচাতে। বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে অক্ষুন্ন রাখতে, জেলের লৌহকপাট ভেঙ্গে দুঃসাহসিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দলের নেতাদের মুক্ত করতে, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাকে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যাযে নিয়ে যেতে। 'কেন আমি নাস্তিক'—প্রসঙ্গে ভগৎ লিখেছেন সেই সময়ের কথা। ১৯২৫ সালের পরবর্তী অধ্যাযের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "ঐ সময় (১৯২৫-এর কাকোরী ঘটনাকালীন সময়) পর্যন্ত আমি ছিলাম একজন কল্পনা বিলাসী ভাবপ্রবণ বিপ্লব-কর্মী। তখন অবধি আমাদের কাজ ছিল অনুসরণ করা। এখন সময় এল সমস্ত দাযিত্ব কাঁধে তুলে নেবার। ঘটনার (কাকোরী ডাকাতি) অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদেব দলের অস্তিত্বই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অতি উৎসাহী কমরেডরাই শুধু নয়, নেতারাও আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে থাকলেন। কিছু সমযের জন্য আমিও চিন্তিত হয়ে পড়লাম, আগামীদিনে আমাদের দলের কর্মসূচী আমার কাছেই না অসার বা নিরর্থক হযে যায়। এটাই ছিল আমার বিপ্লবী জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। 'অধ্যয়ন', শব্দটা তখনই আমার মনের দরদালানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বিরোধীপক্ষের বক্তব্যের মোকাবিলা করার জন্য চাই, 'অধ্যয়ন'। নিজের চিন্তাধারাকে যুক্তিসম্মত করার প্রয়োজনে চাই, 'অধ্যয়ন'। আমি গভীর বিদ্যাভ্যাস, 'অধ্যয়ন' শুরু করলাম। আমার পুরানো বিশ্বাস এবং ধ্যান-ধারণার আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হতে থাকল।

"আমার পূর্বসূরীদের মধ্যে হিংসাত্মক কাজের প্রতি যে চিত্তাকর্ষক সুস্পষ্ট ঝোঁক ছিল এবং আমরা যার প্রভাবান্বিত ছিলাম, তার পরিবর্তে এল গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশীল নীতি ও আদর্শ। অতীন্দ্রিয়বাদ এবং অন্ধ বিশ্বাসকে বিদায় দিলাম। বস্তুতন্ত্রবাদ বা বস্তুবাদকে গ্রহণ করলাম, আমাদের আদর্শ হিসাবে। অহিংসাকে সমস্ত গণআন্দোলনের অপরিহার্য নীতি হিসেবে মেনে নিলাম এবং একমাত্র একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ছাডা বলপ্রয়োগ সমর্থনযোগ্য নয়, এই যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করলাম। এইসব ছিল পদ্ধতিগত বিষয়ের চিন্তা। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, যে আদর্শের জন্য আমরা লডছি সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। যেহেতু, সে সময় সশস্ত্র কার্যক্রমের কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল না সেইহেতু আমি বিশ্ববিপ্লবের বিভিন্ন তত্ত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে অধ্যয়ন করার যথেষ্ট সুযোগ পাই। আমি নৈরাজ্যবাদী নেতা বাকুনিনের লেখা পড়ি। সাম্যবাদের জনক মার্ক্সের কিছু লেখা পড়ি। এবং লেনিন ও ট্রটস্কির অনেক লেখা পডার সুযোগ পাই। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশে যেসব নেতারা সার্থকভাবে তাদের দেশে বিপ্লব সফল করেছিলেন সেইসব নেতাদের লেখাও পড়ি। এঁরা সকলেই ছিলেন নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী।…১৯২৬ সালের শেষভাগে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে আসি যে, ঈশ্বরবিশ্বাসীদের তত্ত্ব, যাতে এমন একজন সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী, সেই তত্ত্বের কোন ভিত্তি নেই।…"

ভগৎ সাধারণ অর্থে বলেছেন, এই সময় সশস্ত্র কার্যক্রমের বিশেষ চাপ ছিল না। কিন্তু তথ্যসূত্রে দেখা যায়, ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৭ সাল অবধি বেশ কযেক দফায তিনি অন্যান্য বিপ্লবী সাথীদের সহযোগিতায় কাকোরী মামলার আসামীদের মধ্য থেকে বাছাই করা নেতা বিসমিল, যোগেশ চ্যাটার্জীদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

G. S. Deol বলেছেন, "জেল থেকে কাকোরী মামলার বন্দীদের মুক্ত করার জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে ভগৎ সিং এতে অংশ নেবার জন্য কানপুরে যান। কিন্তু এই সম্পর্কিত খবর ফাঁস হযে যাওয়ায় পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। অনুরূপ আর একটি পরিকল্পনা হয়েছিল ১৯২৬ সালের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী মাসে, যাতে ভগৎ সিংও অংশ নেন। কিন্তু এটিও অকার্যকরী হয।"

ভগৎ সিং-এর সাথী বিপ্লবী যশপাল তাঁর 'সিংহাবলোকন' গ্রন্থে এই সমযের বেশ কিছু চাঞ্চল্যকব ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেমন, জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কাকোরীব আসামীদের মুক্ত করার জন্য লাহোর থেকে ভগৎ সিং, সুখদেব প্রমুখ বিপ্লবীদের কানপুরে পাঠান। কিন্তু নানান অসুবিধার দরুন এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয। পুলিশের গোপন রিপোর্টেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

আরও, চাঞ্চল্যকর বিষয় হল পাঞ্জাবে H. R. A দলের নেতা জযচন্দ্রজীর সঙ্গে, ভগবতীচরণ ভোরার ব্যক্তিগত সম্পর্কে বিশ্রী অবিশ্বাস ও কুৎসার প্রভাবের ফলে, পাঞ্জাব থেকে কাকোরীর বন্দীদেব মুক্তির প্রযাসে প্রয়োজনীয সাহায্য যথাসমযে না পৌঁছনব ঘটনা। কাকোরী বন্দী মুক্তির জন্য জযচন্দ্রজী অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করেন। সেই সূত্রে দলের সমর্থক সুশীলা দেবীর (মেনন) কাছে তিনি সংগ্রহ তহবিলে গহনা দান করার নির্দেশ দেন, যা তাঁর এক আত্মীয়ার বিবাহে কাজে লাগাবার অভিযোগ ওঠে। এছাড়া পাঞ্জাবে দলের কাজে জযচন্দ্রজীর অকারণ অতি গোপনীযতা রক্ষা ও নিস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ভগবতীচরণ অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অপরদিকে, পাঞ্জাবসহ অন্যান্য জায়গার কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের সঙ্গে ভগবতীচরণের ঘনিষ্ঠতা ও তার জনপ্রিয়তাও দুজনের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ক্রমে জয়চন্দ্রজী, ভগবতীচরণ সম্পর্কে পুলিশের গুপ্তচর, এই কুৎসা ও অপবাদ ছড়াতে থাকেন।

ভগৎ সিং, সুখদেব, যশপাল-সহ অন্যান্য বিপ্লবীরা দলের মধ্যে এমন বিশ্রী পরিস্থিতির জন্য প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এই সময় ভগৎ কাকোরী বন্দীদের মুক্তির প্রয়াসে প্রায়ই লাহোরের বাইরে থাকতেন। সব ঘটনা শুনে ক্ষুব্ধ ভগৎ ভগবতীচরণ ও জয়চন্দ্রজী ঘটিত কুৎসা কাণ্ডের নিষ্পত্তিব জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

ভগৎ যশপালকে বলেন, 'ভগবতী পুলিশের লোক হয়ে যাবে! একথা মন কিছুতেই মানতে পারে না। তুই তো ভগবতীর বাড়িতে প্রায়ই যাস। মজাসে খানা-পিনা করিস। হা, হা, হি, হি করিস। ওর আসল ব্যাপার কিছু বুঝতে পারিস না? তুই কি বলিস? ভগবতী নিশ্চই সি. আই. ডি-তে নেই?' যশপাল উত্তর করেন, 'লোক বলছে। আমি এর কি বলব?' ভগৎ ভগবতীচরণ সম্পর্কে এই কুৎসা, অপপ্রচার কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। কিন্তু, এইসব অপপ্রচারের ফলে দলের কাজে ক্ষতি হচ্ছিল। একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে ভগৎ যশপালকে বললেন, 'আমি ভগবতীকে গুলি করে দেব।'

যশপাল হেসে উত্তর দিলেন, 'তখন জিম্মেদারী তোমারই হবে।' ভগৎ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে চুপ করে রইলেন। ক'দিন বাদে দেখা গেল, ভগবতীচরণের বাড়িতে একই খাটে বসে ভগৎ গল্প করছেন ভগবতীর সঙ্গে। পরম নিশ্চিন্তে, নিঃশঙ্কচিত্তে ভগবতী জামার কাপড় তুলে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে কথা বলছে আর ভগৎ-এর মুখে অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালা ফুটে বেরোচ্ছে।

এর কিছুদিন বাদে সুখদেব এলেন যশপালের কাছে। গম্ভীর গলায় যশপালকে বললেন, 'ভগবতীচরণকে নিয়ে দলের মধ্যে এ ঝগড়ার নিষ্পত্তি করতেই হবে।'

যশপাল দুশ্চিন্তার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার মানে?' এবার সুখদেব পরিকল্পনার কথা বললেন। 'ভগৎ সিং ভগবতীকে নিয়ে তার দেশের বাড়িতে গেছে। ফিরতে দেরি হবে। সেই সুযোগে তুমি ভগবতীর বাড়িতে তার ঘর সার্চ করে দেখ, কোন আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা।' যশপাল ভগবতীর বাড়ি গিয়ে দুর্গাভাবীকে (ভগবতীর স্ত্রী) দীর্ঘক্ষণ এক ঔষুধ তৈরির কাজে লাগিয়ে, তন্নতন্ন করে ভগবতীর ঘরদোর সার্চ করল। কিন্তু আপত্তিকর কোন কিছুই মিলল না। এবার যশপাল সুখদেবকে প্রশ্ন করলেন, 'কি এখনও ভগবতীকে আমরা সন্দেহ করব?' দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হল। যার অর্থ, ভাগ্যিস গুলি গোলা চলেনি!

লাহোরে নওজওয়ান ভারতসভা গঠন :

সারা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পাঞ্জাবের এই সংগঠনটি তার বিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে চিরভাস্বর। জবরদস্ত সংগঠক, প্রচারক, তাত্ত্বিক হিসেবে ভগৎ সিং-এর ভূমিকার পাশাপাশি এই সংগঠন গড়ার কাজে ভগবতীচরণ ভোরার নামও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যদিও ভগবতীকে নিয়ে পাঞ্জাবে দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জয়চন্দ্রজীর সন্দেহ-প্রবণতা থেকে ভগৎকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু যোগ্য সাথী হিসেবে 'নওজওয়ান ভারতসভার' কাজে ভগৎ-এর পাশাপাশি ভগবতীচরণ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

'নওজওয়ান ভারতসভা'র কাজকর্ম সম্পর্কে ভগৎ সিং-এর সাথী এবং সেই সময়ে ঐ সংগঠনের কাজে যুক্ত অন্যতম বিপ্লবী যশপালের বিবরণ এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। বিবরণটি এইরকম :

"...ঐ সময়ে (মার্চ, ১৯২৬ সাল) গুপ্ত সংগঠনের কাজের জমি তৈরি করার জন্য এবং জনসাধারণের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগাবার উদ্দেশ্যে 'নওজওয়ান ভারতসভা' স্থাপন করা হয়েছিল।

"নওজওয়ান ভারতসভা প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি-বিচার ও পরিকল্পনায় আমরা সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করি। কিন্তু, এই সংগঠনের মুখ্য সূত্রধার ছিলেন ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ ভোরা এবং ন্যাশনাল কলেজের (লাহোর) রামচন্দ্র কাপুর। সভা প্রকাশ্যে তার কাজ করত। তাই, জনসাধারণের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী বিশ্বস্ত কর্মীদের এই সভার কাজে জড়িয়ে রাখা সহজ হোত। সভা ছিল আমাদের গুপ্ত দলের প্রকাশ্য গণসংগঠন। ভগৎ সিং ছিলেন এর সাধারণ সম্পাদক, আর ভগবতীচরণ ভোরা ছিলেন প্রচার সম্পাদক। এদের সঙ্গে সর্বজনীন ক্ষেত্রে দলের কাজ করার কর্মী, যেমন ধন্বন্তরী, এহশান-ইলাহী, পিণ্ডিদাস সোড়ী প্রমুখরাও ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেসদলে সমাজবাদী চিন্তার সমর্থক যুবকরাও নওজওয়ান ভারতসভার সমর্থক ও সহযোগী হয়ে পড়ল। সবাই জানে ধীরে ধীরে এই সংগঠন ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

"নওজওয়ান ভারতসভার অন্যতম কার্যক্রম ছিল গান্ধীবাদী কংগ্রেসের আপসমুখী নীতির মুখোস খুলে দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী রাজনীতির উপযোগিতা বোঝান এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি উৎপন্ন করা। সেই সময় পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নেতা যেমন, ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ কিচ্‌লু, কেদারনাথ সায়গল, পিণ্ডিদাস এঁদের সহযোগিতা মিলছিল। লালা লাজপত রায় এই সময় পুরোপুরি হিন্দু মহাসভার লোক হয়ে গিয়েছিলেন এবং ডাঃ গোপিচন্দ্র ভার্গবও ওঁর একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। রামচন্দ্র কাপুর, ভগবতীচরণ, ভগৎ সিং, সুখদেব, ধন্বন্তরী, এহশান-ইলাহী, পিণ্ডিদাস সোড়ী আর আমি সভার কাজ ঠিক ঠাক চলছে কিনা লক্ষ রাখতাম। আবার প্রয়োজনে সভা সমিতির ব্যবস্থা করতে দড়ি টাঙান থেকে কাপড় বিছান অবধি সব কাজেই হাত লাগাতাম।

"আমরা ফেরার হয়ে যাবার পর আমাদের কলেজের ছাত্র রামচন্দ্র কাপুর, রামকৃষ্ণ, ধন্বন্তরী আর এহশান-ইলাহীরাই সভার কাজ চালাত।...

"প্রকাশ্য আন্দোলনে বিপ্লবী কার্যক্রমের যতটা প্রচার সম্ভব তার সবটাই নওজওয়ান ভারতসভার মাধ্যমে করা হোত। এই সভা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ১৯১৪ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম শহীদ, মাত্র আঠারো বছরের কর্তার সিং, যিনি হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে চড়েছিলেন, তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সর্বজনীন শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য, শহীদের এক চিত্রের উদ্‌ঘাটন উৎসবের আয়োজন করেছিল প্রকাশ্যে একটি পাবলিক হলে (লাহোরের ব্রাডলাউ হলে)। এ উৎসব ছিল নব-যুবকদের এক প্রকার সরাসরি সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়াসের কাজে যুক্ত করার আমন্ত্রণ। উৎসবের আয়োজনও হয়েছিল চমৎকার হৃদয়স্পর্শী ঢঙে। ভগৎ সিং-ই শহীদ কর্তার সিং-এর এক ছোট্ট ফটো খুঁজে বার করেছিল। ভগবতীচরণ নিজের খরচে সেই ছবিরই এক বড় সংস্করণ বানিয়েছিল। চিত্র উদ্‌ঘাটনের

জন্য ফটোকে ঝক্‌ঝকে সাদা খদ্দরের কাপড়ের পর্দায় ঢাকা হয়েছিল। ভগবতীর স্ত্রী দুর্গা দেবী (দুর্গা বৌদি) এবং সুশীলা দিদি (মেনন) তাঁদের হাতের আঙুল থেকে রক্ত দিয়ে, ঐ পর্দাতে লাল রংঙের ছিঁটে লাগিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে ভাষণ দিয়েছিল ভগবতীচরণ ভোরা।

"নওজওয়ান ভারতসভার বৈপ্লবিক রূপ তার সামাজিক কর্মসূচীগুলির মধ্য দিয়ে প্রকট হোত। উগ্র রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ছাড়াও, সভা, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সকলকে নিয়ে সর্বজনীন ভোজসভার আয়োজন করত। এই ভোজে সুস্বাদু বহুমূল্য খাবার পরিবেশন হোত না। সাধাবণত চট বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা হোত। খিচুরি, ছোলার পোলাউ, মাঠা এই সব ছিল খাবাব। কিন্তু এই ভোজে সম্মিলিত হোত সমস্ত সম্প্রদায, বর্ণ ও জাতির মানুষ। তারা সকলে একসঙ্গে বসে, একে অপরের পরিবেশনায মহানন্দে ভোজ খেতেন। একবার তো কিছু দুঃসাহসী যুবক মুসলমান, শিখ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নিষিদ্ধ মাংস একসঙ্গে পাকিয়ে দিব্যি হিন্দু, মুসলমান, শিখ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের নিয়ে গোস্ত রুটীর ভোজ বানাল।...

"নওজওযান ভারতসভা, তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, সাম্প্রদাযিক একতা দৃঢ করার কাজকে, অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করত। কিন্তু, সভার দৃষ্টিভঙ্গি কংগ্রেসের মত সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেদের তোষামোদ বা ফুসলানোর সঙ্গে মিলত না। অর্থাৎ, একই সঙ্গে সব ধর্ম সম্প্রদাযকে তুষ্ট কবার জন্য কংগ্রেসীদের মত 'আল্লাহো আকবর', 'সৎ শ্রী অকাল', আর 'হর হর মহাদেব' আওয়াজ তুলতাম না আমরা। আমাদেব নওজওয়ান ভারতসভার ছিল তিনটি শ্লোগান, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্' আর 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ'। এছাড়া সভা কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কাজকে আবশ্যক মনে কবত। সভার পক্ষ থেকে এমন সব প্রচার পত্র প্রকাশ করা হোত যাতে অন্ধ বিশ্বাস, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতার ভেদাভেদ ইত্যাদি দূর করে, বৈজ্ঞানিক, বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটান যায়। 'সার্ভেন্টস অব পিপ্‌লস সোস্যাইটির' অধ্যক্ষ ছবিলদাস মহাশয়ের কাছ থেকে সভা এই কাজে প্রচুর সহযোগিতা পেত। সভার অনেক মুসলমান সাথী, যেমন: ফজল, মঞ্জুর আর এহ্‌শান-ইলাহী-রাও এসব কাজে খুব সাহায্য করত।...

"১৯২৬-২৭ সালের কথা। আমরা ঐ সময় অবধি কম-বেশি যতটুকু সংগঠন বানিয়েছিলাম, দলের পক্ষে জয়চন্দ্রজীই সেসব সূত্রের দেখাশুনা করছিলেন। দলের পক্ষ থেকে সেই সময় নওজওয়ান ভারতসভা তৈরি করা ছাড়া আর তেমন কিছু কাজ এগোয় নি। ফলে দলের কাজে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলাম না। ভগবতীচরণ কিছু সময় নওজওয়ান ভারতসভার কাজে লাগাত আর কিছু সময় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে সাহায্য করত। আর এসব কাজে যখন তার বিরক্তি আসত, তখন চাকরীর সন্ধান করত। ভগত সিং, সুখদেব আর ভগবতীভাই সেই সময় মানসিক ভাবে খুবই অশান্ত ও উদ্বিগ্ন ছিল। এরা দলের পক্ষ থেকে ক্রিয়াত্মক কাজ চাইত। কিন্তু দলনেতা জযচন্দ্রজী এসব কথা উঠলেই ব্যাপক

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা দিতে শুরু করতেন। সংগঠন বাড়াতে বলতেন। আর দলের কর্মসূচীকে সুকৌশলে ছেঁটে দিতেন।"

('সিংহাবলোকন'—যশপাল প্রণীত)।

গবেষক G. S. Deol, 'নওজওয়ান ভারতসভা' সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ্ করেছেন। যেমন, এই সংগঠনের আসল প্রতিষ্ঠাতা হলেন ভগৎ সিং। রাম কিষেণ (বি-এ, ন্যাশনাল কলেজ) ছিলেন এর সভাপতি। ভগৎ লাহোরের Bradlaugh Hall-এ রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, ঠাকুর রোশন সিং ও জিতেন লাহিড়ীর ফাঁসির পর, শহীদ দিবসের প্রকাশ্য সভা করেছিলেন নওজওয়ান ভারতসভার উদ্যোগে। সভায় ভাষণ দিয়ে ভগৎ যুবকদের আগামী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

G. S. Deol আরও জানিয়েছেন যে নওজওয়ান ভারতসভার শাখা সংগঠন ছিল, লাহোর, অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, মন্টগোমারী, মরিন্দা, মুলতান, তালেগাঁ (অটক জেলা), সারগোধা এবং শিয়ালকোটে। কিছুদিন বাদে করাচী ও পেশোয়ারেও এর শাখা তৈরি হয়। সভার কাজে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেন, এম.এ.মজিদ, শার্দুল সিং কবিশের। পাঞ্জাবের 'কীর্তি কিষাণ পার্টির' সঙ্গেও সভার যোগাযোগ ছিল। পুস্তিকার আকারে সভার পক্ষ থেকে যেসব প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি হল—

The Wealth of Nations : Hardyal
India and the Next war : Anges Smedley
Bharat Mata ka Darshan : Chabıl Das
Nau Jawanon Se Do Do Baten.

১৯৩০ সালের গোয়েন্দা দপ্তরেব গোপন নোট ও ফাইলে ভগৎ সিং-এর উল্লেখ করে নওজওয়ান ভারতসভার বিভিন্ন কাজের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ১৯৩০ সালের ৩রা মে, Seditious Meetings Act-বলে নওজওয়ান ভারতসভাকে নিষিদ্ধ ও বে-আইনি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভগৎ সিং প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জাবের নওজওয়ান ভারতসভার শাখা সংগঠন ছিল খোদ কলকাতায়। প্রেম সিং প্রেম ছিলেন লুধিয়ানার লোক। থাকতেন ভবানীপুরে বিপ্লবী যতীন দাসের এলাকায়। তিনিই ছিলেন এই শাখার সম্পাদক। বিরাট সংখ্যক পাঞ্জাবী ও বাঙালী যুবক, যার মধ্যে বিপ্লবী যতীন দাসের ভাই কিরণ দাসও অন্যতম সদস্য ছিলেন, যুক্ত হয়েছিলেন এই শাখার সঙ্গে। বে-আইনি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও এরা ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্তের ছবি সম্বলিত প্লাকার্ড নিয়ে মিছিল বার করেছিল প্রকাশ্য রাজপথে। ('Terrorism In Bengal', Vol I, Page-694)

আরও চমকপ্রদ ঘটনা হল, ভগৎ সিং প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জাবের নওজওয়ান ভারতসভার সভাপতি রামকিষণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক পলায়ন পর্বে, নেতাজীকে পালাবার পথের সন্ধান দিতে গিয়ে পাহাড়ী নদীর স্রোতে প্রাণ হারান। (মুক্তির সংগ্রামে ভারত, আলেখ্যগ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

ভগৎ সিং-এর অপর সহযোগী বিপ্লবী ও কম্যুনিস্ট নেতা শিব বর্মা লিখেছেন, "ভগত সিং কানপুরে এলেই অন্যান্য বইপত্রের সঙ্গে নওজওয়ান ভারত সভার কিছু না কিছু বইপত্তর নিয়ে আসত। রাধামোহন গোকুলজী ও সত্যভক্ত-এর সঙ্গে সংস্রবের ফলে আমাদের কানপুরের সব সাথীদের মনে সমাজবাদ সম্পর্কে ঝোঁক জেগেছিল। স্বর্গত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর নেতৃত্বে পরিচালিত কানপুর মজদুর সভা সম্পর্কে আমরা আগ্রহ দেখাতে শুরু করি। আমাদের সেই টানে বল যোগায় ভগৎ সিং। সমাজবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা ও তর্কবিতর্কাদি করার প্রেরণা সেই দেয়।

"ও (ভগৎ) বলত, ইংরেজের অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তো আমাদের লড়াইয়ের প্রথম ধাপ মাত্র। শেষ লড়াই আমাদের লডতে হবে শোষণের বিরুদ্ধে—তা সে শোষণ মানুষ মানুষকেই করুক বা এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকেই করুক। জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া এ লডাই লড়া যায় না। সেইজন্যেই সম্ভাব্য সব উপাযে জনসাধারণের আরও কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা আমাদের করে যাওয়া দরকার। নওজওয়ান ভারতসভার প্রতিষ্ঠা, মজদুর সভা-র কাজ, পত্র-পত্রিকার ধারাবাহিক লেখা, ম্যাজিক লণ্ঠনের ব্যবহার, ইশ্তেহার তথা পুস্তিকাদি এই চেষ্টারই অঙ্গ।

"প্রচার ও জনসংযোগের ব্যাপারে এত বড়ো ও সংগঠিত চেষ্টা ভগৎ সিং-এর আগে বিপ্লবীদের মধ্যে আর কেউ করেননি। এমনকি ধরা পডার পর আদালতকে নিজের মতবাদ প্রচারের অবলম্বন হিসেবে কাজে লাগিযেছিল সে-ই। শুধু ভালো যোদ্ধাই নয়, ভগৎ ছিল ভাল প্রচারকও।" ('শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা)।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মেদ এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত দামী একটি কথা বলেছেন। 'শহীদ ভগৎ সিং' সম্পর্কে প্রকাশিত একটি লেখার শেষ অধ্যায়ে তাঁর এক চমৎকার বিশ্লেষণ অনুধাবনযোগ্য। বিশ্লেষণটি এইরকম :

"আমি আবার 'নওজওয়ান ভারতসভা'র কথা বলছি। এই সংগঠনের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে অন্য কোন যুবসংগঠন 'নওজওয়ান ভারতসভা'র মত এত বেশি রাজনীতিক প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। বিভিন্ন বিপ্লবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগের ভিতর দিয়ে ভগৎ সিং রাজনীতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি রাজনীতিতে বিকশিত হয়েছিলেন 'নওজওয়ান ভারতসভা'র মারফতে।" ('অগ্নিযুগ', সম্পাদনা : শৈলেশ দে)।

লাহোরে মুজফ্ফর আহ্মেদের সঙ্গে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভগৎ সিং-এর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি লিখছেন, "আমি কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মকদ্দমায় জেল-খাটা লোক বলে তিনি (ভগৎ) আমাকে দেখতে এসেছিলেন।

"...মীর আবদুল মজীদের বাড়িতে আমি প্রথম যাঁকে দেখেছিলাম, তিনি (ভগৎ) ছিলেন একজন শিখ নব-যুবক। লম্বা চুলের উপরে মাথায় যত্ন করে পাগড়ি বাঁধা। পাতলা দাড়ি তখনও পুরো চেহারা ঢেকে ফেলেনি। পরনে পায়জামা, শার্ট ও কোট। মিষ্ট স্বভাবের এই ভগৎ সিং-এর ছবিই আমার মনে ছাপা হয়ে আছে।

"...যতদিন আমি লাহোরে ছিলাম, ততদিন ভগৎ সিং আমার সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। প্রয়োজন হলে আমার দু'একখানা পত্রও তিনি টাইপ করে দিয়েছেন। তাঁদের দলের আর কে কে তখন লাহোরে ছিলেন তা জানিনে, তবে, রামচন্দ্র কাপুরের ছোট ভাই বংশীর সঙ্গে এসে, সুখদেব একদিন আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন।

"লাহোরে থাকার সময় আর একটি ব্যাপার আমি লক্ষ করেছিলাম। ভগৎ সিং-সহ কিছু সংখ্যক যুবক (বেশীর ভাগ ন্যাশনাল কলেজে পড়েছিলেন) লালা লাজপৎ রায়ের কঠোর সমালোচনা করে মুদ্রিত ইশ্‌তিহার বিতরণ করেছিলেন। এই ইশ্‌তিহারের ভাষা ছিল রাজনীতিক শত্রুতাপূর্ণ, অন্তত আমি তা বুঝেছিলাম। কিন্তু ১৯২৮ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে ব্যাপারটা অন্য দিকে ঘুরে গেল। সেদিন সাইমন কমিশন লাহোরে পৌঁছেছিল। লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে সেদিন কমিশনের বিরোধিতা করে রাস্তায় মিছিল বার হল। তার উপরে পুলিশ লাঠি চালনা করে। তাতে লালাজীও আঘাত পান।

"পরের মাসের, অর্থাৎ নভেম্বরের ১৭ই তারিখে লালাজী মারা গেলেন। ...প্রতিবাদের ঝড় উঠল দেশে। ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী দল স্থির করলেন যে, লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ তাঁরা নেবেন। লাহোরের পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট সানডার্সকে তাঁরা হত্যা করলেন, যদিও তাঁদের হত্যা করার কথা ছিল পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টকে। ফলে ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ-বিসর্জন দিলেন। আরও অনেকের লম্বা লম্বা কয়েদ হল।

"...কর্মক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে ভগৎ সিং-এর প্রথম ও দীর্ঘ যোগাযোগ ঘটেছিল 'নওজওয়ান ভারতসভা'য়, আর শেষ যোগাযোগ ঘটেছিল উর্দু 'কীর্তি'-তে।" ('কীর্তি' পত্রিকা, পাঞ্জাবে 'কীর্তি কিষাণ পার্টি' বা 'দি ওয়ার্কাস অ্যান্ড পিজেনটস পার্টি অব পাঞ্জাবে'র মাসিক মুখপত্র, যাতে তার নেতা সোহন সিং যোশের সহকারী রূপে ভগৎ সিং বেশ কিছুকাল লেখার কাজ করেছিলেন। 'কীর্তি' উর্দু ভাষায় বেরুত)।

কিন্তু ভগৎ সিং সম্পর্কে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদের উপরোক্ত বিশ্লেষণ থাকলেও তিনি কিন্তু ভগৎ সিং-এর উদ্যোগে গঠিত পরবর্তীকালের (১৯২৮ সালে) 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি' সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সাধারণ-ভাবে, বেশ কড়া মন্তব্য করেছেন, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় ঐতিহাসিক বিবৃতির মাধ্যমে। ১৯৩১ সালের ৯ই জুন থেকে ১৭ই জুন অবধি তিনি আদালতে যে বিবৃতি দেন তা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে 'গণশক্তি'র মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জন্মশতবর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ৬ই জুলাই ১৯৮৯ তারিখে। এই বিবৃতিতে এক জায়গায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বলেছেন, "...প্রত্যেক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের ত্যাগস্বীকারকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানাবেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা কি বিপ্লবী? আমি নিশ্চই বলব, না। তাঁরা বিপ্লবী নন। তাঁরা বিপ্লবের যা প্রকৃত সামাজিক উপাদান সেই মজুরশ্রেণী ও কৃষকসমাজের উপর কখনোই আস্থা পোষণ করেননি। তাঁদের আদর্শের মধ্য দিয়ে তাঁরা কখনোই আগামী-দিনের সমাজ পরিবর্তন ও ঐতিহাসিক ঘটনা— পরিণামকে মনশ্চক্ষুর সামনে দেখতে পাননি। তাঁরা যুগের ঐতিহাসিক প্রবণতাগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছেন না।...

"তাঁদের এইসব কার্যকলাপ বিবেচনা করলে মনে হয় সন্ত্রাসবাদীরা আজও বিশ্বাস করেন যে একমাত্র ভদ্রলোক শ্রেণীই ভারতীয় বিপ্লব ঘটাতে পারে, যদিও কেউ জানে না বিপ্লব বলতে তাঁরা সত্যই কী বোঝাতে চান। 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'— এই নামে অথবা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কয়েদিদের শ্রমিকশ্রেণী-সুলভ বিপ্লবী স্লোগানে আমার মোহভঙ্গ হতে দিইনি। 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'-র সদস্যদের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ থেকে একথা নির্ভয়ে সাব্যস্ত করা যায় যে এই বন্ধুরা কখনোই এই সব শ্রমিকশ্রেণী সুলভ বিপ্লবী স্লোগানে আস্থা পোষণ করেন নি।···

"সন্ত্রাসবাদীদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে যে তারা নিজেদের বিপ্লবী বলে মনে করে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে অন্যান্য বিপ্লবীশ্রেণী মজুর ও কৃষকদের বাদ দিয়ে তারা কোন বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে সমর্থ নয়।···" (গণশক্তি, কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা—১৯৬-১৯৭)

সম্ভবত, এক্ষেত্রে কিছু তথ্যগত ত্রুটি বা ফাঁক থেকে গেছে। যেটা ঐ সময়ে দলগুলির কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে কাজ করার সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিহিত থাকা স্বাভাবিক। ভগৎ সিং জেল থেকে তরুণ বা যুব রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে যে চিঠিটি ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে লিখেছিলেন, অথবা ৪ঠা জুন, ১৯২৯ তারিখে আদালতে ভগৎ সিং-এর লেখা বিবৃতি যেটা তাঁর উকিল আসফ আলী সাহেব পেশ করেছিলেন, সেগুলি মুজফ্ফর আহ্মদের নজরে এলে হয়ত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাব আসামী হিসেবে ভগৎ সিং-এর দল ও তার কর্মী সদস্যদের সম্পর্কে তিনি এই ধরনের বক্তব্য পেশ নাও করতে পারতেন।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) অপর প্রখ্যাত তাত্ত্বিক নেতা বি. টি. রণদিভে অবশ্য ভগৎ সিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। শিব বর্মা প্রণীত ও সম্পাদিত 'Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh' গ্রন্থের সুচিন্তিত ভূমিকা বা মুখবন্ধে এটি স্পষ্ট।

বি. টি. রণদিভের ভগৎ সিং সম্পর্কে অভিমতের কযেকটি অংশ :

"ভগৎ সিং ও তাঁর কমরেডদের নাম ভারতের মানুষের মনে স্থায়ীভাবে দাগ কেটেছে। সেই সময়কার অন্য কোন বিপ্লবীই এইরকম গভীরভাবে সহানুভূতি, সংহতি ও একান্ত আন্তরিকতার ছাপ রাখতে পারেননি।···

"ভগৎ সিং-এর মত আর কোন বিপ্লবই নবজাগ্রত মানুষের সঙ্গে এমন গভীর আত্মিক সম্বন্ধের এবং সাধারণ মানুষ ও যুবক শ্রেণীর মধ্যে গভীর ভালবাসার পাত্র হতে পারেননি। দিল্লীর আইনসভায় বোমা নিক্ষেপের সময় উচ্চারিত তাঁর স্লোগানের মধ্য দিয়ে ভগৎ তাঁর বৈপ্লবিক সংগ্রামকে চিহ্নিত করেছেন। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ,' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক), ভগৎ সিং উচ্চাবিত এই স্লোগান, সেই সময় ভারতীয় জনগণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। সন্দেহ নেই, কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব এটি অল্প কিছুদিন আগেই তুলেছিল, কিন্তু সেটা জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছতে পারেনি।

"এই ক্লান্তিহীন বিপ্লবী (ভগৎ সিং) কেবল এই স্লোগানটি জনপ্রিয় করেই সন্তুষ্ট

ছিলেন না। তিনি দুর্জয় সাহস, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা, সর্বস্ব ত্যাগের শক্তি, অত্যাচারের সামনে অবিচল থাকার ক্ষমতা, যেগুলি না থাকলে বিপ্লবের কথা ফাঁকা বিপ্লবী বুকনি বা বাগাড়ম্বর হয়, সেই সব বৈপ্লবিক চারিত্রিক গুণের আধার ছিলেন।

"...ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীরা বৃটিশের আদালতে বৃটিশ সরকারকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের বৈপ্লবিক কৌশলের মাধ্যমে। তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থন না করে বৃটিশ সরকারকেই দোষী সাব্যস্ত করে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জায়গায় ঠেলে দিয়েছিলেন। ভগৎ সিং ভিন্ন সেই সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আর কোন বিপ্লবীই পারেননি এইভাবে বৃটিশদের শোষণ যন্ত্রকে কোণঠাসা করে তার বিরুদ্ধে মানুষের সর্বাত্মক ঘৃণা সৃষ্টি করতে।

"এর ফলেই সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল। সরকার বাধ্য হয়েছিল রাজনৈতিক বন্দীদের এবং লাহোর মামলার আসামীদের কিছু মানবিক অধিকার দিতে।...

"হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন—যেটি একটি বিপ্লবী সংগঠন, তার ইশ্‌তেহারে ১৯২৫ সালেই গণতান্ত্রিক চেতনা বোধের ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মধ্য দিয়ে Federal Republic of the United States of India-র (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের) কর্মসূচী ঘোষণা করে।...

"সর্বসাধারণের মধ্যে ভগৎ সিং-এর জীবন ও কর্মকান্ড-ই এক বিরাট প্রমাণ, যে তিনি ছিলেন এমন একজন বিপ্লবী, যিনি শোষিত জনসাধারণের স্বার্থে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রয়োগে বিশ্বাসী এবং অগ্রগামী বৈজ্ঞানিক বিপ্লববাদের শিক্ষার ভিত্তিতে বিপ্লব-প্রয়াসী।

"দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বোঝার উদ্দেশ্যে ভগৎ সিং সদাসর্বদা চিন্তাকে বিকশিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিনা দ্বিধায় একথা বলা চলে যে, বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা, জাতীয় নেতৃত্বের মূল্যায়ন ও দুর্বলতা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে ভগৎ সিং-এর চিন্তা ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতা, যারা শ্রমিকদের মধ্যে শক্তিবৃদ্ধি করছিলেন, তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট মিল বা সাদৃশ্য আছে।...

"ভগৎ সিং লেনিন-কৃত বিভিন্ন সাম্যবাদী গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এই সব অনুশীলনের ফলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই-এরই অঙ্গ।"

('Foreward', by B. T. Ranadive, 'Selected writings of Shaheed Bhagat Singh', edited by Shib Verma)

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ সালে লিখিত 'তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি' দলিলে ভগৎ সিং নিজের সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্য যে বিশ্লেষণাত্মক আত্মপক্ষ সমর্থনকারী বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক বক্তব্যটিও উল্লেখ করেছেন কমরেড বি.টি.রনদিভে তাঁর ঐ 'Foreward'-এ। ভগৎ সিং-এর বক্তব্যটি হল, "আমি সর্বশক্তি দিয়ে ঘোষণা করে সকলকে জানাতে চাই যে আমি সন্ত্রাসবাদী নই। আমার বিপ্লবী জীবনের সম্ভবত একদম শুরুর সময়টুকু ছাড়া আমি কোন সময়ই সন্ত্রাসবাদী ছিলাম না। এবং

এটা আমার দৃঢ় প্রত্যয় এবং প্রামাণ্য বিশ্বাস যে এই সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে বিপ্লবীদের কোন কিছুই লাভ হয় না। আমাদের হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের ইতিহাস বিচার করলে যে কেউ সহজেই এর বিচার করতে পারবেন।···কেউ যদি আমাকে ভুল বুঝে থাকেন দয়া করে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা শুধরে নিন।···"

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আজ আমাদের মধ্যে নেই। থাকলে তিনি হয়ত আদালতে দেওয়া তাঁর বয়ান সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে পাবতেন। ভগৎ সিং ও তাঁর দল H. S. R. A সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ও মন্তব্যে হয়ত নতুন সংশোধন ও মাত্রাও যোগ হতে পারত।

বাস্তবিক বিচারে ভগৎ সিং, শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে সদা সতর্ক থেকেছেন। সুদূর অতীতে, ১৯২১ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে ঠাকুরদাকে লেখা চিঠিতে তিনি রেলওয়ে কর্মচারীদের হরতালের কথা উল্লেখ করেছেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় বছর চৌদ্দ-পনেরো। সর্বশেষ, জেল থেকে পাঠান ২রা ফেব্রুয়ারী '৩১-র দলিলেও তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, "সত্যিকারের বিপ্লবী বাহিনী রয়েছে গ্রামে ও কলকারখানায়। কৃষক ও শ্রমিকরাই সাচ্চা বিপ্লবী শক্তি। কিন্তু আমাদের বুর্জোয়া নেতারা এই বিপ্লবী শক্তিকে সামলাতে ভয় পায়।"

২০র দশক থেকে এ দেশের বুকে গড়ে ওঠে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন। একসময় আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্বযং গান্ধীজী। বাল গঙ্গাধর তিলকও শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন গড়ার কথা বলেছেন। লালা লাজপত রায় নিজে মার্কসবাদী না হয়েও রুশ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকায় যুক্ত হন। পরবর্তীকালের স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি গিরিও একসময় ১৯২৬ সালে, এ. আই. টি. ইউ. সি'র ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মস্কো থেকে এই সম্মেলনে শুভেচ্ছাবাণীও এসেছিল। ১৯২৪ সালে কলকাতায়, এ.আই.টি.ইউ.সি'র চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। লেনিনের মৃত্যুতে এই সভায় শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে বৃটিশ সরকার ১৯২৬ সালেই চালু করে 'দি ইন্ডিয়ান ট্রেড-ইউনিয়ন এ্যাক্ট ১৯২৬', যেটি কিছু সংশোধনীসহ আজও স্বাধীন ভারতের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে পূর্ণ আইনী ক্ষমতায় প্রযোজ্য।

আসলে, ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা নেতৃত্বের অভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীই একে তাদের শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সোভিয়েত বিপ্লব ও বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে, ভারতের বুকে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে খতম করার যে চক্রান্ত বৃটিশ সরকার নিয়েছিল, তার রাজনৈতিক তাৎপর্যকে একমাত্র ভগৎ সিং ও তাঁর দল H. S. R. A-ই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে। সামগ্রিক প্রতিবাদ ও গণজাগরণের উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন দমনকারী, 'ট্রেড ডিসপিউটস বিল' এবং 'পাবলিক সেফটি বিল', দুটির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাতে দিল্লীর আইনসভায় তারাই শব্দ বোমা

ফাটায়। সর্বশেষে সুপরিকল্পিতভাবে, স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করে, নিজেদের জীবন বাজী রেখে H. S. R. A-এর পক্ষ থেকে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত আদালতকে বিপ্লবী প্রচারের কাজে সার্থকভাবে বৈপ্লবাত্মক পন্থায় ব্যবহার করেন।

ভগৎ সিং এবং তাঁর দল H. S. R. A, আত্মবলিদানের মাধ্যমে যার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সেটি হল শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে দমন পীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের এক ঘৃণ্য আইন। এর পরও কি বলা চলে, এঁরা শ্রমিক শ্রেণীসুলভ বিপ্লবী শ্লোগানে আস্থা পোষণ করেননি ?

কানপুরে থাকাকালীন ১৯২৬ সালে ভগৎ সিং গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর হিন্দী সাপ্তাহিক 'প্রতাপ' পত্রিকায় হিন্দীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন, 'এক পাঞ্জাবী যুবক' এই ছদ্মনামে। প্রবন্ধটির নাম, 'হোলী কে দিন রক্ত কে ছিঁটে, বব্বর অকালী ফাঁসি পর।' এটি প্রকাশিত হয় ১৫ই মার্চ, ১৯২৬ তারিখের সংখ্যায়।

প্রবন্ধটির বিষয় ছিল, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ তারিখে হোলী বা দোল উৎসবের দিন সকলের অগোচরে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ছয় জন বব্বর অকালি বীর শহীদের ফাঁসির ঘটনা। গুরুদ্বারের মোহন্তদের বিরুদ্ধে যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন চলছিল এবং তাকে দমন করার জন্য অসংখ্য সত্যাগ্রহীর ওপর নৃশংস আক্রমণ ও হত্যালীলা ঘটেছিল তার মোকাবিলা করেছিলেন পাল্টা সশস্ত্র পন্থায় এই বব্বর (অর্থ, সিংহ) অকালী নেতারা। এরই পরিণতি ফাঁসি কাঠে জীবনদান।

মাত্র ১৯ বছর বয়সের ভগৎ গভীর মর্মবেদনায় এই বীরদের আত্মদানের ঘটনা এবং পাশাপাশি কিছু মানুষের কাপুরুষোচিত নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে তাঁর আবেগময়ী লেখনী সঞ্চারণ করেন। এই লেখায় লক্ষণীয় যে বাঙলার বুকে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর (বাঘা যতীন) আত্মদান, পুলিশ কমিশনার টেগার্টের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ইত্যাদি খুঁটিনাটি ঘটনাও স্থান পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, ভগৎ সিং, ঐ বয়সেই সারা ভারতের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ও তার সঙ্গে যুক্ত নানান মানুষ-জন সম্পর্কে কত বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

৬

সক্রিয় কর্মকাণ্ডে উত্তরণ

(১৯২৬-১৯২৯, জানুয়ারী)

১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট কাকোরী রাজনৈতিক অ্যাকশনের পর ব্যাপক ধরপাকড় ও নেতাদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় দলের সাংগঠনিক দায়দায়িত্বের অন্যতম সক্রিয় অংশীদার হতে হয় ভগৎ সিংকে। এই দায়িত্ব পালন করতে ভগৎ সিংকে লাহোর-কেন্দ্রিক কাজের পরিবর্তে অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করে যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের সঙ্গেও যোগসূত্র গড়ে তুলতে হয়। বিদেশী শাসক শোষকের শ্যেনচক্ষুর আড়ালে গুপ্ত সংগঠনের কাজ

এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল সেই সময়ে অসীম সাহস, বুদ্ধি ও উদ্দেশ্য সাধনে দুর্জয় প্রতিজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল। ভগৎ সিং তাঁর সামান্য ১৯/২০ বছরের বয়সে সেই কঠিন কাজগুলিকেই একের পর এক এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।

যশপাল লিখেছেন, "১৯২৬ সালের গোড়ার দিক থেকেই সুখদেব আমাকে বার বার এই প্রশ্ন করতে থাকে যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবার ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ত বা বিচার কি?···সুখদেব এবং ভগৎ সিং-এর আমার কাজের ঢং পছন্দ হচ্ছিল না।···সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা শোনা সুখদেবের কাছে অস্বস্তিকর ছিল।···সুখদেবের এই ধরনের ব্যবহারের হয়ত একটা কারণ ছিল এই যে, তারা খুব দ্রুত একটা বড় ধরনের কাজ বা অ্যাকসনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিপদের আশঙ্কায় এসব কাজের কথা বা তার রূপরেখা আগে থেকেই ব্যাখা করা হোত না।···"

কাকোরী ষড়যন্ত্রের আসামী, দলের নেতা ও সংগঠকদের মুক্ত করাই ছিল এই গোপন পরিকল্পনার কর্মসূচী। দলের দায়িত্বশীল সংগঠক হিসাবে ভগৎ সিং ও সাথী সুখদেব এই কাজেই যুক্ত ছিলেন। তাই দলের বিপ্লবী নেতা যোগেশ চ্যাটার্জী লিখছেন:

"একদিন সকালে যখন আমাদের বাসটি কাইজার বাগের রোশনোদুল্লা কোর্টে যাইবার সময় এ্যবট রোড হইতে ক্যান্টনমেন্ট রোডে ঢুকিতেছিল, তখন ভগৎ সিং ঐ মোড়ের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা আদালত কক্ষে 'ডক'-এর উপর আসন গ্রহণ করিবার পরই তিনি অন্যান্য দর্শকদের সহিত আদালত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে আমাদের খুব নিকটেই তিনি একটি আসন গ্রহণ করিযাছিলেন।

"তখন পর্যন্ত তিনি শিখ যুবকের পোষাকে ছিলেন। তিনি একটি কারুকার্য করা পাগড়ি মাথায় পরিয়াছিলেন এবং ওনার পরণে ছিল একটি যোধপুরী খাকি ব্রীচেস। তিনি সারাদিনই তাহাব স্বভাবসিদ্ধ হাসি মুখে সেখানে বসিয়াছিলেন। পুলিশের লেকেরা, সি.আই.ডি-র দুর্ধর্ষ মাথা স্বরূপ ব্যক্তিরা ও তাহাদের প্যায়ারের ম্যাজিস্ট্রেট, সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেহই সৌম্য সুবেশধারী শিখ যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

"আমাদের বাস যখন আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল, তখনো তিনি আদালতের সম্মুখস্থ বাগানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই শেষ বার আমি ভগৎ সিং-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।" ('স্বাধীনতার সন্ধানে')।

এই সময় দলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে যোগেশ চ্যাটার্জী, রামপ্রসাদ বিসমিল, গোবিন্দ কর ও মন্মথ গুপ্তদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যোগেশ চ্যাটার্জী লিখেছেন যে জেল প্রাচীরের বাইরে দলের কর্মীরা দড়ির মই, অস্ত্রশস্ত্র, এমনকি বোমা পর্যন্ত সঙ্গে নিযে অপেক্ষা করতে থাকেন। এই বাহিনীর মধ্যে নাকি ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা সূর্য সেনও (মাস্টারদা) ছিলেন। সারারাত অপেক্ষা করে তাদের ফিরে আসতে হয়। কারণ, পাহারাদারদের তৎপরতায় জেল পালাবার পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

কিন্তু ভগৎ সিং-এর প্রয়াস থেমে থাকেনি। কাকোরী কাণ্ডের আকস্মিক ধাক্কা সামলে,

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ভগৎ সিং সারা দেশজুড়ে কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকেন। দলের কর্মী সংগ্রহ, প্রচার, বন্দীমুক্তির গোপন কর্মসূচী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে তাঁর নিরলস জ্ঞানানুসন্ধান, ব্যাপক অধ্যয়ন, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক।

সাথী বিপ্লবী শিব বর্মা তাঁর স্মৃতিচারণমূলক 'শহীদ স্মৃতি' গ্রন্থে এই সময়ের ভগৎ সিং সম্পর্কে এক সুন্দর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। সময়টা ১৯২৭ সালের গোড়ার দিক।

"দিল্লী থেকে এক বন্ধু লিখলেন, এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমার আর জয়দেবেব সঙ্গে দেখা করতে কানপুর আসছেন। বিপ্লবী পার্টিতে তখন সবে আমরা এসেছি, কানপুরের বাইরে খুব কম লোকই আমাদের চিনতেন। লখনউ-এলাহাবাদের কেউ হলেও না হয় ভেবে দেখা যেতে পারত। কিন্তু পাঞ্জাবী এই ভদ্রলোকটি কে? বন্ধুটি লিখেছিলেন, 'যমুনার ঘাটে, যেখানে আমি থাকি, সেখানেই এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ইনি তোমাদের খুব কাছের লোক। একটা কাজে কানপুর যাবেন বলছিলেন। আমি তোমাদের দু'জনের হদিশ দিয়েছি। নিজের বাকি পরিচয় উনি নিজেই দেবেন।'

"চিঠি পেয়ে আমরা বড়ো অস্বস্তিতে পড়লাম। ভাবলাম তাবৎ গোপন কথা জানিয়ে দিয়ে কেমন লোককে পাঠালেন, কে জানে। দিল্লী থেকে রওনা যখন হয়েছেন, তখন কানপুরে নিশ্চই আসছেন। অতএব, সবার আগে আমরা নিজেদের ঘর তন্ন তন্ন করে তল্লাস করলাম এবং পাঠ্যপুস্তকাদি বাদে অন্য সব বই আর কাগজপত্র সরিয়ে ফেললাম। সেই সময় আমরা ডি. এ. ভি কলেজ ছাত্রাবাসের লাল বাংলোয় থাকতাম। নিজের ঘরে গান্ধী-বাবার এক চরকা রেখে দিয়েছিল জয়দেব। জাতীয় ধ্যানধারণার সেটাও তো একটা পরিচয়। তাই সেটাকেও আমরা সরিয়ে দিলাম। আমরা এও স্থির করলাম যে, পাঞ্জাবী ভদ্রলোক যদি প্রথমে জয়দেবের কাছে যান, তাহলে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করানো হবে না; আর যদি তিনি প্রথমে আমার কাছে আসেন, তবে তাঁকে আমি জয়দেবের কাছে ঘেঁষতে দেব না।

"অতঃপর একদিন সকালে আমার ঘরে বসে কলেজের কাজ সারছি, এমন সময় শুনলাম, আমার প্রতিবেশীর কাছে কেউ আমার খোঁজ করছে। নিজের নাম শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ময়লা শালওয়ার-কামিজ পরা গায়ে কম্বল জড়ানো এক শিখ যুবক সামনে দাঁড়িয়ে। লম্বা আকৃতি, খুব ফরসা রঙ, ছোট ছোট দাড়ি, কেশ (অর্থাৎ শিখ ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক পঞ্চ 'ক'; কড়া, কংঘি, কিরপান, কচ্ছ ও কেশ) ও পাগড়ি। আমাকে দেখে প্রতিবেশী বললেন, 'ইনিই শিব বর্মা'।

"দুহাত প্রসারিত করে আগন্তুক এমন করে আমায় জড়িয়ে ধরল যেন বহু পুরানো বন্ধু। তারপরই আমার হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে ঢুকল, যেন ঘরটা আমার নয়, তার। ছোট ঘরে জায়গার অকুলানের দরুন চারপাই খানা বার করে দিয়ে মেঝেতে বিছানা পেতে রেখেছিলাম। শিষ্টাচারাদির কোন ধার না ধেরে নিঃসংকোচে বিছানার ওপর আসন গেড়ে হাত ধরে আমায় পাশে বসাতে বসাতে সে বলল, 'আমার নাম রঞ্জিত। আমি

দু-চার দিন এখানে থাকব। তোমার দিল্লীর বন্ধুর কাছে তোমার আর জয়দেবের কথা আমি শুনেছি। আমিও তোমাদেরই পথের পথিক'। তারপর একটু ভেবে বলল, 'বিজয় আর সুরেন্দ্র পাণ্ডেকে চেন?'

"রঞ্জিতের সরল ব্যবহার, অকপট হাসি, আর হাস্যময় চোখ প্রথম দর্শনেই আমাকে নিরস্ত্র করে ফেলেছিল, তখন তাকে আর অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সংযমের সব বাঁধ তখন ভেঙে গেছে আমার। ঠিক তেমনই সহজভাবেই বলে দিলাম, 'হ্যাঁ চিনি।'

"সে বলল, 'তাহলে ওদের দুজনকে খবর দাও আজ রাতে যেন এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।' একটু থেমে বলল, 'জয়দেব কোথায়'?

"এবার আমি মিথ্যে কথা বললাম। সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললাম, 'বাইরে কোথায় গেছে, এখানে নেই।'

"আমি যে কথা ঢাকছি, রঞ্জিত তা আঁচ কবল। এখনো আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না বুঝতে পেরে খানিকক্ষণ সে মন-মরার মতো হয়ে রইল। সে ভিকটর হুগোর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'ল্য মিজারেবলস্' সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে সেটাই সে পড়তে শুরু করে দিল। তার হাসি, তার কথাবার্তা, আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত তার ব্যবহারাদির ওপর হঠাৎ যেন কেউ ব্রেক কষে দিয়েছে।

"মিথ্যে কথা বললাম বটে, মনটা কিন্তু খচ্‌খচ্ করতে লাগল। রঞ্জিতের সেই মন-মরা ভাবের সমুখে আমার পক্ষে ঘবে তিষ্ঠনো অসম্ভব হয়ে উঠছিল। বিজয়কে খবর পাঠানোর ছুতো করে কলেজে চলে গেলাম। সুরেন্দ্রকে রঞ্জিতের বার্তা দিলাম, তখনই সে জানাল, রঞ্জিত পার্টির পুরানো লোক।

"কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে দুপুরের খাওযার সময হয়ে গেল। জয়দেব আর আমি মেসে প্রায় এক সঙ্গে খেতে যেতাম। রঞ্জিতের জন্যে ঘরে খাবার না আনিযে তাকেও সঙ্গে নিযে গেলাম। মেসে তখন খাবার লোক আমরা তিনজন। আমার আব জয়দেবের মাঝখানে বসলেও জয়দেবকে মেসের অন্য কোন সদস্য ভেবে রঞ্জিত সেদিকে আর নজর দেয়নি। কোন কথাবার্তা না বলে জয়দেব যখন তার ডালে বেশ খানিকটা গরম ঘি ঢেলে দিল, তখনই সে প্রথম জয়দেবের দিকে চাইল, তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখতে লাগল। তার এই দ্বিধাগ্রস্ততায় আমাদের দুজনের হাসি পেয়ে গেল। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'জয়দেব'?

"আমরা আরও জোরে হেসে উঠলাম। আমার পিঠে সজোরে একটি ঘুষি বসিযে রঞ্জিত বলল, 'চোর কঁহী কে!' তারপর ব্যঙ্গের মাত্রা চড়িয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে নিজেদের লোকজনকে খুব করে বাজিয়ে নেওয়াই রেওয়াজ!'

"বললাম, 'আপাতত তোমার ঘুষির চোটে আপন-পর সব এক হয়ে গেছে।'

"বাঁহাত দিয়ে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, 'এই নাও, পিঠ টিপে দিচ্ছি। এবার মুখটি বুজে খেয়ে নাও!'

"রঞ্জিত যে কদিন আমার ঘরে রইল প্রায় প্রত্যেক দিনই বিজয় আর সুরেন্দ্র পাণ্ডে

আসত। কাকোরী মামলার আসামী পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিস্‌মিল-কে জেল থেকে ছিনিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে এসেছিল ওরা। তিন-চার দিন থাকার পর, বিস্‌মিলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, পরিকল্পনা পাকা করে রাখার ভার বিজয়ের ওপর দিয়ে, রঞ্জিত পাঞ্জাব ফিরে গেল।

"রঞ্জিত চলে যাবার পর জানতে পেরেছিলাম, ওর আসল নাম হ'ল ভগৎ সিং। আগেও সে কানপুরে শ্রীগণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর কাছে 'প্রতাপ' পত্রিকায় কাজ করেছে। 'প্রতাপ'-এ কাজ শুরু করার আগে কিছু দিন সে কাগজ বেচে চালিয়েছে। এও জেনেছিলাম যে, বিস্‌মিলকে জেল থেকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা আগে আর এক বার হয়েছিল কিন্তু কোন কারণে মাঝপথেই তা পরিত্যক্ত হয়। তাতে অংশগ্রহণ করার জন্যে ভগৎ সিং আর সুখদেবের সঙ্গে পাঞ্জাবের আরও কয়েকজন সঙ্গীও এসেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ওদের এবারকার প্রচেষ্টাটা দ্বিতীয়।"

এই সময়ের অবস্থাটা আন্দাজ করা যায় যশপালের ঘটনা বর্ণনায় :

"এই সময় লাহোরে আমাদের সংগঠনে কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে হোত। ভগৎ সিং দিল্লী আর কানপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। দল কোন বড় কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এটি ছিল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী বিপ্লবীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার পরিকল্পনা। পাঞ্জাব থেকেও কিছু কর্মীদের এ কাজে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কিন্তু এর চাইতেও বড় জরুরী কাজ ছিল অর্থের বন্দোবস্ত করা। যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় দল খুবই কমজোরী হয়ে পড়ে। পাঞ্জাবে দলের প্রতিনিধি হিসেবে যোগসূত্র রক্ষা করতেন জয়চন্দ্রজী। ভগৎ সিং অধিকাংশ সময় দিল্লী-কানপুর যাতায়াত করত। লাহোরে আমাদের মধ্যে রোমাঞ্চ, ব্যাকুলতা প্রবল ছিল। কিন্তু কি হতে চলেছে এ ব্যাপারে আমরা থাকতাম সম্পূর্ণ অন্ধকারে।" ('সিংহাবলোকন', যশপাল রচিত)

গোপনীয়তা রক্ষা করাই ছিল সেই সময়ের কাজের শর্ত। সেই শর্তকে কঠোরভাবে পালন করতেন ভগৎ, তাঁর সাংগঠনিক বিস্তারের কাজে। শিব বর্মার স্মৃতিচারণে এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃত তথ্য জানা যায় :

"মাস দুয়েক বাদে ভগৎ সিং ফের এল। এবারে সে রইল অনেকদিন। রামপ্রসাদ বিস্‌মিল-এর সঙ্গে বিজয়ের যোগাযোগ সম্পর্ক প্রথমে খুব ভালই ছিল। পরিকল্পনায় বিস্‌মিল সায়ও দিয়েছিলেন। কেবল দিনক্ষণ তখনো স্থির করা যেতে পারেনি। ওদিকে মামলা নিষ্পত্তির দিন এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটে, যার ফলে, বিস্‌মিল-এর সঙ্গে চিঠি-চালাচালি ও দেখা সাক্ষাৎ প্রভৃতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তার ওপরেও বসল কড়া পাহারা। এই সব ব্যাপার যে কেন, আর কি করে ঘটল, জানি না। তবে এতে আমাদের পরিকল্পনায় বড় রকমের একটা ঘা লাগে। তা সত্ত্বেও বিজয় নিজের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

"ভগৎ সিং আমার ঘরে তার বেশির ভাগ সময় কাটাতো বই পড়ে। ভিক্টর হুগো,

হলকেন, তলস্তয়, দস্টয়েভস্কি, গোর্কি, বার্নার্ড শ, ডিকেন্স প্রভৃতি ছিল তার প্রিয় লেখক। পড়তে পড়তে একঘেয়েমি এলে সে ছাত্রাবাসের পিছনে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসত কিংবা কলেজের থেকে আমার আর জয়দেবের ফুরসত হলে, আমাদের সঙ্গে গল্প করত। তার কথাবার্তার বিষয় হ'ত নিজের পড়া বই। সেই সব বইয়ের কথা আমাদের বলত। আমরাও যাতে সেগুলো পড়ি, তার জন্যে জোর করত। কখনো কখনো পুরনো বিপ্লবীদের কাহিনীও শোনাত—কুকা বিদ্রোহ, গদর পার্টির ইতিহাস, কর্তার সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদ প্রমুখের জীবনকথা তথা বব্বর অকালীদের বীরত্বের কাহিনী বলতে বলতে প্রায়ই তার ঘোর লেগে যেত। তার বর্ণনাশৈলীর এমনই আকর্ষণ যে, তার টানে প্রায় রোজই কলেজ পালিয়ে আমরা চলে আসতাম।

"জয়দেব গোড়া থেকেই আমার চেয়ে তাগড়া। ঝুঁকি নেওয়াই ছিল তার স্বভাব, মারপিটের ব্যাপারেও হাত তার দরাজ। তার এই সব গুণে আকৃষ্ট হয়েই ভগৎ সিং তাকে বিস্‌মিল সংক্রান্ত 'অ্যাকশন'-এ নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করে। একদিন দুপুরে যখন সে তার এই সিদ্ধান্তের কথা আমায় বলল, তখন নিজের দুর্বল শরীরের ওপর আমার বড় রাগ হ'ল। আমাকে পার্টির কাজের যোগ্য বলে মনে করা হ'ল না ভেবে মনে বড় ঘা লাগল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ঘুমের ছুতো করে এক পাশে শুয়ে পড়লাম। ভগৎ সিং জানত আমি ঘুমোচ্ছি না। পাশে শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ সে একটা বইয়ের পাতা ওলটাল। তারপর আমার কাঁধ ধরে টেনে আস্তে আস্তে ডাকল, 'শিব'।

"ওর দিকে পাশ ফিরতে ফিরতে বললাম, 'কি'?

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

"বল।

"ব্যক্তির নাম বড, না পার্টির কাজ?

" 'পার্টির কাজ', আমি জবাব দিলাম।

"আর পার্টির কাজ যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে, আমাদের সব 'অ্যাকশন' যাতে সফল হয়, দেশবাসীর কাছে আমাদের কথা যাতে নিয়মিত পৌঁছয়, আমাদের এই স্বাধীনতার লড়াইয়ে প্রত্যেকটি স্তরে আমরা যাতে সাফল্য লাভ করতে পারি তার প্রথম শর্ত কি?

" 'একটা মজবুত আর ব্যাপক সংগঠন', আমি জবাব দিলাম।

"ও (ভগৎ সিং) বলল, 'সংগঠন আর প্রচার। দেশের জনসাধারণ আমাদের সাহস আর আমাদের নানান কাজের প্রশংসা করলেও আমাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। এখনো আমরা খোলাখুলি তাদের এ-কথাও বলতে পারছি না যে, আমরা যে স্বাধীনতার কথা বলছি তার কাঠামোটা কেমন হবে, ইংরেজ চলে যাবার পর যে-সরকার হবে, তা কেমন হবে, কার হবে। আমাদের আন্দোলনকে গণভিত্তি দেবার জন্যে আমাদের অভীষ্টকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। কেননা জনসাধারণের সমর্থন না পেলে পুরনো কায়দায় দু' একজন ইংরেজ কর্মকর্তা কিংবা সরকারী টিকটিকি, কি রাজসাক্ষীকে মেরে, আমাদের আর চলবে না। এ-যাবত সংগঠন

তথা প্রচারের ব্যাপারে উদাসীন থেকে 'অ্যাকশন'-এর ওপরেই আমরা জোর দিয়ে এসেছি। কাজের এই ধরণ আমাদের ছাড়তে হবে। আমি তোমাকে আর বিজয়কে সংগঠন ও প্রচারের কাজের জন্যে পিছনে রাখতে চাই'।' ('শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা।)

পুরনো সন্ত্রাসবাদী পথ থেকে সরে এসে দলের নতুন চিন্তাপদ্ধতি ও কর্মসূচী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরবর্তী বছর, ১৯২৮ সালে, ভগৎ সিং যে ঐতিহাসিক উত্তরণের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, শিব বর্মার সঙ্গে তাঁর এই একান্ত কথোপকথনের স্মৃতির টুকরো থেকেই তা স্পষ্ট। আদর্শগত দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে ভগৎ সিং-এর এইসব কথার টুকরোই তাঁর দল গড়ার প্রস্তুতিপর্বের প্রমাণ রাখে।

শিব বর্মার স্মৃতিচারণ আরও এগিয়ে চলে :

"খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে (ভগৎ সিং) আবার বলল, 'আমরা সবাই সৈনিক। সৈনিকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ রণক্ষেত্রের প্রতি। তাই 'অ্যাকশন'-এ (বিপ্লবীদের পরিভাষায় জেল ইত্যাদি থেকে কাউকে ছিনিয়ে আনা, কোন কর্মকর্তাকে হত্যা করা, ডাকাতি করা, কিংবা পুলিশের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করা ইত্যাদি কাজকে 'অ্যাকশন' বলা হোত) যাবার কথা উঠতেই সবাই উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তবু আন্দোলনের কথা মনে রেখে কাউকে না কাউকে তো 'অ্যাকশন'-এর মোহ ছাড়তে হবে। সাধারণত 'অ্যাকশন'-এ যারা লড়ে বা ফাঁসিতে ঝোলে, শহীদত্বের বরণমালা তাদের গলায়ই পড়ে, এ কথা ঠিক। ইমারতের সিংহ দরজায় হীরার যে অলংকরণ, এদের মূল্যও তাই। অথচ ইমারতের দিক থেকে দেখতে গেলে, ভিতের নীচে চাপা-পড়া একটা পাথরের তুলনায় এদের মূল্য কিছুই নয়।

"শুয়ে শুয়েই আমি ভগৎ সিংহের কথা শুনছিলাম। আমার মাথার কাছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ও বসে ছিল। কথা বলছিল যেন সরবে চিন্তা করছে। মাঝে মাঝে ওর ডান হাতের আঙুল আমার চুলে বিলি কাটছিল আর ও ধীরে ধীরে থেমে থেমে সেই ঢঙে আবার বলা শুরু করেছিল,

"হীরা ইমারতের সৌন্দর্য বাড়াতে পারে, দর্শকের চোখ ধাঁধাতেও পারে, কিন্তু ইমারতের ভিত হতে পারে না। তার স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে না। শত শত বছর নিজের কাঁধে ইমারতের ভার নিয়ে তাকে খাড়া করে ধরে রাখতে পারে না। এ-যাবত আমাদের আন্দোলন হীরা উপার্জনই করেছে। বনেদের পাথর জড়ো করতে পারেনি। সেই জন্যেই এত ত্যাগের পরেও ইমারত তো দূরের কথা, তার কাঠামোটা পর্যন্ত আমরা খাড়া করতে পারলাম না। আজ আমাদের প্রয়োজন বনেদের পাথরের।

"খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে (ভগৎ সিং) আবার বলল, 'তাছাড়া ত্যাগ আর আত্মবলিদানেরও দুটো রূপ। এক হল, গুলি খেয়ে কি ফাঁসিতে লটকে মরা। এর চমকটাই বেশি, কষ্টটা কম। দ্বিতীয়টা হ'ল পিছনে থেকে সারা জীবন ইমারতের বোঝা বয়ে বেড়ানো। আন্দোলনের চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে প্রতিকূল অবস্থায় কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন এক এক করে সব সঙ্গীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। মানুষ তখন দুটো সহানুভূতির

কথার জন্যও লালায়িত হয়। তেমনি সময়েও যারা অবিচলিত থেকে নিজের পথ ত্যাগ করে না, ইমারতের বোঝায় পা যাদের টলে না, কাঁধ বাঁকে না, তিল-তিল করে যারা নিজেদের গলিয়ে যায়, জ্বালিয়ে যায়, যাতে প্রদীপের জ্যোতি মলিন না হয়, নিস্তব্ধ পথে যাতে আঁধার না ছেয়ে আসে, সেই সব লোকের ত্যাগ ও আত্মবলিদান কি প্রথমোক্তদের তুলনায় বেশি নয়?

"চোখ তুলে ভগৎ সিং-এর দিকে দেখলাম। সে মুচকি হাসল। বলল, 'তুমি আমায় ভুল বুঝেছিলে। তাই এই সব বলতে হ'ল। এই তো সবে আমাদের যাত্রা শুরু। এখন থেকেই ভুলের বশে আমরা যদি একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকি, তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছব কি করে'?" ('শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা)।

ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী সাথী এই শিব বর্মাই তাঁর 'Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh' গ্রন্থে'র মুখবন্ধে তাই হৃদয় উন্মুক্ত করে বলেছেন, "সাধারণ মানুষ জানে না, ভগৎ সিং সত্যিই কি মানুষ ছিলেন। তারা কেবলমাত্র এইটুকু জানে যে ভগৎ সিং একজন সাহসী মানুষ ছিলেন যিনি লালাজীর (লালা লাজপত রায়) হত্যার বদলা নিয়েছিলেন সান্ডার্স (পুলিশ অফিসার) বধ করে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা ছুঁড়ে ছিলেন। কিন্তু, ভগৎ সিং যে একজন অতি উচ্চস্তরের অসামান্য বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও সদ্-হৃদয় ও সদ্-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন একথা অনেকেরই জানা নেই।...চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের থেকে অনেক অনেক উচ্চস্তরে।"

বিস্ময়কর বিষয় হল, ভগৎ সিং চরিত্রে, এইসব গুণাবলী যখন বিকাশমান, তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। আর সেই সামান্য কুড়ি বছরের যুবকই ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে, এক আবেগমুক্ত বাস্তববাদী বুদ্ধিদীপ্ত পরিণতির দিকে, তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

শিব বর্মার স্মৃতিচারণ পর্বের পরবর্তী অংশ :

"এই সময় জয়দেব ঘরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'কি হচ্ছে?'

" 'তোমার বন্ধুর সন্দেহ হয়েছিল আমি চুরি করেছি। তারই সাফাই গাইছিলাম।' এই বলে ও (ভগৎ সিং) আমার (শিব বর্মার) হাত ধরে তুলে আমাকে বসিয়ে দিল। এবার তার পুরানো মেজাজ ফিরে এসে গিয়েছিল। সকালে গঙ্গার ধারে কলেজের নৌকো দেখে এসেছিল। (ভগৎ) প্রস্তাব করল, 'আজ রাতে গঙ্গায় একটু নৌকোবিহার হোক না।' কথা পাকা হয়ে গেল। বিজয়, সুরেন্দ্র আর ব্রহ্মদত্তকেও খবর পাঠানো হল।

"আগেকার ব্যবস্থামত রাত দশটা নাগাদ আমাদের পুরো দলটা নৌকোয় পৌঁছে গেল। সাঁতার কাটতে আর নৌকো বাইতে ভগৎ সিং বিশেষ ভালবাসত। নৌকো খুলে দিয়ে সে দাঁড় তুলে নিল। তখন আমরা মাঝ গঙ্গায় পৌঁছে গেছি। দাঁড়ের প্রতিটি আওয়াজ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ার নৈঃশব্দকে ব্যঙ্গ করছিল, আর ভগৎ সিং-এর মজবুত বাহু নৌকোটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল নদীর স্রোতের বিপরীতে। অনেকটা দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর ও

দাঁড় রেখে দিল। স্রোতের টানে মন্দ গতিতে নৌকো ফিরে চলল কলেজের দিকে। তখন প্রয়োজন শুধু নৌকো যাতে এদিক-ওদিক গিয়ে না পড়ে তা-ই দেখা। ভগৎ সিং আর বিজয় গান শুরু করে দিল, হাওয়ায় সাঁতরাতে লাগল ওদের গানের সুর।...

"দিন দুই-তিন পরে বিজয় এসে বিস্‌মিল-এর ওপর জেলে যে-সব কড়াকড়ি হচ্ছে তার অফিসার মহলের, সেইসব সতর্কতার বিবরণ দিয়ে বলল, 'ওকে জেল থেকে বার করে আনার পরিকল্পনা আপাতত আমাদের ত্যাগ করতে হবে।' এই খবরে ভগৎ সিং-এর সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। তার সব স্বপ্ন ভেঙে গেল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিস্‌মিলের লেখা একটি গজল[২২] বিজয়ের হাতে এসেছিল। আমাদের পরিকল্পনা রূপায়ণে দেরি দেখে, সম্ভবত অনুযোগের সুরে গজলটি উনি (বিস্‌মিল) রচনা করেছিলেন। জেলের কর্মকর্তারা সাধারণ একটা প্রেমের কবিতা ভেবে সেটি পাস করে দিয়েছিল।...বিজয়ের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে ভগৎ সিং পড়ল। বিস্‌মিলের ইঙ্গিত পরিষ্কার—'কিছু করার থাকলে জলদি কর, এর পরে দড়িতে লটকানো আমার লাশটা যদি তোমরা খুলেও আন, সেটা কোন্ কাজে লাগবে? কাগজের টুকরোটা ওর (ভগৎ-এর) হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে পাথরের প্রাণহীন মূর্তির মতো দেওয়াল ঘেঁষে লুটিয়ে পড়ল ও (ভগৎ)। সেদিন কারো পক্ষেই আর বিশেষ আলাপ-আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। বিজয় আর সুরেন্দ্র চলে গেল। কোন কথাবার্তা না বলে নিঃসাড়ে ভগৎ সিং চলে গেল গঙ্গার দিকে।

"রাত অনেকখানি হবার পর আমি আর জয়দেব ওর খোঁজে গঙ্গার ধাবে গিয়ে দেখি, তখনো মাথায় হাত দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো ঠাণ্ডা ভিজে বালিতে সে বসে। কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে ওকে ঘরে যেতে বললাম। নিঃশব্দে উঠে, ছায়ার মতো আমাদের পিছু-পিছু ও (ভগৎ) এল। তখনো মুখে একটা কথা নেই।

"কিছুই যেখানে ছিল না মাস কয়েক ধরে খেটেখুটে সেখানে ও (ভগৎ) সংগঠনের একটা কাঠামো খাড়া করেছিল। পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। অস্ত্রসংগ্রহ করেছিল। সাথী জুটিয়েছিল। উদ্দেশ্য যখন সফল হতে চলেছে, যখন মনে হচ্ছে কিছু করে উঠতে পারবে, ঠিক তখনই সবকিছু ভেস্তে গেল। রইল শুধু বিস্‌মিল-এর অনুযোগ। এতে ভগৎ সিং খুব আঘাত পায়। তবে একদিনের মধ্যেই ও সামলে ওঠে।

"পরের দিন ও (ভগৎ) নিজেই বলল, 'ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে পড়লে রাস্তাটাই জোড়া হয়। রাস্তার পাথর সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বদলে আমরা অন্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াই।' সব সাথীদের একত্রে ডেকে, সংগঠন ও প্রচারের সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলল। আগামী দিনের কর্মসূচী তৈরি করল। তারপর শিগ্‌গির আবার ফিরে আসার কথা দিয়ে পাঞ্জাব চলে গেল। সেটা ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকের কথা।...

"ভগৎ সিং কানপুর এলেই অন্যান্য বইপত্রের সঙ্গে নওজওয়ান ভারত সভার কিছু না কিছু বইপত্তর নিয়ে আসত। রাধামোহন গোকুলজী ও সত্যভক্ত-এর সঙ্গে সংস্রবের ফলে আমাদের কানপুরের সব সাথীদের মনে সমাজবাদ সম্পর্কে ঝোঁক জেগেছিল।

স্বর্গত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর নেতৃত্বে কানপুর মজদুর সভা সম্পর্কে আমরা আগ্রহ দেখাতে শুরু করি। আমাদের সেই টানে বল যোগায় ভগৎ সিং। সমাজবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা ও তর্কবিতর্কাদি করার প্রেরণা সেই দেয়।

"ও (ভগৎ সিং) বলত, ইংরেজের অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তো আমাদের লড়াইয়ের প্রথম ধাপ মাত্র। শেষ লড়াই আমাদের লড়তে হবে শোষণের বিরুদ্ধে, তা সে শোষণ মানুষ মানুষকেই করুক বা এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকেই করুক। জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া এ লড়াই লড়া যায় না। সেই জন্যেই সম্ভাব্য সব উপায়ে জনসাধারণের আরও কাছাকাছি যাবার চেষ্টা আমাদের করে যাওয়া দরকার।...

"প্রচার ও জনসংযোগের ব্যাপারে এতো বড়ো ও সংগঠিত চেষ্টা ভগৎ সিং-এর আগে বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ করেননি। এমনকি ধরা পড়ার পর আদালতকে নিজের মতবাদ প্রচারের অবলম্বন হিসাবে কাজে লাগিয়েছিল ভগৎ-ই। শুধু ভালো যোদ্ধাই নয়, ভগৎ ছিল ভালো প্রচারকও।...

"লেখাপড়ায়ও বিশেষ অনুরাগ ছিল তার (ভগৎ-এর)। যখনই কানপুরে আসত, সঙ্গে দু'চারখানা বই তার থাকতই। পরে ফেরারী অবস্থায় যখন ওর সঙ্গে থাকার সুযোগ পাই, তখন দেখেছি, বই আর পিস্তল ছিল ওর চব্বিশ ঘন্টার সাথী। ওর সঙ্গে একখানা না একখানা বই দেখিনি এমন কোন সময়ের কথা আমার মনে পড়ে না।...

"সে সময়টায় সমাজবাদ ছিল যুগের ডাক। বিপ্লবীদের মধ্যে ভগৎ সিং-ই সর্বপ্রথম সেই ডাক শুনে চিনতে পারে। তার অন্যান্য সাথীদের চেয়ে এইখানটায় তার মহত্ত্ব।" ('শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা)।

দশেরার বোমাকাণ্ড ও ভগৎ সিং-এর গ্রেপ্তার :

১৯২৭ সালে, মাত্র ২০ বছর বয়সে ভগৎ সিং পুলিশের হাতে প্রথম গ্রেপ্তার হন। গবেষক G. S. Deol লিখেছেন, "সরকারী দপ্তরগুলি লাহোরের নওজওয়ান ভারতসভার কাজকর্ম ও সেই সংগঠনের অন্যতম নেতা ভগৎ সিং-এর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ম নজর রাখছিল। তারা একটা ওজর বা ছুতো খুঁজছিল ভগৎকে গ্রেপ্তার করার। সরকার দশেরার দিন লাহোরে বোমাকাণ্ডের, ঘটনার সুযোগ নিল।" ('Shaheed Bhagat Singh a biography', by G. S. Deol)

যশপাল লিখেছেন, "১৯২৭ সালে, লাহোরে, দশেরা উৎসবের উপলক্ষে একটি বোমাকাণ্ড ঘটে।..." G. S. Deol-ও লিখেছেন যে ঐ সময়টা ছিল ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাস। কিন্তু বীরেন্দ্র সিঁধু লিখেছেন, "১৯২৬ সালে লাহোরে এক দশেরার মেলায় কেউ বোমা ছুঁড়েছিল।..." ভগৎ সিং-এর নিজের লেখায় ('কেন আমি নাস্তিক') আছে, "১৯২৭ সালের মে মাসে লাহোরে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল।" এবং তিনি পুলিশের অভিযোগের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, পুলিশ সন্দেহ করছে ১৯২৬ সালের দশেরা উৎসবের সময় জনতার ভীড়ের মধ্যে এই বোমা ছোঁড়া হয়েছিল।

ঘটনার সময় সম্পর্কে এই ধরনের পার্থক্য থাকলেও ভগৎ সিং-এর নিজের লেখায় উল্লিখিত সময়টাকেই বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে মানা উচিত। ফলে লাহোরে দশেরা উৎসবের বোমাকাণ্ডের সময়কাল ১৯২৬-এর অক্টোবরের কাছাকাছি বলেই মেনে নেওয়া যেতে পারে।

যশপাল লিখেছেন, "লাহোরে ঐ সময়ে দশেরা উৎসবে বোমা ছোঁড়ার ঘটনাটা ছিল কিছু বিকৃত মস্তিস্ক লোকের দুষ্কর্ম। ঘন ভীড়ে বোমা ফাটায় বহু লোক জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। আমি সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আহতদের সেবা-শুশ্রুষা ও দেখাশুনার জন্য হাসপাতালে যেতাম। দশেরার উৎসবে হিন্দুদের সংখ্যাতো বেশি থাকবেই, এই সন্দেহ—বলে হিন্দুরা কল্পনা করছিল এটা হয়ত মুসলমানদের দ্বারা ঘটতে পারে।

"পুলিশ সন্দেহ বশত বেশ কিছু লোককে গ্রেপ্তার করেছিল। এতে দুরভিসন্ধিমূলক জড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগৎ সিং-সহ আমাদের কলেজের ছাত্র বাবু সিংকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ভগৎ সিংকে পুলিশ হেপাজতে রাখা হয় প্রায় দু'সপ্তাহ। ভগৎ সিং-এর উকিলের পক্ষ থেকে ভগৎকে আদালতে পেশ করার জন্য দাবী করা হয়। কিন্তু পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাই তৈরি করতে পারে না। আদালতে তাকে পেশ না করেই জামানতে ছেড়ে দেওয়া হল। জামানতের মূল্য ছিল ৪০,০০০ টাকা। এই মোটা টাকার জামিনের ফলে ভগৎকে নিজের ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হল। ভগৎ ঘর থেকে বার হযে যেখানেই যেত পুলিশের চর তাকে অনুসরণ করত। পুলিশের চোখে সে ধূলো দিতে পারত, কিন্তু এতে অযথা পুলিশের সন্দেহ আরও দৃঢ় হবে ভেবে ভগৎ ঐ ধরনের কোন কাজ করেনি।

"আমি ডাক্তার গোপীচন্দ্র ভার্গবের (পাঞ্জাব এসেম্বলীর তৎকালীন কংগ্রেস সদস্য, প্রখ্যাত ডাক্তার ও হিন্দু সংগঠনের সংস্থাপক) মাধ্যমে, ভগৎকে বিনা কারণে জামানতে রেখে হয়রাণ করার বিরুদ্ধে, প্রশ্ন তুলিয়ে, নোটিশ জারি করালাম। ডাক্তার সাহেবের সে সময় আমার ওপর পুরো বিশ্বাস ছিল। বিনা প্রশ্নেই তিনি এই নোটিশ দিয়েছিলেন। চিকিৎসা এবং কংগ্রেসের কাজে তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন যে রাত বারোটা একটা অবধি তাঁর ফুরসৎ মিলত না। এসেম্বলীতে প্রশ্নের নোটিশ দেওয়ায় কাজ হল। শেষে সরকার জামানত তুলে নিল। এরপর কিছুদিন ভগৎ সিং ভাল ছেলের মত ঘরে কাটাল। কিন্তু এরপর এমনই অন্তর্ধান করল যে ১৯২৯ সালে দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা ফেলা, প্রচার পত্র বিলি করা ও গ্রেপ্তার হবার প্রকাশ্য ঘটনার পরই একমাত্র তার অস্তিত্ব প্রকট হল।" ('সিংহাবলোকন', যশপাল)।

বীরেন্দ্র সিঁধু ও G. S. Deol-এর লেখা থেকে আর যেসব তথ্য জানা যায় তা হল, ভগৎ সিংকে গ্রেপ্তার করার মূল কারণ ছিল 'কাকোরী কেসে'র ফেরারী আসামী ও সে সম্পর্কে দলের অন্যান্য খবর সংগ্রহ করা। পুলিশের জেরার জবাবে ভগৎ দশেরা বোমাকাণ্ডের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁর ওপর মানসিক

ও শারীরিক নির্যাতন চালায়। ভগৎ-এর কাকীর (হরনাম কাউর) জবানবন্দীতে বীরেন্দ্র সিঁধু লিখেছেন যে, ভগৎ-এর মুখে গরম পাটের বস্তা চাপা দিয়ে, দম বন্ধ করে মারবার স্তরে নিয়ে যাবার মতন নির্যাতন চলত, যাতে, সে মৃত্যুভয়ে সব কিছু ফাঁস করে দেয়। কিন্তু, ভগৎ চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, সে অপরের কষ্টে প্রবলভাবে সাড়া দিত, কিন্তু নিজের ওপর ঘটে যাওয়া দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কিছু জানাত না। ভগৎকে গ্রেপ্তারের প্রথম অবস্থায় প্রায় একমাস লাহোর ফোর্ট জেলে রাখার পর বোর্স্টল জেলে পাঠান হয়। পুলিশ ভগৎ সম্পর্কে কোন মামলা বা কেস দাঁড় করাতে পারে না। আবার প্রায় ৬০,০০০ হাজার টাকার বিশাল মূল্যের জামিনও তুলে নিতে রাজী হয় না। মানসিক ও শারীরিক ভাবে ভগৎকে খতম করার এ ছিল এক ঘৃণ্য পরিকল্পনা। কিন্তু ভগৎ তাঁর মানসিক স্থৈর্য হারাননি কোন সময়। এইখানেই ছিল একজন সামান্য বিশ বছরের যুবকের বিপ্লবী চারিত্রিক শক্তির পরীক্ষা। সে কঠিন পরীক্ষায় ভগৎ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ঐতিহাসিক সাফল্যে। আর এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে সাহায্য করেছিল তাঁর অসাধারণ উন্নত স্তরের জ্ঞান, চিন্তাশক্তি এবং দেশের বিপ্লবের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। ব্যক্তি ভগৎকে নিরন্তর নিরলস জ্ঞানার্জন ও তার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে, সাচ্চা বিপ্লবী ভগৎ-এ উত্তীর্ণ করার প্রাথমিক সংগ্রামে এ ছিল অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর। ভগৎ সিং তাঁর নিজের লেখা 'কেন আমি নাস্তিক' পুস্তিকায় এই পশ্চাৎপটের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে :

"১৯২৭ সালের মে মাসে লাহোরে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল। এই গ্রেপ্তারটা ছিল এক অবাক করার মত ঘটনা। পুলিশ যে আমাকে খুঁজছে, বস্তুত, এ ঘটনা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। একটা বাগানের পথ ধরে যাবার সময়, হঠাৎই আমি দেখলাম পুলিশ আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আমার কাছে এটা আশ্চর্যের বিষয়, যে এই ঘটনায় আমি বিব্রত না হয়ে সে সময় অত্যন্ত ধীর স্থির ও শান্ত ছিলাম। এই ঘটনায় আমি সে সময় কোন চাঞ্চল্য অনুভব করিনি। কোনরকম উত্তেজিত হইনি। আমাকে পুলিশের জিম্মা করা হল। পরদিন রেল পুলিশের লক-আপে ঢোকান হল। সেখানে আমাকে পুরো একমাস কয়েদ রাখল। পুলিশ অফিসারদের দীর্ঘদিনের জেরার ফলে আমি অনুমাণ করলাম যে কাকোরী ডাকাতির দলের সঙ্গে এবং বিভিন্ন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্পর্কে পুলিশের কাছে কিছু তথ্য আছে। পুলিশ অফিসাররা জেরা প্রসঙ্গে বলল, যে কাকোরী মামলা চলার সময় আমি লাক্ষ্ণৌয়ে ছিলাম। কাকোরীর ঘটনার আসামীদের মুক্ত করার জন্য আমি কিছু পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম। বন্দীদের সম্মতি পাবার পর আমরা কিছু বোমা সংগ্রহ করেছিলাম। সেই সংগৃহীত বোমার ভাণ্ডার থেকে একটি বোমা ছোঁড়া হয়েছিল ১৯২৬ সালে দশেরা উৎসবের জনসমাবেশে, পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আমাকে প্রলুব্ধ করার জন্য পুলিশের লোকেরা আরও বলল যে, আমি যদি বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোকপাত করে একটা বিবৃতি দিই, তাহলে আর পুলিশ আমাকে জেলে রাখবে না। পরিবর্তে, তারা আমাকে এমনকি রাজসাক্ষী

না রেখেই, কয়েদ থেকে মুক্তি দেবে, পুরস্কারসহ। এ প্রস্তাব শুনে প্রাণ খুলে হাসলাম। প্রতারকের ছলনা—প্রস্তাব! ওরা জানে না যে, আমাদের মত বিপ্লবী চিন্তাধারার মানুষ, নিজেদের লোকের ওপর, আপন নির্দোষ মানুষজনের ওপর, কখনোই বোমা ছুঁড়তে পারে না। একদিনের এক সুপ্রভাতে গোয়েন্দা দপ্তর, সি. আই. ডি'র তৎকালীন এক উচ্চপদস্থ অফিসার, সিনিয়ার সুপারিনটেনডেন্ট, মিঃ নিউম্যান এলেন আমার কাছে। অনেক সহানুভূতিসূচক কথাবার্তা শেষে তিনি বললেন যে, তাঁর কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক খবর আছে যে পুলিশের দাবী অনুযায়ী আমি যদি বিবৃতি না দিই তাহলে পুলিশ বাধ্য হবে আমাকে কাকোরী ডাকাতি কেস, দশেরা মেলায় বোমা ফেলে নৃশংসভাবে মানুষ হত্যা ইত্যাদি দুষ্কর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করার মামলায়, আসামী হিসেবে দাঁড় করাতে। মিঃ নিউম্যান আমাকে আরও বললেন যে, তাদের হাতে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, যার মাধ্যমে আমাকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং পরিণতিস্বরূপ আমার ফাঁসি অবধারিত। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, সেই সময় আমি যতই নির্দোষ হই, পুলিশ ইচ্ছে করলে যা বলল তা অবশ্যই কার্যকরী করতে পারে। সেই দিন থেকে কিছু পুলিশ অফিসার আমাকে দুবেলা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার উপদেশ দিতে থাকে। কিন্তু না, তা সম্ভব নয়। আমি ততদিনে একজন স্থির সিদ্ধান্তকারী নাস্তিক। কাজেই এই অবস্থাটাই ছিল আমার কাছে উপযুক্ত পরীক্ষা দেবার সময়, যে, জেলের দুঃখ কষ্টের বাইরে স্বাভাবিক, শান্ত, আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলিতেই কি আমি নিজেকে নাস্তিক বলতে গর্ব অনুভব করি ; নাকি চরম বিপদের দিনে আসন্ন সম্ভাব্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমি স্থির, নিশ্চিত, নিশ্চলভাবে বলতে পারি, না আমি ভগবানে বিশ্বাসী নই, প্রার্থনায় বিশ্বাসী নই। আমি একজন স্থিরকল্প নাস্তিক। গম্ভীর বিচারান্তে আমি স্থিতপ্রাজ্ঞসুলভ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলাম। না, যে কোন অবস্থাই আসুক, আমি ভগবৎ বিশ্বাসী হব না। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আমি ভগবানে প্রার্থনা জানাতে বসব না। খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, না, আমি তা কখনোই করিনি। জেলের এই দিনগুলিই ছিল আমার উপযুক্ত পরীক্ষা দেবার সময় এবং আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, যে, আমি সে পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছি। ফাঁসির দড়ি থেকে গলা বাঁচাতে, আমি দুর্বলচিত্তে, কখনো কোন মুহূর্তেই নিজের চিন্তা, আদর্শ ও বিশ্বাসকে ধূলোয় মিশিয়ে দিইনি।…এই পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া কিন্তু সহজ কাজ নয়। মানুষের 'বিশ্বাস', তার আপাত দুঃখ, বেদনা কষ্টের লাঘব করে। ভগবানের প্রতি 'বিশ্বাস', মানুষের জীবনের, অনেক দুঃখ বেদনাকে মনোরম ও আনন্দমুখীও করে। ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে, আত্মনিবেদনের গভীর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, মানুষ তার অবলম্বন খুঁজে পায়। চরম দুঃখেই পরম সান্ত্বনা অনুভব করে। সচেতনভাবে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ত্যাগ করলে, মানুষকে তার নিজের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগের মাঝে, নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হয়ে, সম্পূর্ণ মানসিক শক্তি বিচারের ওপর দাঁড়ান ছেলেখেলা নয়। আর এইরকম কঠিন পরীক্ষার সামনে, মানুষের সমস্ত ঈশ্বর অবিশ্বাসী অহঙ্কার উবে যায়।

মানুষ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হবার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। যদি সে পারে তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হবে সেটা মানুষের অহঙ্কার নয় অন্য কোন মানসিক শক্তি আছে যার জোরে সে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।...”

জেলের নির্যাতন ও হয়রানির ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ভগৎ সিং-এর লেখা ১৯২৭ সালের একটি চিঠিতে। এই চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু অমর চন্দ্রকে, যিনি সে সময় আমেরিকাবাসী ছাত্র ছিলেন। চিঠিটি এইরকম :

“প্রিয় ভাই অমরচন্দ্রজী,

“নমস্তে,

“...তোমার চিঠি পড়েছি। সেই সূত্রেই এই চিঠি লিখছি।... কিন্তু কি লিখব? করম সিং বিলেত গেছে। তার ঠিকানা পাঠাব। সে লিখছে বিলেতে আইন পড়বে। কিন্তু কি করে চলবে সে আল্লাই জানে! খুব খরচ হচ্ছে!

“ভাই, আমাদের বিদেশে গিয়ে বিদ্যালাভের আশা খতম হয়ে গেছে। তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। যদি সুযোগ পাও তোমার ওখান থেকে কিছু ভাল ভাল বই পাঠাবার চেষ্টা কোর। আমেরিকার সাহিত্য তো বেশ উন্নত এবং সংখ্যায় প্রচুর। যাইহোক, এখন নিশ্চয়ই তোমার পডাশুনা নিয়ে বিশ্রীভাবে ফেঁসে আছ!

“সানফ্রান্সিস্‌কো ছাড়া অন্য কোথাও যদি আমার কাকা (বিপ্লবী) ‘সর্দারজী’র (অজিত সিং-এর) কোন খবর পাও, তার চেষ্টা কোর। তিনি বেঁচে আছেন কিনা কম্‌-সে-কম্‌ সে খবরটুকু তো তাহলে পাওয়া যায়। আমি এখন লাহোরের দিকে রওনা হচ্ছি। সুযোগমত চিঠি দেবার চেষ্টা কোর। ঠিকানা, লাহোরের মাণ্ডিই রেখো। আর কি লিখব? লিখবার মত কিছু নেই। ভালই আছি। বারকয়েক অযথা হযবানির শিকার হতে হল। শেষে ওরা কেস তুলে নিল। কিন্তু গ্রেপ্তার করে রাখল। ৬০,০০০ টাকার জামানত দিতে হল, তবে রেহাই মিলল। আজ অবধি পুলিশ আমার বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমা দাঁড় করাতে পারেনি। একমাত্র আল্লা না চাইলে ওরা আমার বিরুদ্ধে কোন কেস দাঁড় করাতে পারবে না! আজ প্রায় এক বছর হতে চলল, কিন্তু ওরা জামানত তুলছে না। আল্লার যেমন মর্জি! (লেখার এই অংশটা পেন দিয়ে কাটা)। খামোখা আমাকে ওরা হয়রানি করছে। যাই হোক ভাই, ভাল করে মন দিয়ে পড়াশুনা কর।

“তোমার অনুগত,

“ভগৎ সিং

“নিজের সম্পর্কে আর কত লিখব। খামোখা সন্দেহের শিকার হতে হল। আমার চিঠি-পত্রের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। ডাক আটকে দিচ্ছে। চিঠি খুলে পড়ছে। জানি না আর কতদিন ওরা আমাকে এমন সম্মানীয় সন্দেহের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু ভাই, যাই হোক, আমার বিশ্বাস সবশেষে যা সত্য, তা সত্য বলেই প্রকাশ পাবে এবং সত্যের জয় হবেই।”

১৯২৭ সালে দশেরা বোমাকাণ্ডের সূত্রে ভগৎ সিং-এর গ্রেপ্তার ও তাঁকে নির্দয়ভাবে

হাতে-পায়ে লোহার চেইন দিয়ে দড়ির খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে রাখার প্রামাণ্য ফটো ছেপেছেন যশপাল, তাঁর 'সিংহাবলোকন' গ্রন্থে। লাহোর ফোর্ট জেলে অপর কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের মুহূর্তে তোলা, সেটা ক্যামেরার ছবি। যাতে মাথায় সাহেবী টুপি পরিহিত চেনা ছবির পরিবর্তে অচেনা শিখবেশী ভগৎকে চেনা যায়।

ঘটনাক্রমে ১৯২৭ সালের সঙ্কটময় সময়ে ভগৎ সিং-এর বাবা কিষেণ সিং-এর অতিথি হিসেবে তাঁর গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন কয়েকজন ইংরেজ। ঐ এলাকায় শিকারের উপলক্ষে। কিষেণ সিংকে তাঁরা বলেন, বিপ্লবী অজিত সিং-এর ভাইপো হিসেবে এবং লাহোরের কিছু কিছু রাজনৈতিক কার্যকলাপের সূত্রে, ইংরেজ সরকার, তাঁর ছেলে ভগৎ সিং-এর প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখছে। তারা কিষেণ সিংকে তাঁর ছেলের প্রতি নজর রাখার হুঁশিয়ারী দিয়ে যান। বাবা কিষেণ সিং এবার ছেলেকে ব্যবসার প্রতি মন বসাবার ব্যবস্থায় নামেন। তিনি ভগৎকে ডেয়ারী ফার্মের ব্যবসায় নিযুক্ত করেন।

বীরেন্দ্র সিঁধু তাঁর 'অমর শহীদ ভগৎ সিং' (হিন্দী) গ্রন্থে এই সময়কার ঘটনাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন :

"ভগৎ সিং এখন জেলের বাইরে, কিন্তু তবু তিনি পুরোপুরি মুক্তি পাননি। ভগৎ সর্বদা এটা মনে রাখতেন যে যাঁরা ৬০,০০০ হাজার টাকার জামিনদার হয়ে (ব্যারিস্টার দুনীচাঁদ এবং দৌলতরাম) তাঁকে মুক্ত করেছেন, তাঁদের প্রতি, তাঁর বিরাট দায়িত্ব আছে। ভগৎকে এটা খেয়াল রাখতে হোত যাতে তাঁর জামিনদাররা কোন বিপদে না পড়েন। ভগৎ-এর বাবা কিষেণ সিং, লাহোরের কাছে খাসরিয়া গ্রামে, ভগৎ সিং-এর পরিচালনায় একটা ডেয়ারী ফার্মের পরিকল্পনা বানান। ভগৎ সিং-ও আগ্রহসহকারে এই কাজে নেমে পড়েন। বাবার সঙ্গে গিয়ে তিনি ডেয়ারীর জন্য গরু-মহিষ কেনা এবং ডেয়ারীর কাজকর্ম দেখবহাল করার কাজ শুরু করেন।

"ভগৎ প্রতিদিন ভোর চারটেয় উঠে, গরুর দুধ দোয়ান, টাঙ্গা করে দুধের পাত্র নিয়ে গিয়ে লাহোর শহরে সরবরাহ করা এবং হিসাবের খাতা-পত্র ঠিক-ঠাক রাখার সব কাজ সামলাতেন।...কিন্তু ডেয়ারীর কাজে যোগ দেবার অর্থ এই নয় যে ভগৎ তাঁর জীবনের মূল কাজ, মূল স্বপ্ন, বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। বিপ্লবই ছিল ভগৎ-এর প্রাণ, আর তাঁর প্রাণই ছিল বিপ্লবী। দুধের আড্ডা, ডেয়ারী ফার্ম, দিনে থাকত ডেয়ারী। রাতে সেটা বিপ্লবীদের আড্ডা, ধর্মশালা বনে যেত। এই বিপ্লবী ডেরার জন্য ভগৎ একটা বড় কড়াই আর স্টোভ কিনে রেখেছিলেন। বিপ্লবী সাথীদের এখান থেকে মিলত গরম দুধ আর তার সঙ্গে তৈরি হোত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা।...

"যতদিন জামানতের বিষয়টা চালু ছিল, ততদিন ভগৎ ডেয়ারীর কাজ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে, পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠাতেন। এগুলি ছিল বৈপ্লবিক বিষয় সম্পর্কিত। ভগৎ-এর তৈরি প্রবন্ধগুলি ছিল হিন্দী, উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা। অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'কীর্তি' নামে পাঞ্জাবী পত্রিকা এবং 'অকালী' নামে উর্দু পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত।...

"জামানতের বিষয়টি উঠে যেতেই মুক্ত ভগৎ সিং-এর মন ডেয়ারী ফার্ম থেকে ছুটি নিয়ে নেয়। খদ্দেরের দুধ মেলাও বন্ধ, আর তারই সঙ্গে ধীরে ধীরে ডেয়ারী ফার্মও খতম। এখন বন্দীদশা থেকে সদ্যমুক্ত ভগৎ সিং বিপ্লবের কাজে পূর্ণাহুতি দেবার কাজে ফের ঝাঁপিয়ে পড়লেন।"

কাকোরী মামলা ও তাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও পুলিশী সন্ত্রাসের ফলে, সাময়িকভাবে দলের কাজে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, ভগৎ সিং-এর উদ্যোগে এবং অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবী সংগঠক ও নেতাদের কঠোর পরিশ্রমে, ১৯২৭ সালের শেষ পর্বে দল ফের সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠল।

তৎকালীন বাংলার ইংরেজ পুলিশী গুপ্তচর দপ্তরের অন্যতম প্রধান, Special Superintendent, Mr. R. E. A. Ray তার এই সময়কার (অক্টোবর, ১৯২৭) গোপন রিপোর্টের উপসংহারে, দলের এই নবউত্থান সম্পর্কে তাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এইভাবে:

"...এই সময়কার দলীয় কাজকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসনে'র বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রভাব। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে এই দলের যুক্ত প্রদেশ শাখার কুড়ি জন সদস্যের শাস্তি হওয়া সত্ত্বেও এদের সংগঠন যুক্ত প্রদেশ-সহ অন্যান্য প্রদেশে কোনভাবেই পঙ্গু হয়ে যায়নি। বরং দেখা যাচ্ছে এই দলটা পুনরায় আঘাত হানার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে আমাদের আসল বিপদ আসতে পারে এই দলটার কাজ কর্মের মধ্য দিয়েই।"

('Terrorism in Bengal', Vol-I, Page- 570)

নতুন দল গঠনে ভগৎ সিং-এর ভূমিকা :

১৯২৭-২৮ সাল, এমন একটা সময়, যখন ভারতীয় রাজনীতির সাময়িক স্থিতাবস্থার দ্রুত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তীব্র অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত শ্রমিক শ্রেণী, সংগঠিত ক্ষেত্র, যেমন—বস্ত্রশিল্প, রেলশিল্প ইত্যাদিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন। রাজনৈতিক অধিকার তথা শাসন-সংস্কার ইত্যাদির দাবীতে আপসবাদী, সংস্কারমুখী রাজনৈতিক আন্দোলনও দানা বাঁধতে থাকে। এরই পাশাপাশি আপসবিরোধী বৈপ্লবিক চিন্তা-সমৃদ্ধ, নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নেন, ভগৎ সিং তাঁদের অন্যতম।

শিব বর্মা পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলের কিছু অংশের রাজনৈতিক কর্মীদের, নিরলস অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে, আধুনিক সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাদের সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের আকুতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "...এরই ফলে ১৯২৮ সালের শুরু থেকেই এরা সন্ত্রাসবাদ বর্জন করে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও আদর্শকেই গ্রহণ করেন তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে।" ('Selected writings of Shaheed Bhagat Singh')।

শিববর্মা অবশ্য সঠিকভাবেই বলেছেন যে, এর অর্থ অবশ্য এমন নয় যে ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীরা তাদের এই নতুন চিন্তা ও আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে তখনই মার্কসবাদী দর্শনকে সামগ্রিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। বাস্তবের সীমাবদ্ধতায় এই প্রক্রিয়া সেই সময় সবে শুরু হয় এবং ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদের নির্দিষ্ট প্রয়োগ ও তার সজীব বিকাশ ঘটে অনেক পরে। কিন্তু সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ।

পরবর্তীকালের ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, কমরেড অজয় ঘোষ, সেই সময় ছিলেন ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, সাথী বিপ্লবী। সেই সময়ের ভগৎ সিং সম্পর্কে পরিচয় দিয়েছেন তিনি এইভাবে :

"১৯২৮ সালের একদিন, আমি হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম, একটি যুবক সোজা আমার ঘরে এসে ঢুকল এবং আমাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। সেই যুবকটিই ছিল ভগৎ সিং। কিন্তু, এই ভগৎ, সেই দু'বছর আগের, আমার পরিচিত ভগৎ নয়। দীর্ঘদেহী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল চোখ, বিচক্ষণ চেহারার এক সম্পূর্ণ ভিন্ন, নতুন ভগৎ সিং। যখন কথাবার্তা শুরু হল, তখন আমি অবাক হয়ে উপলব্ধি করলাম, ভগৎ কেবল বয়সেই বেড়েছে তাই নয় ; চিন্তা, চেতনায়ও সে অনেক বেড়েছে, অনেক উন্নত হয়েছে।

"ভগৎও তখন কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম পলাতক আসামী চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যতম নেতা। ভগৎ আমার সঙ্গে দলের নতুন কর্মসূচী ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করল।...

"সেই সময় এবং পরবর্তীকালে যারাই ভগৎ সিং-এর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই প্রমাণ পেয়েছেন ভগৎ-এর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার এবং আলোচনাকে কেন্দ্র করে মানুষের ওপর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করার আশ্চর্য ক্ষমতার। এমন নয় যে ভগৎ ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ বক্তা। কিন্তু তিনি যখন কথা বলতেন বা আলোচনা করতেন, তখন তাঁর কথার মধ্যে এমন শক্তি, আবেগ, আন্তরিকতা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষত্ব থাকত, যা মানুষকে দারুণভাবে নাড়া দিত এবং প্রভাবিত করত। আমরা দুজনে সারারাত আলোচনা করে কাটালাম। ভোরের সূর্য ওঠার সময়, যখন দুজনে বাইরে পায়চারী করতে বার হলাম, তখন মনে হল, আমাদের দলেও নতুন সূর্য, নতুন উষার শুভাগমন হতে চলেছে। এই কথা ভেবে, নিজের মধ্যে আনন্দ গুঞ্জরিত হল, হ্যাঁ, এখন আমরা জানি, কি আমরা চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানি, সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার রাস্তা কি।

"সেই সময়কার, সমাজতন্ত্রের ধারণা ছিল, সময়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তৎকালীন, জাতীয় নেতাদের ওপর, আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তাদের সংস্কারবাদী, আপসমুখী, স্লোগান সর্বস্ব রাজনীতিতে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ। আমরা সেইরকম বিপ্লবী দল ও কর্মীই তৈরি করতে চেয়েছিলাম যারা তাদের আত্মাহুতির মাধ্যমে, আত্মবলিদানের মাধ্যমে, সারা দেশে নবোত্থান আনবে। গড়ে উঠবে নতুন দল, নতুন বিপ্লবী নেতৃত্ব। সমাজতন্ত্রই তখন আমাদের সকলের লক্ষ্য। ঐ আদর্শেই আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনোত্তর

কালে দেশের সমাজকে নতুনভাবে গড়তে।" ('Bhagat Singh and his Comrades', by Ajoy Ghosh)।

নতুন দল গড়ে ওঠার পশ্চাৎপট ও ভগৎ সিং-সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ভগৎ সিং-এর সেই সময়কার ঘনিষ্ঠ সাথী কমরেড শিব বর্মা। তাঁর লেখায় আছে এই সময়কার পশ্চাৎপট :

"ইতিমধ্যে, কানপুর গ্রুপ, পলাতক চন্দ্রশেখর আজাদ ও কুন্দনলালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এদের দুজনের নামেই ছিল কাকোরী মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।" (Selected writings···)।

শিব বর্মা তখন কলেজের ছাত্র। গোপন বিপ্লবী দলের একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠক। দলীয় সূত্রে খবর পেয়ে, কানপুরে রাধামোহন গোকুলজীর বাড়িতে আত্মগোপন করে অপেক্ষারত বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে অতি গোপনে, অতি সতর্কতায তিনি যোগাযোগ করেন। উদ্দেশ্য, দলের কাজকর্ম সম্পর্কে আজাদের মতামত ও নির্দেশ জানা। আজাদের সঙ্গে আলোচনার কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর দুজন সাথী, বিজয় সিন্‌হা ও সুরেন্দ্র পাণ্ডে এসে গেল। "বিজয়ের রিপোর্ট শোনার পর আজাদ কথার আরম্ভে চারটি বিষয়ের উপর নজর দিতে বলে—পুরানো সহকর্মী এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা, সংগঠন গড়ে তোলা, পূর্বে সংগ্রহ করা অস্ত্রাদি যাদের কাছে গচ্ছিত আছে তা জানবার চেষ্টা করা, নতুন অস্ত্রাদি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা এবং বাঙলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। সে গুরুত্বের সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দিল আমরা যেন ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে কোন কাজ না করে ফেলি।···" ('শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা)।

শিব বর্মা পরবর্তীকালে লিখেছেন, "এই পশ্চাৎপটে ভগৎ সিং ১৯২৮ সালের গোড়া থেকেই সারা দেশের বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপগুলিকে একত্রিত করে সারা ভারত ব্যাপী নতুন চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার উদ্যোগ নেন। ভগৎ সিং-এর এ সম্পর্কে প্রস্তাব ছিল, (ক) এটাই উপযুক্ত সময়, যখন বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করা দরকার যে, সমাজতন্ত্রই আমাদের দলের চরম লক্ষ্য ; (খ) আমাদের দলের নামও এই অনুসারে পালটান প্রয়োজন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে আমদের মূল লক্ষ্য কি ; (গ) আমাদের কেবলমাত্র সেইসব 'অ্যাকসন'-এই হাত দেওয়া উচিত, যেগুলির সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ দাবী এবং ভাবাবেগ জড়িত, এ ছাড়া সামান্য পুলিশ অফিসার বা পুলিশী চরদের খতম করার মধ্য দিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয় ; (ঘ) অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও একমাত্র সরকারী অর্থভাণ্ডারেই হাত দেওয়া উচিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর অ্যাকসন, যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই উচিত ; (ঙ) ব্যক্তি নেতৃত্বের পরিবর্তে সমষ্টিগত যৌথ নেতৃত্বের দ্বারাই দল পরিচালিত হওয়া দরকার। এইসব বিষয়ের ওপর, ভগৎ লাহোর ও কানপুরের সাথীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এছাড়া, তিনি দলের অন্যতম নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ ও অপর পলাতক আসামী কুন্দনলালেরও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি সংগ্রহ করে রাখেন। এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার পর, সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয় যে, দিল্লীতে পরবর্তী সভায়, সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের ডাকা হবে এবং সভা হবে ১৯২৮ সালের ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর। পাঁচটা প্রদেশের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান হয়। এর মধ্যে চারটে প্রদেশ দিল্লীর সভায় যোগ দিতে সম্মত হয়। বাংলা, এই সভায় যোগ দিতে চায় না।··· ফলে, দিল্লীর সভা অনুষ্ঠিত হয় বাংলার প্রতিনিধিদের ছাড়াই। সব-সমেত চারটি প্রদেশের দশজন কমরেড, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলায় জমায়েত হন। প্রতিনিধিদের প্রদেশ ভিত্তিক উপস্থিতি ছিল, পাঞ্জাব থেকে দুজন, বিহার থেকে দুজন, রাজস্থান থেকে একজন এবং যুক্ত প্রদেশ থেকে পাঁচজন। যুক্ত প্রদেশের পাঁচজনের মধ্যে আবার দুজন তাদের শর্তপূরণ না হওয়ায় সভায় অংশ নিতে অস্বীকার করে। ফলে, সর্বমোট আটজন ঐ সভার আলোচনায় অংশ নেন। চন্দ্রশেখর আজাদকে তার নিরাপত্তার স্বার্থেই দিল্লীর সভায় হাজির থাকতে নিষেধ করা হয়। দু'দিনের দীর্ঘ আলোচনা শেষে সভায় পেশ করা ভগৎ সিং-এর প্রস্তাবগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে (৬-২ ভোট) গৃহীত হয়। বিহারের দুই প্রতিনিধি ফনীন্দ্রনাথ ঘোষ ও মনমোহন ব্যানার্জী, দলের নাম পাল্টানর প্রস্তাব ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণের প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন।" ('Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh', Shiv Verma)

বাংলার বিপ্লবীদের যে অংশটির সঙ্গে শিব বর্মা যোগাযোগ করেন, তাঁরা ছিলেন, 'অনুশীলন' দলের একটি অংশ মাত্র। সে সময় তাঁরা দিল্লীর সভায় যোগদানের ব্যাপারে যেসব শর্তের কথা তোলেন, সেটা ছিল ভগৎ সিং-দের নতুন দলের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই, শিব বর্মার পক্ষে এই গোষ্ঠীর শর্ত মানা সম্ভব হয়নি এবং বাংলার প্রতিনিধিরাও দিল্লীর সভায় যোগ দেননি। পরবর্তীকালে ১৯২৮ সালে কলকাতার সাক্ষাৎকারে অবশ্য 'অনুশীলন' দলের অন্যতম নেতা ত্রৈলোক্য মহারাজ, প্রতুল গাঙ্গুলী মহাশয়রা ভগৎ সিং-এর কাছে এ ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা বিপ্লবী যতীন দাসকে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠান। যতীন দাস হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েসন ও আর্মির (H. S. R. A) একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার দায়িত্ব পালন করেন। যতীন দাস H. S. R. Army'র সৈনিকদের আধুনিক কায়দায় বোমা বানাবার কলা-কৌশল শিখিয়ে দলের অস্ত্রভাণ্ডারকে শক্তিশালী করেন।

যশপালের রচনা থেকেও এই সময়কার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে :

"ভগৎ সিং, সুখদেব, বিজয় সিন্‌হা, আর শিব বর্মা এদেরই উদ্যোগে উত্তর ভারতের বিপ্লবী প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকের পরিকল্পনা করা হয়েছিল দিল্লীতে। এই বৈঠক ৮ এবং ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখে, ফিরোজশাহ কেল্লার ভাঙাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখন এই ভগ্ন কেল্লার অস্তিত্ব বাহাদুর শাহ মার্গের বিশাল বিশাল অট্টালিকার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই বৈঠকে পাঞ্জাব থেকে ভগৎ সিং ও সুখদেব, রাজপুতনা থেকে কুন্দনলাল, যুক্ত প্রদেশ থেকে শিব বর্মা, ব্রহ্মদত্ত মিশ্র, জয়দেব কাপুর, বিজয়কুমার সিন্‌হা, সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে আর বিহার থেকে ফনীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং মনমোহন ব্যানার্জী

এসেছিলেন। চন্দ্রশেখর আজাদ এই বৈঠকে আসেননি। ভগৎ সিং এবং শিব বর্মা, পূর্বেই আজাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছিল। আজাদ তাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে, বৈঠকের বহুমত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে যা সিদ্ধান্ত হবে সে তাই মেনে নেবে। বাংলা থেকে কোন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দিতে আসেনি। শিব বর্মা নিজে কোলকাতায় গিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে কথা বলে এসেছিল।" ('সিংহাবলোকন')।

"দিল্লীর সভার নেতৃত্ব করে ভগৎ সিং-ই। তাঁরই পরামর্শে, সমাজবাদ, দলের ঘোষিত লক্ষ্য বলে স্বীকৃত হয়। দলের হিন্দুস্থান প্রজাতন্ত্র সংঘ নাম বদলে 'হিন্দুস্থান সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র সংঘ' করে দেওয়া হয়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, মার্কসবাদ বা সমাজবাদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সব দিক আমরা ভালোভাবে বুঝে ফেলেছিলাম। সমাজবাদের দিকে এগোনোর সেই আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। সমাজের শ্রেণীভিত্তি আমরা বুঝেছিলাম, চাষী-মজুরের রাজত্ব, আমাদের লক্ষ্য হয়েছিল বটে, তবে চাষী-মজুরের সংগঠিত শক্তির সহায়তায়, সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তি কেমন করে ঘটবে, সে কথাটা ভালো করে বুঝতে পারিনি।···

"দলের সেনাপতি নির্বাচনের প্রথাও গ্রহণ করা হয়। চন্দ্রশেখর আজাদ হয় আমাদের প্রথম নির্বাচিত সেনাপতি। সভায় আজাদ যোগ দিতে পারেনি। ভগৎ সিংও বিজয়কুমার সিন্‌হা অবশ্য আগেই তার সঙ্গে দেখা করে সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিল। সে-ও ওদের সমস্ত মতে সায় দেয়।" ('শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা)।

এই নয়া দল গঠনের পরিকল্পনায়, পাঞ্জাবের পুরোনো সংগঠক, জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, অথবা যুক্ত প্রদেশের জে-এন সান্যালদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। যশপাল লিখেছেন, যে, জয়চন্দ্রজীদের সঙ্গে, এর পর, আর কোন দলীয় সম্পর্ক ছিল না। ভগবতীচরণ ভোরা সম্পর্কে যে সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল, তাও কেটে গিয়েছিল। এই সময়, নওজওয়ান ভারতসভার কাজ সামলাত, ভগবতীভাই, রামচন্দ্র কাপুর, ধন্বন্তরী, এহসান-ইলাহী-রা। 'মীরাট কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র' মামলার ফলে, ভগবতীভাই অবশ্য প্রায়ই আত্মগোপন করে থাকতেন। কারণ, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভগবতীভাই-এর ছিল বহু পুরানো সম্পর্ক।

নতুন দলে, যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করার গণতন্ত্রীকরণের ফলে, সাত সদস্যের এক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ভগৎ সিং এবং বিজয়কুমার সিন্‌হার ওপর সারা ভারতে আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও দলের প্রচারের দায়িত্ব বর্তায়। সুখদেবের ওপর পাঞ্জাব, ফণীন্দ্র ঘোষের ওপর বিহার, কুন্দনলালের ওপর রাজস্থান এবং শিব বর্মার ওপর যুক্ত প্রদেশের সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। চন্দ্রশেখর আজাদকে করা হয় হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়ক, কমান্ডার-ইন-চীফ, সেনাপতি।

চুল-দাড়ি মুক্ত ভগৎ সিং :

একদিকে, কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার হয়ে, পুলিশের চোখে, ভগৎ সিং-এর চেহারাটা ছিল অতি পরিচিত। চুলদাড়ি-সহ একজন শিখ যুবকের চেনা চেহারা ছিল সেটা। দলের দায়িত্ব

নিয়ে, এবার অতি গোপনে, সারা ভারত জুড়ে সংগঠনের কাজে যাতায়াত করতে হবে। দলের আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের দায়িত্ব সাথী বিজয়ের সঙ্গে, ভগৎ সিং-এর ওপর। এর ওপর এসে গেল, দলের আর্থিক সংকট মোচনে, লাহোরে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে রাজনৈতিক অ্যাকসনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা। চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে, অ্যাকসনের জন্য দলীয় বাহিনী তৈরি। এসে গেছে শিবরাম হরি রাজগুরু (শহীদ হন), কুন্দনলাল, কৈলাসপতি, মহাবীর সিং (আন্দামান জেলে শহীদ হন)। জয়গোপাল-সহ ভগৎ-ও তৈরি। ১৯২৮ সালের এমনি একটা সময়ে, দলের সিদ্ধান্ত হল, ভগৎ চুল দাড়ি কেটে, সাহেবী হ্যাট-কোট পরুক। দলের কাজে, তার বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতে সে ক্ষেত্রে, চট করে পুলিশের নজর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। সিদ্ধান্ত মত, ভগৎ ফিরোজপুর গিয়ে, চুল-দাড়ি কাটিয়ে, শিখ চেহারার বদলে, সাধারণ সাজ-পোশাকের মানুষে রূপান্তরিত হলেন। হ্যাট বা টুপি পরিহিত ভগৎ-এর যে ছবি সারা ভারতে অতি পরিচিত তার পশ্চাৎপট হচ্ছে এটা।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অ্যাকসন অবশ্য পরে পরিত্যক্ত হয়। পরিকল্পনা মাফিক, ভগৎ সিং ও মহাবীর সিং ট্যাক্সী নিয়ে ব্যাঙ্কে সময়মত পৌঁছতে না পারার দরুন, চন্দ্রশেখর আজাদ তাঁর সবকিছু নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা সত্ত্বেও, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন। অ্যাকসন কর্মসূচী বাতিল করে দেন।

সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন ও ভগৎ সিং :

ভারতের মানুষ, শাসন সংস্কার ও তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের যোগ্য হয়ে উঠেছে কিনা, তার তদন্ত করে বৃটিশ রাজদরবারে একতরফাভাবে রিপোর্ট দেবার জন্য, বিলেত থেকে, সাত বৃটিশ সদস্যের এক কমিশন এল ভারতে। উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী, স্যার জন সাইমন হলেন কমিশনের সভাপতি। সেই সূত্রে এর নাম হল, 'সাইমন কমশন'। আসলে, বিশের দশক থেকে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ও আপসবাদী সংস্কারমুখী জাতীয় নেতাদের বিক্ষোভ-হতাশার প্রকাশ, সব মিলিয়ে, ভারতীয় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। এই অবস্থার মোকাবিলার দুরভিসন্ধিতেই এই সাইমন কমিশন। যার উদ্দেশ্য, মানুষের চোখে ধূলো দেওয়া এবং জাতীয় স্তরে দেশবাসীকে অপমান করা। দলমত নির্বিশেষে, সকলেই এই সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সাইমন কমিশন বিরোধী ইশ্‌তেহারে ভারতের সব কয়টি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেন। সারা ভারতজুড়ে, সাইমন কমিশন বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। ভারতীয়দের বাদ দিয়ে, বিদেশী শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে, তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ যোগ দিতে এগিয়ে আসেন।

১৯২৮ সালের ফ্রেব্রুয়ারীতে, সাইমন কমিশনের সদস্যরা বোম্বাই (বর্তমান মুম্বই)

শহরে পা দিলেই, সারাদেশে হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে, কমিশনের সদস্যদের যোগ্য সম্বর্ধনা জানান হয়! লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী সাধারণ মানুষ 'go-back Simon' ধ্বনি দিয়ে বোম্বাই শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়।

শিব বর্মা লিখছেন, "আমরা ঠিক করলাম, উত্তর ভারতে সাইমন কমিশনের পিছু নেব। কমিশন যখন দিল্লীতে এল, তখন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও জয়দেব কাপুর, কমিশন-এর কাছাকাছি পৌঁছবার জন্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও, তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না। এই সাথীদের কাছে তখন পিস্তল ও রিভলবার ছিল। দিল্লীর এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, সাফল্যের জন্যে বোমার ব্যবস্থা করা দরকার।" ('শহীদ স্মৃতি')।

যশপাল বর্ণনা দিয়েছেন পরবর্তী ঘটনাবলীর: "আমাদের সামনে যোজনা, পরিকল্পনাতো অনেক কিছুই ছিল। (১৯২৮ সাল) সাইমন কমিশন তখন ভারতে এসে গেছে। দিল্লীতে, দলের কেন্দ্রীয় সমিতির বৈঠকে, ভগৎ সিং প্রস্তাব দিয়েছিল যে, ভারতের প্রজা সাধারণের প্রতি চরম অপমানের প্রতিবাদে এবং তাদের অসন্তোষের ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে, এই সাইমন কমিশনের ওপর বোমা ফেলা হোক। দলে সিদ্ধান্ত হলেও, অর্থের অভাবে এসব পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।···

"দলের পক্ষ থেকে, লাহোরের নওজওয়ান ভারতসভাকে এই নির্দেশ দেওয়া হল যে, শহরে সাইমন কমিশনের সদস্যরা এলেই যেন, যতদূর সম্ভব সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রিত করে, বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসের, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাদের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও কমিশনে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এদিকে, নওজওয়ান ভারতসভার বক্তব্য ও স্লোগান ছিল, 'ইংরেজ সরকারের আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করার কোন অধিকার নেই। ওরা কমিশন পাঠাবার কে?'···লাহোরে, বাস্তবে সাইমন কমিশন-কে ভাগাবার জন্য, আন্দোলন ও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজনের সবটাই, নওজওয়ান ভারতসভা-র কাঁধে এসে পড়েছিল।

"নওজওয়ানরা, বৃদ্ধ পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়কে, বিক্ষোভ মিছিলের ভীড়ের ধাক্কা থেকে আর রোদের হাত থেকে বাঁচিয়ে, মাথায় ছাতা ধরে স্টেশন অবধি নিয়ে এল। জমায়েতের সামনে, মূলত নওজওয়ান ভারতসভা-র লোকেরাই ছিল। তারা, পুলিশের নিষেধ ও ধমক অগ্রাহ্য করল। কমিশনকে রাস্তা ছেড়ে দিতে রাজী হল না। এরা, কমিশনকে কালো পতাকা দেখাতে এবং 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি শোনাতে বদ্ধপরিকর ছিল। এবার পুলিশ লাঠি চার্জ করল। নওজওয়ান ভারতসভা-র লোকেরা, জনতা যাতে পিছু না হটে যায়, তার চেষ্টা করতে থাকল। তারা পুলিশের লাঠির ঘা খেতে থাকল। জমায়েতের মানুষের মধ্যে, এ দৃশ্যের প্রভাবে, বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা উৎপন্ন করার সুযোগকে তারা কাজে লাগাল, নিজেরা আহত হয়ে। লাঞ্ছিত হয়ে।

"লালা লাজপত রায়ের পেছনে, এমন ঠাসা ভীড় ছিল যে, তাঁর পক্ষে, পিছিয়ে আসার কোন সুযোগ ছিল না। সামনে থেকে পুলিশের লাঠি চার্জ চলছে। নওজওয়ান ভারতসভা-র যুবকরা, লালাজীকে চারধার থেকে ঘিরে রেখে, তাঁর ওপর লাঠির ঘা যাতে না পড়ে, তার ব্যবস্থা করেছে। পুলিশের লাঠির ঘা খেয়েও, এই যুবকদের বেষ্টনী ভাঙ্গেনি। এই বেষ্টনীর মধ্যে আমি (যশপাল), ভগবতীচরণ ভোরা আর সুখদেবও ছিলাম। সাথী ধন্বন্তরী এবং এহ্সান-ইলাহীরাও জমায়েতের মধ্যেই ছিল। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ সুপার স্কট। লালাজীকে ঘিরে রাখা যুবকদের বেষ্টনী ভাঙছে না দেখে, সে ঐ বেষ্টনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিল পুলিশকে। ডেপুটি সুপার সান্ডার্স, নিজের হাতে লাঠি নিয়ে, পুলিশ-সহ আক্রমণ করল, লালাজীকে ঘিরে রাখা জমায়েতের ওপর। সান্ডার্সের লাঠির ঘায়ে লালাজীর মাথায় ধরে থাকা ছাতা ফেটে গেল। মাথায়, কাঁধে, লাঠির ঘায়ে জখম হলেন বৃদ্ধ লালা লাজপত রায়।

"নওজওয়ান ভারতসভার সাথীরা তা সত্ত্বেও জমায়েত থেকে হটে আসতে চাইছিল না। কিন্তু, চোট খাবার পর লালাজী হুকুম দিলেন, 'পুলিশের এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন স্থগিত রাখা হোক।'

"ঐদিন (১৯২৮ সালের ৩০শে অক্টোবর) সন্ধ্যায়, লাহোরের 'মৌরি দরওয়াজা'র বাইরে, ময়দানে, কংগ্রেসের ডাকা সাইমন কমিশন বিরোধী এক জনসভা ডাকা হয়েছিল। লালা লাজপত রায় (লাঠির আঘাতে চোট পাওয়া সত্ত্বেও) ঐ সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।...

"মৌরি দরওয়াজা'র বিশাল জনসভায়, আমি (যশপাল) আর সুখদেবও ভীড়ের পেছনে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। ...লালাজী তাঁর তেজস্বিতাপূর্ণ বক্তৃতায়, সকালের পুলিশী লাঠি চার্জের ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'যে সরকার নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশের ওপর এমন নৃশংস হামলা করতে পারে, তাকে ভদ্র সরকার বলা যায় না। আর এই অসভ্য সরকারের টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। আমি আজ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, যে, এই অসভ্য বর্বর সরকারের পুলিশ, যারা আজ আমার ওপর হামলা করেছে, সেই পুলিশ-সহ এই সরকার, একদিন ধ্বংস হবেই।

"ইংরেজ পুলিশ অফিসারের দিকে লক্ষ্য করে লালাজী এবার ইংরাজীতে বললেন, 'I declare that the blows struck at me will be the last nails in the Coffin of the British rule in India.'...

"১৭ই নভেম্বর, ১৯২৮ তারিখে, লালাজীর মৃত্যু হল। জনতার মধ্যে বিদেশী শাসন বিরোধী ভাবনা এবং লালাজীর প্রতি শ্রদ্ধার প্রবাহের ঢেউ উঠল। লালাজীর শবযাত্রায় লাখ দেড়-লাখ মানুষের জমায়েত হল। লাহোরে এমন কোন একজন হিন্দু বা মুসলমান ছিল না যে লালাজীর মৃত্যুতে শোকাভূত না হয়েছে। লাহোরের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এই শবযাত্রায় অংশ নিয়েছে। লালাজীর বাংলো থেকে সকাল দশটায় শবযাত্রা বেরিয়ে সন্ধ্যা পাঁচটার পর চার মাইল দূরে রাবি (ইরাবতী) নদীর ধারে শবদাহের জন্য পৌঁছেছে।"... ('সিংহাবলোকন', যশপাল)।

সন্ধ্যা পার হয়ে যাবার পরও, লালাজীর বিশাল চিতা নেভেনি। ডাক্তার ভার্গবের আশঙ্কা ছিল, নির্জন নদীপ্রান্তে, রাতের অন্ধকারে, বৃটিশ সরকার লালাজীর চিতার ক্ষতি করতে পারে। ফলে, যশপাল ঐ ঠাণ্ডার রাতে চিতা পাহারা দেবার জন্য রয়ে গেলেন একা। ভগবতীচরণ ভোরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, রাতের সাথী হিসেবে। দুজনে একটা চৌকিতে, খোলা আকাশের নীচে, শীতের রাতে, লালাজীর চিতা পাহারা দিলেন।

অথচ, তৎকালীন সময়ে "লালাজী নিজের রাজনৈতিক জীবনের অন্তিম বছরগুলোয়, বিপ্লবীদের সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। ভগৎ সিং আর সুখদেবদের জন্যে তাঁর বাংলোর দরজা চিরদিনের মতো বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস-এর মধ্যেও মোতিলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ মতদ্বৈধ ছিল। কংগ্রেসের সুস্থ ঐতিহ্য ভেঙে, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গ নিতেও শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু, সে সব দেশের ঘরোয়া কথা। দেশের বাইরের লোক তাঁকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা বলেই জানত। সে-দিক থেকে লালাজীকে প্রহার, গোটা জাতিকে প্রহারের সামিল। আমাদের পৌরুষের প্রতি এ একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা তা স্বীকার করে নিলাম।" ('শহীদ স্মৃতি')।

G. S. Deol লিখেছেন যে, লালাজীকে প্রহারের ঘটনার সময় ভগৎ সামনে থেকে সব কিছু দেখেছেন। রাগে ক্ষোভে তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। পাল্টা মার দেবার জন্য তাঁর প্রবল প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু দলের নির্দেশ ছিল অহিংস, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের, তাই অতিকষ্টে তিনি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন, অত্যন্ত অসহায়ভাবে।

সান্ডার্স হত্যা :

ইংরেজ পুলিশের লাঠির ঘাযে, লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর পর, জনসাধারণের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী উঠেছিল। কিন্তু, বিদেশী সরকাবেব কানে তা পৌঁছয়নি। এছাড়াও দাবী উঠেছিল, ইংরেজ সরকারের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে, লালাজীর প্রতি ঘৃণ্য পুলিশী আক্রমণ সম্পর্কে। কিন্তু, সরকার কোন দাবীর প্রতিই কান দেন নি। G. S. Deol, লণ্ডনের Parliamentary Debates, House of Commons, Volume 223, No-15, Page-7, Monday, the 26th November, 1928 -এর তথ্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই প্রসঙ্গে সরকারী অজুহাত হল, "সরকার যখন বুঝেছেন জনতাকে সংযত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা দরকার তখন তারা সেটা করেছেন। এই কারণে কোন মানুষের কাছে, ব্যক্তির কাছে বা কোন আহত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়ের কাছে ক্ষমা চাইবার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।" অর্থাৎ, সোজা কথায় ইংরেজ সরকার আর পাঁচটা স্বৈরাচারীদের মত বলতে চেয়েছিলেন, তারা যা করেছেন, বেশ করেছেন, ঠিক করেছেন। তোমাদের কোন কথায় আমরা কান দেব না। তোমাদের কোন দাবীই আমরা গ্রাহ্য করব না। বৃটিশ রাজশক্তির ঔদ্ধত্য, স্বৈরাচারী

আচরণ ও পরাধীন জাতির প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা, অবহেলা গোটা ভারতীয় জাতির প্রতি ছিল এক চরম অপমান।

১৯২৮ সালের ১০ই ডিসেম্বরের এক রাতে, লাহোরের 'মজংগ' মহল্লার এক বাড়িতে (মজংগ হাউস) বসল 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসন ও আর্মি'র কেন্দ্রীয় সমিতি'র বর্ধিত গোপন বৈঠক। দলের অন্যান্য কর্মীদেরও আহ্বান করা হল এই বৈঠকে। "সভায় যোগ দিলেন, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেব, মহাবীর সিং, জয়গোপাল, কিশোরীলাল এবং ভগবতীচরণ ভোরার স্ত্রী দুর্গা দেবী। সারা দেশের সাধারণ (রাজনৈতিক) অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করে এবং তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে ভগৎ সিং বললেন, 'সারা দেশ জুড়ে আজ প্রবল উত্তেজনা। বাংলা'র দল, চমৎকার কাজ করছে। তারা বেশ কিছু সরকারী উচ্চপদস্থ আমলাকে খতম করেছে। ইংরেজ অফিসাররা এখন দারুণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত। ভয়ে, আতঙ্কে ইংরেজরা তাদের পরিবারের লোকজনকে বিলেতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিছুদিন বাদে, তারা ভালমতই টের পাবে যে, ভারতে আর তাদের পা রাখার জায়গা নেই। সকলকে পাততাড়ি গুটোতে হবে। লালা লাজপত রায়ের শহীদের মৃত্যুবরণ, কংগ্রেসীদের হৃদয়েও প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে, কিছু নির্দিষ্ট কার্যকরী প্রস্তাব পেশ করার জন্য জওহরলাল নেহরুও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কংগ্রেসীরা সত্যিই কিছু করবে কিনা। অন্যদিকে, এটা সত্য ঘটনা যে, আজ সারা দেশের যুবশক্তির রক্ত টগবগ করে ফুটছে। তারা কিছু করতে চায়।'

"সভার সভাপতি হিসেবে চন্দ্রশেখর আজাদ বললেন, 'কমরেড, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়ছি। শত্রু পক্ষের সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ অগুনতি, অসংখ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ সত্ত্বেও আমাদের আছে এক বিরাট সম্বল, যার নাম আত্মবলিদানের অফুরন্ত প্রেরণা। আর আছে, এ কাজে সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি।

"আজাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে ভগৎ সিং বললেন, 'প্রয়োজনে, কেবলমাত্র একজন স্কট (পুলিশের এস্-পি) নয়, ঐরকম আরও স্বৈরাচারী ইংরেজকে খতম করতে হবে। পাঞ্জাবে ইংরেজ গভর্নর্ও বাদ যাবে না। যেদিন ইংরেজরা দেখবে, একজন হিন্দুস্থানীকে হত্যা করলে পাল্টা দশজন ইংরেজ খতম হয়ে যাচ্ছে, সেদিন তাদের হুঁশ হবে। এর আগে নয়'।" ('Shaheed Bhagat Singh, a biography', G. S. Deol)।[২৩]

ভগৎ সিং-এর প্রস্তাব অনুযায়ী, সভার আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হল, লালাজীর হত্যা ভারতীয় জাতির প্রতি ইংরেজ রাজশক্তির বেপরোয়া অপমান; যার যোগ্য জবাব দেওয়া উচিত।

যশপাল লিখছেন, "কিছুদিন সান্ডার্স ও স্কটের যাতায়াতের রাস্তার ওপর নজর রাখা হল।...পুলিশ থানার সামনে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সান্ডার্স তার মোটর সাইকেল রাখত। আসলে ঐ সময়, দুই তিন দিন পুলিশের এস্-পি স্কট লাহোরেই ছিল না।

ফলে, যারা বলেন, স্কটের জায়গায় ভুল করে সান্ডার্সকে হত্যা করা হয়েছিল, সেটা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে ভুলের কোন সুযোগই ছিল না।

"১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর, দুপুরের কিছুটা বাদে, 'মজংগ' থেকে জয়গোপালকে পাঠান হল, এটা দেখে আসতে যে, পুলিশ দপ্তরে সান্ডার্স আছে কিনা। জয়গোপালই কিছুদিন যাবৎ সান্ডার্সের যাতায়াতের ওপর নজর রাখছিল। সে সান্ডার্সকেই ভাবল স্কট। আসলে, সম্ভবত সে কোনদিনই স্কটকে দেখেনি। রাজগুরু আগেই জায়গাটা দেখে রেখেছিল। রাজগুরু সাইকেল চালাতে জানত না। সেই কারণে সে বেশ কিছুটা আগেই, রিভলবার সমেত রওনা হয়ে, ধীরে ধীরে ঘটনাস্থলের দিকে গেল। কিছুটা বাদেই চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ভগৎ সিং সেখানে এল সাইকেলে চেপে। দু'দিন আগেই ঘটনাস্থল সরজমিনে তদন্ত করা ছিল। ঠিক করাই ছিল কে কোন জায়গায় পজিসন নিয়ে অপেক্ষা করবে। শত্রুর মুখোমুখি হলে কি করা হবে। পেছন থেকে পুলিশ তাড়া করলে কোন রাস্তা ধরে পালান হবে, ইত্যাদি।

"মোটর সাইকেলে চেপে, সাঁন্ডার্স যখন পুলিশ দপ্তর থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় আসবে, ঠিক সেই সময়ই ভগৎ সিং ও রাজগুরু তার ওপর গুলি চালাবে, এটা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করা ছিল। কাছাকাছি জয়গোপাল একটা সাইকেল নিয়ে এমন ভান করে অপেক্ষা করবে, যেন তার সাইকেলটা খারাপ হয়ে গেছে, সে তারই পরীক্ষা করছে। জয়গোপালকে দিয়ে এই সাইকেল রাখার পরিকল্পনাটা ছিল এই কারণে যে, যদি কোন কারণে রাজগুরু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ ভগৎ সিং সাইকেলে চেপে সান্ডার্সের পেছনে তাড়া করে গুলি চালাবে।

"চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশ দপ্তরের সামনে, ডি.এ.ভি কলেজের কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায় পজিসন নিয়ে অপেক্ষা করছিল, যাতে গুলি চালাবার পর ভগৎ সিং ও রাজগুরু ডি.এ.ভি কলেজের ঘেরা জায়গাটা পার হয়ে, বোর্ডিং-এর দিকে চলে যেতে পারে, সেটা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। আজাদের পরিকল্পনা ছিল, অ্যাকসনের পর, যদি কোন পুলিশের লোক, ভগৎ ও রাজগুরুর পেছনে তাড়া করে, সেক্ষেত্রে পুলিশকে রুখে দিয়ে, তাদের পালাবার রাস্তা সুগম করা। আজাদের কাছে ছিল মাউজার পিস্তল। এই পিস্তলের বিশেষত্ব হল, এর কেসকে প্রয়োজনে রাইফেলের কুঁদোর মত লাগিয়ে নিয়ে, রাইফেলের মত কাঁধে লাগিয়ে, নিশানা করা যায়। মাউজার পিস্তলকে সাধারণ বন্দুকের চেয়েও আরও দূর অবধি নিশানা বানাবার কাজে এইভাবে ব্যবহার করা চলে। মাউজার পিস্তলে দশটা গুলির ম্যাগাজিন ভরা যায়। এইরকম দুটো ম্যাগাজিন আজাদ তার পকেটে মজুত রেখেছিল, এই কাজের জন্য।

"ঘটনার শুরুতেই, যাতে কারও সন্দেহ না হয়, এই উদ্দেশ্যে, ভগৎ সিং ও রাজগুরু পুলিশ দপ্তরের রাস্তার দিকে খোলার ফটক থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কথা ছিল, জয়গোপাল ইশারা করলেই ওরা এগিয়ে যাবে। সান্ডার্স মটর সাইকেল চালু করে ফটকের দিকে এগিয়ে আসতেই জয়গোপাল দূরে দাঁড়ান ভগৎ সিং ও রাজগুরুকে

সংকেত দিল। সান্ডার্স ধীরে ধীরে ফটকের কাছে আসতেই, রাজগুরু লাফিয়ে সান্ডার্সের কাছে এসেই, তার গলার ওপরে, মাথার কাছাকাছি জায়গায় গুলি চালাল। সান্ডার্স গুলি খেয়ে, মটর সাইকেল সমেত পড়ে গেল। তার গলায় ক্ষীণ আর্ত চীৎকার শোনা গেল। নিসংশয় হবার জন্য ভগৎ সান্ডার্সের মাথায় এবং কাঁধে আরও চার-পাঁচটা গুলি চালাল। এবার ভগৎ এবং রাজগুরু দ্রুত কলেজের প্রাঙ্গণের দিকে এগোল।

"সান্ডার্সকে পড়ে যেতে দেখেই পুলিশ-দপ্তরের বরান্দায় দাঁড়ান এক সিপাই চীৎকার করে উঠল। ট্র্যাফিক্ ইনস্পেক্টর মিঃ ফার্ন-সহ আর দুজন সিপাই ভগৎ সিং এবং রাজগুরুর দিকে তাড়া করে ছুটল। ভগৎ সিং ঘুরে দাঁড়িয়ে ফার্নের ওপর গুলি চালাল। ঝুঁকে পড়ে বাঁচতে গিয়ে সে পড়ে গেল। গুলির হাত থেকে সে বেঁচে গেল। বাকী সিপাইদের আর এগোবার সাহস হল না।

"আজাদ তার পজিশন থেকে, ভগৎ এবং রাজগুরুকে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলল, 'চলো, এগিয়ে চল জলদি।'

"ভগৎ সিং এবং রাজগুরু এগিয়ে গেল। এবার আজাদ ওদের পলায়ন পথের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেল। এ সত্ত্বেও, হেড কনস্টেবল চন্দন সিং, ঐ দুই সিপাইদের গালি দিয়ে, তাদের নিয়েই ভগৎ এবং রাজগুরুর পেছনে তাড়া করল।

"আজাদ তার মাউজার পিস্তলকে রাইফেলের মত তুলে চন্দন সিংকে ধমকালো, 'খবরদার, পিছে হটো।'

"সাথী দুই সিপাই তো ভযে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু চন্দন সিং থামল না। বাধ্য হয়ে আজাদকে গুলি চালাতে হল। আজাদের একটি গুলিতেই চন্দন সিং মুখ থুবড়ে পড়ল। সে দৃশ্য দেখে, বাকী দুজন আর এগোল না। আজাদও ভগৎ সিং এবং রাজগুরুর পেছনে পেছনে কলেজের প্রাঙ্গণ পার হয়ে বোর্ডিং-এর দিকে এগোল। বোর্ডিং-এ পৌঁছে আজাদ রাজগুরুকে তার সাইকেলে চাপিয়ে গোলবাগ হয়ে 'মজংগের' দিকে চলে গেল। তারই পিছনে পিছনে গেল ভগৎ সিং।" ('সিংহাবলোকন', যশপাল)।

দলের গোপন আস্তানায়, পরবর্তী দুদিন কাটালেন ভগৎ সিং, রাজগুরু ও অন্যান্য সাথীরা। "লালাজীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে লালাজীর হত্যাকারীকে মারা দরকার, এ প্রস্তাব ছিল ভগৎ সিংহেরই। তা সত্ত্বেও, সান্ডার্স-এর হত্যাকাণ্ডের পর, দিন কয়েক তার মন কেমন উদ্বেল হয়ে রইল। বিপ্লবী হলেও রক্তপিপাসু সে ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল গোটা মানবজাতিকে সুখী করা। তাই মানুষ মাত্রের প্রাণের প্রতিই তার স্বভাবত মমতা ছিল। বিপ্লবীরা খুনী নয়। মানবতার পূজারী। সেই জন্যে মানুষের প্রাণ নিতে স্বভাবতই তাদের দুঃখ হয়।" ('শহীদ স্মৃতি')। ভগৎ পরবর্তী সময়ে, একটি ইশ্তেহারে ব্যক্ত করেছেন তার মর্মবেদনা :

"মানুষের জীবনকে আমরা পবিত্র বলে মনে করি। এমন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আমরা বিশ্বাস রাখি, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি পূর্ণ শান্তি ও স্বাধীনতার সুযোগ পেতে পারে। মানুষের রক্ত ঝরাতে বাধ্য হই বলে, আমরা দুঃখিত। তবে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সকলকে

সমান স্বাধীনতা দিতে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ শেষ করতে, বিপ্লবে কিছু না কিছু রক্তপাত অনিবার্য।" (দিল্লী আইনসভায় বিলি করা ইশ্‌তেহার)।

চন্দ্রশেখর আজাদও এই ঘটনার পর, সিপাই চন্দন সিং সম্পর্কে বলতেন যে, লোকটা নিঃসন্দেহে সাহসী ছিল। আজাদ বলতেন যে, ইচ্ছে করলে সেও অন্য পুলিশদের মতো পালাতে পারত, বা নালায় শুয়ে পড়ে গুলির হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারত। বাধ্য হয়ে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে, আজাদের হাতে সিপাই চন্দন সিং-এর মৃত্যু হয়। আজাদের মানবিক কোমল বৃত্তির প্রকাশ পায় এ সম্পর্কে সিপাই-এর স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের জন্য দুঃখ ব্যক্ত করার মধ্যে। চন্দন সিং-এর পরিবার পরিজন কিভাবে দিন গুজরাণ করছে, এই চিন্তা, আজাদকে পীড়া দিয়েছে এবং তিনি কয়েকবার সাথীদের কাছে কথা প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন। কঠোরতার পাশাপাশি মানবিক কোমল-বৃত্তির মিশ্রণ আজাদ চরিত্রের এক অজানা বৈশিষ্টের দিক। সাধারণভাবে আজাদকে কেবলমাত্র কড়া ধাতের, হৃদয়হীন মানুষ বলেই চিত্রিত করা হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল।

সান্ডার্স-বধ সূত্রে, পরবর্তীকালে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে, ভগৎ সিং সম্পর্কে এক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন :

"He (Bhagat Singh) became a symbol, the act (Saunder's murder) was forgotten, the symbol remained, and within a few months each town & village of the Punjab and to a lesser extent the rest of northern India resounded with his name. Innumerable songs grew up about him, and the popularity that the man achieved was something amazing."

লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর পর, এক শোকসভায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী বলেছিলেন, "আমি একজন ভারতীয় নারী হিসেবে দেশের যুবশক্তির প্রতিক্রিয়া জানতে চাই। লালাজীর মত একজন দেশবরেণ্য নেতা, যদি একজন সাধারণ পুলিশ অফিসারের লাঠির ঘায়ে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে সেই জাতীয় অপমান অবহেলার বিরুদ্ধে, লালাজীর চিতা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগেই, তারা কী ব্যবস্থা নিতে চায় ?"

ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সুখদেব, রাজগুরু'র দল, 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসন' এবং 'আর্মি' বাসন্তী দেবীর প্রশ্নের জবাব দিতে দেরী করেন-নি। সারা দেশের দেশপ্রেমিক মানুষ জাতীয় অপমান অবহলোর সামনে, যোগ্য উত্তর খুঁজে পেয়ে ; মনে মনে, প্রবল আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করেছে, সান্ডার্স হত্যার ঘটনায়।

সান্ডার্স হত্যার পর প্রচার :

ইংরেজ পুলিশ অফিসারের হত্যাকাণ্ডের পর, গোটা লাহোর শহরে টান-টান উত্তেজনা ছড়াল। কিন্তু ঘটনার পেছনে রহস্যের অনুমান করতে মানুষের অসুবিধা হচ্ছিল। তাৎক্ষণিক অনেক রকম সন্দেহই কাজ করছিল। বেশ কিছু লোকের মধ্যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল,

এ ঘটনা হয়ত ডাকাত দলের কাজ। ডাকাতরাই বদলা নিয়েছে। দ্বিতীয় দিনই, ইংরাজীতে লেখা কিছু লাল ইশ্‌তেহার লোকের হাতে এল, দেওয়ালেও সেগুলো লাগান অবস্থায় দেখা গেল। এতেই সব সন্দেহের নিরসন হল।

লাল ইশ্‌তেহার বা প্রচারপত্রে লেখা ছিল :

" হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি :

" : নোটিশ :

" : ইংরেজের গোলামশাহী সাবধান :

": জে. পি. সান্ডার্সের মৃত্যু ; লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর বদলা :

"এটা ভাবলে সত্যিই ঘৃণাবোধ হয় যে, জে. পি. সান্ডার্সের মত একটা মামুলি স্তরের ঘৃণ্য পুলিশ অফিসারের অপমানভরা হাত ছুঁতে পারল হিন্দুস্থানের ৩০ কোটি মানুষের শ্রদ্ধেয় দেশবরেণ্য জাতীয় নেতাকে এবং তারই ফলে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হল। জাতীয় আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতার গায়ে হাত দিয়ে, ইংরেজ রাজশক্তি দেশের যুবশক্তি এবং মনুষ্যত্ববোধকে চ্যালেঞ্জ জানাল।

"আজ, সারা দুনিয়া জানতে পারল, ভারতবর্ষ বেঁচে আছে। তারা জানল যে, দেশের যুবকদের রক্ত সম্পূর্ণ শীতল হয়ে যায়নি। তারা আরও জানল যে, এই যুবকরা দেশের বিপদ ও সংকটের মুহূর্তে দেশের সম্মানরক্ষার্থে, জীবন দিতে জানে। আর এই মহান কাজটা বাস্তবে করে দেখাল সেই সব অতি অজ্ঞাত, অখ্যাত যুবকেরা, যাদের এ দেশেরই একাংশের মানুষ সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য হামেশা নিন্দা ও অপমান করে থাকেন।

": অত্যাচারী, ইংরেজ সরকার, সাবধান :

"দেশের দলিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের আত্মসম্মান ও আত্মচেতনাবোধের ওপর আঘাত হানতে, সাবধান! তোমাদের নারকীয়, পৈশাচিক কাজ-কারবার চালাবার সময় আগাম ভেবে নিও তার পরিণাম কি হতে পারে। মনে রেখো, 'অস্ত্র আইন' (Arms Act) জারি করে, অস্ত্রপাচারের ওপর কড়া নজরদারী চালিয়েও, রিভলবার আসা বন্ধ করতে পারনি তোমরা। এই মুহূর্তেই, সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করার মত প্রচুর অস্ত্র হাতে না থাকলেও, তোমরা নিশ্চয়ই টের পাচ্ছ যে, জাতির প্রতি, জাতীয় নেতাদের প্রতি, অপমানের বদলা নেবার মত, যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের হাতে আছে। আমাদের নিজ দেশের কিছু লোক যতই কেন আমাদের নিন্দা ও অপমান করুক, বিদেশী ইংরেজ সরকার আমাদের ওপর যতই দমন, পীড়ন ও অত্যাচার চালাক, একদল যুবক চিরকালই সজীব থাকবে, বেঁচে থাকবে, উদ্ধত, অহংকারী শাসককে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য। মনে রেখো, এই যুবকরা এমনি ধাতু বা উপাদান দিয়ে তৈরি যে তারা শত দমন, পীড়ন, অত্যাচারের মধ্যেও, এমনকি ফাঁসি কাঠে গলা এগিয়ে দিয়েও উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে বলবে,

"ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ (Long live Revolution)।

"একজন মানুষের মৃত্যুতে আমরা সত্যিই দুঃখিত এবং মর্মাহত। কিন্তু, এক্ষেত্রে একে একজন মানুষ হিসেবে নয়, এমন একজন হিসেবেই বিচার করতে হবে যে, নির্দয়, নীচ ও অন্যায়পূর্ণ এক শাসন ব্যবস্থারই অঙ্গ ছিল। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আঘাত হানা হয়েছে ঐ ঘৃণ্য শাসন ব্যবস্থারই বিরুদ্ধে। কারণ, আমরা চাই এই শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হোক। এই মানুষটির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, মৃত্যু হয়েছে, ভারতের বৃটিশ সরকারী কর্তৃত্বের একজন প্রতিনিধির—সেই সরকারের প্রতিনিধি, যে কিনা সারা দুনিয়ার অত্যাচারী, স্বৈরাচারী সরকারের মধ্যে অগ্রগণ্য সরকার।

"মানুষের রক্ত ঝরাতে হল বলে, আমরা, বাস্তবিকই দুঃখিত। কিন্তু মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ করতে হলে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রে ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

"(বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক) ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

"স্বাক্ষরকারী— বলরাজ।

"কমান্ডার-ইন্- চীফ।

"তারিখ, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৮"

প্রচারপত্র বা ইশ্‌তেহারের শেষে 'বলরাজ' নামের স্বাক্ষরটি ছিল কাল্পনিক। আসলে, চন্দ্রশেখর আজাদ-ই ছিলেন তখন, কমাণ্ডার-ইন্-চীফ। 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির' সর্বাধিনায়ক।

ভগৎ সিং-এর নাটকীয় পলায়ন পর্ব :

ভগৎ সিং-এর পলায়ন পর্বের নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলে, তাঁর সাথী যশপালের, 'সিংহাবলোকন' গ্রন্থ থেকে। এ ছাড়া, অতি যত্নসহকারে এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক হাজারা সিং, তাঁর 'The Dramatic Escape' লেখাটিতে।[২৪] এটিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এইসব নির্ভরযোগ্য সংগৃহীত তথ্যকে সূত্রবদ্ধ করলে, ভগৎ সিং-এর নাটকীয় পলায়ন পর্বের চিত্রটা দাঁড়ায় এইরকম :

সান্ডার্স হত্যার ঘটনাটি ঘটে ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৮ তারিখের বিকেলে, প্রায় ৪-১৫ মিনিট নাগাদ। ঘটনাস্থল থেকে চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে সুপরিকল্পিতভাবে ভগৎ সিং, রাজগুরু'রা এসে আশ্রয় নেন লাহোর শহরে। বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা, 'মজংগ হাউসে'। এখানে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে টানা দুদিন ভগৎ সিং ও রাজগুরুকে লুকিয়ে রাখা হয়। ইতিমধ্যে, অর্থের বন্দোবস্ত ও সকলের নিরাপদ পলায়নের জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে।

সান্ডার্স হত্যার পরদিন সুখদেব এসে যশপালের সঙ্গে দেখা করেন। সুখদেব বলেন, 'এখন টাকা চাই। তোমার ডাক্তার সাহেব, গোপীচন্দ্রজী নিশ্চয়ই লালাজীর হত্যার

প্রতিশোধ নেবার ঘটনায় সন্তুষ্ট? ওঁর সঙ্গে টাকার ব্যাপারে কথা বল। টাকার দরকার; জলদি।' সত্যিই তখন জরুরী ভিত্তিতে টাকার প্রয়োজন। চন্দ্রশেখর আজাদের নির্দেশে জয়গোপাল, (পরবর্তীকালে বিশ্বাসঘাতক) তার বন্ধু বংশীলালের কাছ থেকে, মাত্র দশটাকা চেয়ে এনেছে, গোপন আস্তানার সকলের খাবার বন্দোবস্ত করার জন্য।

যশপাল, ডাক্তার সাহেবের কাছে একান্তে, টাকার কথাটা তুলেলেন। গোপীচন্দ্রজী কৌতূহলী হলেন। বললেন, 'এ কাজ কারা করেছে?'

যশপাল জবাব দিলেন, 'নাম বলা যাবে না। তবে এই কাজ করেছে বিপ্লবীরা, যারা দেশের সম্মানের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জীবন দিতে তৈয়ারি হয়ে আছে।'

ডাক্তারজী সব শুনেও, মাত্র দুশ টাকা দিলেন যশপালের হাতে। কিন্তু এই সামান্য টাকায় কি হবে?

ভগৎ সিং-এর সাথী ভগবতীচরণ ভোরা, এককথায়, বড়লোকের ছেলে। তাঁর বাবা ইংরেজের দেওয়া রায়সাহেব উপাধীধারী, রায়সাহেব পণ্ডিত শিবচরণ। ১৯২০ সালে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে'র উচ্চপদস্ত অফিসার হিসেবে লাহোরে রেখে গেছেন বিরাট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। এ সত্ত্বেও অর্থের লোভে বিপ্লবের পথ ভোলেননি তাঁর একমাত্র পুত্র ভগবতীচরণ। ভোলেননি তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী দুর্গা দেবী। সক্রিয় বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে, শত বিপদের মধ্যেও, ভগবতী নিজেকে যুক্ত করেছেন। অর্থের প্রলোভন তাঁকে ঘরে বাঁধতে পারেনি।

'মীরাট ষড়যন্ত্র' মামলায় কম্যুনিস্ট হিসেবে তাঁর নামেও ওয়ারেণ্ট বেরতে পারে, এই আশঙ্কায়, ভগবতী তখন ফেরার ছিলেন। কিন্তু দলের নির্দেশে, একদিন স্ত্রী দুর্গাদেবীর সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। বললেন, 'কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হতে চলেছে, তুমি যাবে?' দুর্গা দেবী উৎসাহ পেলেন না। বললেন, 'সেখানে গিয়ে কি করব?' ভগবতী আর জোর দিলেন না। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি একাই যাচ্ছি। তুমি এক কাজ কোর, ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচশ টাকা তুলে রেখ। কখন কি দরকার পড়ে যায় বলা তো যায় না!'

দুর্গা দেবীর সন্দেহ হোল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত টাকা কি হবে?' ভগবতী এবার গিন্নীর ওপর হুকুম চালালেন, 'যা বলছি, কোর। টাকাটা তুলে রেখো।'

এবার এল সত্যিকারের প্রয়োজন এবং পরীক্ষার সময়। সুখদেব একদিন এসে দুর্গাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৌদি, ঘরে টাকা আছে'? দুর্গা দেবী এবার সসংকোচে বললেন, 'কেন, কেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখছি, কি আছে। কত, কত চাই?'

সুখদেব জানতে চাইলেন, 'ঘরে কত টাকা আছে?'

দুর্গাদেবী তবু প্রশ্ন করলেন, 'কি করবে? ঠিক আছে, কত চাই?'

সুখদেব বললেন, 'এই শ'-পাঁচেক!'

দুর্গাদেবী সুখদেবের হাতে, স্বামী ভগবতী'র নির্দেশে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে রাখা, পাঁচশো টাকা তুলে দিলেন।

লাহোরের গোপন আস্তানা থেকে এবার এক এক করে ফিরোজপুর, অমৃতসর এসব নানান জায়গায় সাথীদের সরিয়ে দেওয়া শুরু হল।

সমস্যা দাঁড়াল ভগৎ সিং, রাজগুরু'দের নিয়ে। সান্ডার্স অ্যাকশনের সময় পুলিশের লোকেরা ভালমত চিনে রেখেছিল এদের। যদিও ভগৎকে পুলিশ আগের শিখ যুবকের বেশ-ভূষায় যেভাবে চিনত, এখন চুল কেটে ফেলায় এবং সাজ সজ্জা পাল্টে ফেলায় তাকে সহজেই চেনা শক্ত। কিন্তু তাঁর দাড়িতো কখনো ঘন ছিল না। ফলে, মুখের আদলে বা চেহারায় তাকে পুলিশ সন্দেহও করতে পারে, ইত্যাদি ভেবে এক জবরদস্ত দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ছকল দলের নেতারা।

ভগবতীচরণের বাড়ির ওপর তখন পুলিশের গোয়েন্দাদের নিয়মিত ভোর ছ'টা থেকে রাত দশটা অবধি কড়া নজরদারী চলছিল।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ তারিখে রাত ৮টা নাগাদ, সুখদেব অতি সন্তর্পণে ঢুকলেন ভগবতীচরণ ভোরার বাড়িতে। দুর্গাদেবী তখন সংস্কৃত বিষয়ের ওপর পড়াশুনা করছিলেন অপর এক প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে, একজন অধ্যাপকের কাছে।

সুখদেব দুর্গাদেবীকে একপাশে ডেকে অতি সাবধানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ি ছেড়ে বেরতে পারবে?'

চমকে উঠে দুর্গা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? কোথায়?··· কি জন্যে?'

সুখদেব জানালেন, 'লাহোরের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একজনকে বাঁচাতে লাহোরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। সেই লোকটির মেম বা বিবি বনতে হবে তোমাকে। সেইভাবেই তার সঙ্গে যেতে হবে। বিপদ আছে। সেটা আগেই বলছি। কারণ, বলা যায় না, গুলি-টুলিও চলতে পারে।'

দুর্গা দেবী প্রশ্ন করলেন, 'লোকটি কে?'

সুখদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে বেপরোয়াভাবে বলল, 'সে যেই হোক!'

দুর্গাদেবী আর প্রশ্ন করলেন না। জীবনের এক সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর দেরি হল না। দলের লোকেদের প্রতি দরদ, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর আগ্রহ, তাঁকে দ্রুত এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। একজন হিন্দু বিবাহিতা মহিলাকে তার স্বামীর অজান্তে অপর এক অজানা, অচেনা পরপুরুষের সঙ্গে, স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে, তার সঙ্গে পালাবার কাজে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে; তথাকথিত কোন সামাজিক সংস্কারই রুখতে পারল না। দুর্গা দেবী দৃঢ় কণ্ঠে সম্মতি জানালেন, 'ঠিক আছে, আমি যাব।'

সুখদেব বললেন, 'লোকটি আজ রাতে, তোমার বাড়িতেই থাকবে। এখন তোমার এই লেখাপড়ার পাট তোল।'

দুর্গা দেবী বললেন, 'বেশ তাই হবে।'

রাত দশটায় গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারী উঠে গেলে, সুখদেব দুজন লোককে সঙ্গে নিয়ে, ভগবতীচরণের বাড়িতে ঢুকল। একজনের পরনে ওভারকোট, হ্যাট। লম্বা চওড়া চেহারায় যেন এক সাহেব। অপরজন, সাদামাঠা পোশাকে যেন সাহেবের চাকর। দুর্গা

দেবী তাদের বসতে বললেন। নিজেও বসলেন। বারে বারে সুখদেবের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলেন। অপরিচিত সাহেবী পোষাকের লোকটির দিকে দেখলেন বটে, কিন্তু তার দিকে তো গভীর ভাবে কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন না! কাজেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে সুখদেবই কেবল বিদ্ধ হতে থাকলেন দুর্গাদেবীর চোখে।

এবার সুখদেব লোকটির দিকে সংকেত করে, দুর্গা দেবীকে প্রশ্ন করলেন, 'লোকটিকে চিনতে পারছ?'

দুর্গাদেবী এরই অপেক্ষায় ছিলেন। প্রশ্ন শুনে, লোকটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, গভীরভাবে দেখলেন, কিছুটা ভাবলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আরে, ভগৎ!'

ভগৎ সিং ও সুখদেব একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

কিন্তু চাকরের বেশের রাজগুরুকে দুর্গা দেবী বিশেষ নজর দিলেন না। তাকে সাধারণ কাঁসার থালায় খেতে দিলেন। রাতের জন্য তার কোন বিছানা জুটল না। বেঞ্চির গদিতে শুয়ে রাত কাটাতে হল রাজগুরুকে। (পরবর্তীকালে, শহীদ রাজগুরুর প্রতি এই অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য দুর্গাদেবী গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন।)

এবার ঠিক হল, পরদিন ভোর ৬-১০ মিনিটে হাওড়াগামী ট্রেনে চেপে, রওনা হতে হবে দুর্গাদেবীকে, ভগৎ সিং-এর সঙ্গে। পুলিশের নজরদারী শুরু হবার আগেই, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার সুবিধের জন্যই, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

বাকী দুটি সমস্যার সমাধানও করে ফেললেন দুর্গা দেবী। একটি হল, শিশু সন্তান, শচীকে নিয়ে। ঠিক হল, শচী তার অতি পরিচিত 'লম্বা চাচা,' ভগৎকে যখন চিনতে পারেনি, তখন ট্রেনযাত্রায় সেও সহযাত্রী হলে, কোন সমস্যাই হবে না। আর একান্তই যদি গুলি-গোলা চলে, তাহলে সকলের যা পরিণতি শিশু সন্তানেরও তাই হবে। এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন দুর্গা দেবী। দ্বিতীয় সমস্যাটি হল, তাঁর স্কুল মহিলা মহাবিদ্যালয়, যেখানে তিনি শিক্ষকতা করতেন, সেখানে তাঁর অনুপস্থিতির খবর পৌঁছান। সুখদেব দায়িত্ব নিলেন, স্কুলের বাসের ড্রাইভারের হাতে দুর্গা দেবীর অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির এক আবেদন পত্র তিনি পৌঁছে দেবেন, যাতে সেটা সরাসরি হেড মিস্ট্রেসের কাছে চলে যায়।

পরদিন, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ তারিখে ভোর পাঁচটা নাগাদ দুর্গাদেবী জমকালো পোশাক পরে, ভগৎ সিং এবং রাজগুরুর সঙ্গে টাঙ্গায় চড়ে স্টেশনে পৌঁছলেন। ওভারকোটের কলার তুলে মুখের একপাশ ঢেকে রেখেছেন ভগৎ। কোলে ঘুমন্ত শিশু শচী। সঙ্গে অত্যাধুনিকা বিবি দুর্গাদেবী। পেছনে মালবাহক চাকর, সাথী বিপ্লবী রাজগুরু। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে গট্‌গটিয়ে কামরায় উঠলেন তাঁরা। লাহোর স্টেশন চত্বর তখন পুলিশ এবং গোয়েন্দায় ছেয়ে আছে, চতুর্দিকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু সাহেবী পোষাক পরিহিত, সস্ত্রীক, সপরিচারক যাত্রী ভগৎ সিং-কে, তারা সন্দেহের মধ্যেই আনতে পারেনি। যদিও যে কোন অবস্থার মোকাবিলার জন্য গুলি ভরতি পিস্তল তৈরি ছিল তাদের সঙ্গে। এ এক দুঃসাহসিক, অচিন্তনীয় পরিকল্পনা!

পরদিন, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ তারিখে কানপুরে যাত্রাবিরতি করে তাঁরা পৌঁছলেন লাক্ষ্ণৌ। পলায়ন পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল এটি। কারণ, লাহোর থেকে আসা প্রতিটি ট্রেনের যাত্রীদের ওপর হাওড়া স্টেশনে কড়া পুলিশী নজরদারী ছিল। লাক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায়, দলের সমর্থক সুশীলা দেবীর (সুশীলা দিদি) কাছে টেলিগ্রাম পাঠান হল। সুশীলা দিদি তখন কলকাতার সেন্ট্রাল এভিন্যিউ (চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ)-এ শেঠ ছাঁজুরামের বাড়িতে গৃহশিক্ষিকা হিসেবে থাকতেন। টেলিগ্রামে ভগৎ সিং জানালেন, 'ভাই-এর সঙ্গে আসছি, দুর্গাবতী'। লাক্ষ্ণৌ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ভগৎ সিং, দুর্গা দেবী সপুত্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। রাজগুরু এখান থেকে বারাণসীর পথে পালালেন। ভগৎ সিং এবং দুর্গাদেবী পোষাক পাল্টে বিহারী গোয়ালাদের চেহারা নিলেন। রওনা হলেন কলকাতার পথে ট্রেনযাত্রায়।

এদিকে দলনায়ক চন্দ্রশেখর আজাদ সকলের নিরাপদ পলায়নেব ব্যবস্থা করে সুখদেবের মায়ের সাহায্যে, ব্যবসায়ী হিংওয়ালার ছদ্মবেশে, লাহোর থেকে পালালেন।[২৫]

কলকাতায় ভগৎ সিং :

লাক্ষ্ণৌর ট্রেনের যাত্রী ভগৎ সিং, দুর্গা বৌদি ও তাঁর শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছলেন হাওড়া স্টেশনে। ওদিকে টেলিগ্রামের বার্তা সুশীলা দিদির মাধ্যমে ভগবতীর কাছে পৌঁছেছে। দুজনেরই সন্দেহ হল, টেলিগ্রামের সংবাদে। দুর্গাবতী—মহিলাটি কে? দুর্গা দেবী তো কলকাতার কংগ্রেসে আসবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। আবার ঐ দুর্গাবতী মহিলাটির ভাই-ই বা কে?

প্রশ্নের নিরসনে ভগবতীচরণ ভোরা হাজির হলেন হাওড়া স্টেশনে। বিহারী দেহাতীর পোষাকে ভগৎ এবং দুর্গা দেবীকে দেখে চিনতে অসুবিধে হল না ভগবতীর। সানন্দে, উৎফুল্ল চিত্তে, স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে ভগবতী নীচুস্বরে তারিফ করলেন, 'দুর্গা, আজ সত্যিই তুমি ইতিহাস তৈরি করলে!'

দলের সমর্থক সুশীলা দিদি জলন্ধরের 'কন্যা মহাবিদ্যালয়ের' চাকরী ছেড়ে কলকাতার কোটিপতি শেঠ ছাঁজুরামের বাড়িতে গৃহশিক্ষিকার চাকরী করছিলেন। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ের ঐ বাড়িতেই তিনি থাকতেন আলাদা ঘরে। সেখানেই ভগৎ সিং ও দুর্গাদেবীর সাময়িক আশ্রয় মিলল।

ভগৎ সিং যখন কলকাতায় এলেন, তখন জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন চলছিল পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। এই উপলক্ষে শহরে গোয়েন্দা পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরদারীও চলছিল। ভগৎকে চিনে ফেলার বিপদ সম্পর্কে কলকাতা যদিও লাহোরের থেকে নিরাপদ ছিল, তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভগৎ দিনের বেলা যতটা সম্ভব ঘরেই কাটাতেন। শুয়ে-বসে, খেয়ে-দেয়ে, বই পড়ে সময় কাটাতেন। সুশীলাদিদি বাড়ির লোকেদের বলতেন তার ভাই অসুস্থ হয়ে পরেছে, তাই ঘরবন্দী। কিছু ওষুধের শিশিও রাখা হোত ভগৎ-এর ঘরে, এ কথার প্রমাণ স্বরূপ। কিন্তু দিনের আলো নিভে এলেই ভগৎ বেরিয়ে পড়তেন

ঘর ছেড়ে। বাঙালী বাবুদের মত ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, গায়ে শাল জড়িয়ে সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিজেকে সক্রিয় রাখতেন।

এমনি প্রথম অথবা দ্বিতীয় এক রাতে চেনা জানা লোকেদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আচমকা লাহোরের অধ্যাপক জয়চন্দ্রজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভগৎ-এর। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষেই তিনি এসেছেন কলকাতায় আপন নেতৃত্ব সুদৃঢ় করতে। দেখা হতেই অধ্যাপক জয়চন্দ্রজী লাহোরের অ্যাকসনের জন্য সোৎসাহ অভিনন্দন জানালেন। সতর্কভাবে চলার উপদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর মতে এক ভয়ংকর সংকট সম্পর্কে ভগৎকে হুঁশিয়ারী দিলেন। জয়চন্দ্রজী বললেন, 'শোনো, আমি জানি, ভগবতীচরণও কলকাতায় এসেছে। ওর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে সাবধানে!'

জয়চন্দ্রজীর এহেন নীচমনের কথা শুনে ভগৎ সিং-এর প্রচণ্ড রাগ হোল। ভগবতীচরণ ভোরা তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করে, দলের স্বার্থে, নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে পাঠিয়ে, দুঃসাহসিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে গোটা পরিবারকে বাজী রেখেছে। অর্থ দিয়ে, সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে, দলের কর্মসূচী এবং পরিকল্পনাকে সফল বানাতে এগিয়ে এসেছে। সর্বোপরি, যে নিজেই পুলিশের গ্রেপ্তারীর হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তার প্রতিই কিনা জয়চন্দ্রজী ব্যক্তিগত আক্রোশ বশত নিকৃষ্ট সন্দেহের বাক্য উচ্চারণ করছেন যে, ভগবতী গুপ্তচর, তার সম্পর্কে সাবধান, তাকে এড়িয়ে চল! নেহাৎ বয়সে বড় এবং একসময়ের রাজনৈতিক গুরু, নইলে ভগৎ-এর ইচ্ছে হচ্ছিল জয়চন্দ্রজীকে এসব বিশ্রী ইঙ্গিতপূর্ণ কথার জন্য ভালমত শিক্ষা দিয়ে দেবার। অতি কষ্টে ভগৎ নিজেকে সামলে রাখলেন (সূত্র, যশপাল)।

এমনিভাবে, ভগৎ-এর আরও বিরক্তি বাড়ল, দর্শকমঞ্চে বসে, কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজ শাসনাধীন থেকে ভণ্ড স্বাধীনতার প্রবক্তাদের বক্তব্য শুনে। ভগৎ শুনলেন, ঔপনিবেশিক স্বরাজের জন্য নেতাদের দর কষাকষি চলছে। পূর্ণ স্বরাজ, পূর্ণ স্বাধীনতার চিন্তা থেকে নেতারা অনেক, অনেক দূরে। এইসব আপসকামী বিরুদ্ধবাদী নেতাদের ভাষণ ও তর্ক-বিতর্কে কোন উৎসাহ পেলেন না ভগৎ সিং। তাঁর দল, হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েসন এবং আর্মির (H. S. R. A) কর্মসূচী তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে আপসের কোন স্থান নেই। খণ্ডিত ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা, ডমিনিয়ান স্ট্যাটাসের কোন প্রশ্ন নেই। পরিষ্কার তার লক্ষ্য। পূর্ণ স্বাধীনতা। পন্থা একটাই। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। আর স্বাধীনতাই তার শেষ লক্ষ্য নয়। শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনই তার মূল লক্ষ্য।

সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই, অশান্ত ভগৎ সিং-অন্বেষণে নামলেন। সাংগঠনিক যোগাযোগ গড়ার কাজে কলকাতায় আত্মগোপন করে থাকার সময়টাকে সার্থকভাবে দলের কাজে লাগাতে তৎপর হলেন।

অগ্নিযুগের অগ্নিতাপস, অনুশীলন দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে

ভগৎ সিং-এর সঙ্গে এই সময়কার চমকপ্রদ এক সাক্ষাৎকারের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। লেখাটি এইরকম :

"১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং কলিকাতা আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিয়াছিল। ঐ সময় তাহার নামে ওয়ারেন্ট ছিল, সে ছিল পলাতক আসামী। ভগৎ সিং-এর সহিত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত রামশরণ দাসও ছিলেন। রামশরণ দাস আমার বন্ধু ছিলেন, আন্দামানে আমরা একত্রে ছিলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন সেনের আপার সার্কুলার রোডের বাসায় এক রাত্রে ভগৎ সিং, রামশরণ দাস ও আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। ঐ আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন।

"ভগৎ সিং-এর ধারণা ছিল, পাঞ্জাব ঘুমাইয়া আছে। পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইলে শক্ত আঘাত দিতে হইবে। জমকালো (Sensational) কিছু করিতে হইবে। ভগৎ সিং আমাদের নিকট কিছু বোমা ও পিস্তল চাইল। আমরা ১৯২০ সনের পর হিংসাত্মক কর্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়াছি। আমাদের মতে দেশ জাগিয়াছে, এখন লোকদেখান (demonstration) কিছু করার প্রয়োজন নাই। এখন প্রযোজন গণ-আন্দোলনের মারফত জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা জাগান। ব্যাপক সংগ্রামের জন্যই সংগঠন প্রয়োজন। দল সবল না হইলে, সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ আরম্ভ করিলে, গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে যে চাপ আসিবে, সেই চাপ দল সহ্য করিতে পারিবে না। অল্প দিনের মধ্যে দল ভাঙ্গিয়া যাইবে।

"ভগৎ সিং বলিল, 'পাঞ্জাব অনেক পেছনে পডিযা আছে। পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইবে। পাঞ্জাবের লোক ভাব-প্রবণ। জমকালো (Sensational) কোন কাজ দেখিলেই তাহারা লাফাইয়া উঠিবে। ঝাঁপাইয়া পড়িবে। আপনারও তো সন্ত্রাসমূলক কাজ করিয়াছেন। আমরা পাঞ্জাবে বিপ্লবী দল গঠনের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই।'

"ভগৎ সিং সন্ত্রাসমূলক কাজ (Terrorism) আরম্ভ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, অনেক নজির দেখাইল। অবশেষে ভগৎ সিং আমাকে বলিল, 'আপনি রামশরণবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি ঠিক কথা বলিতেছি কিনা। আপনি নিজে একবার পাঞ্জাবে গিয়া পাঞ্জাবের অবস্থা দেখিয়া আসুন।' আমি বলিলাম, 'এখন কোন সন্ত্রাসমূলক কাজ হইলে ধর-পাকড় সুরু হইবে, ষড়যন্ত্র মামলা হইবে, এপ্রেস্তার হইবে, দল ভাঙ্গিয়া যাইবে, ইহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা।'

"ভগৎ সিং বলিল, 'আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাহাদিগকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিলেও টুঁ শব্দ করিবে না। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন।'

"ভগৎ সিং-এর কথার মধ্যে সরলতা ছিল, আন্তরিকতা ছিল। অল্পবয়স্ক যুবক— তাহার কথায় এবং আন্তরিকতা দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি রামশরণবাবুকে বলিলাম, 'আগামী লাহোর কংগ্রেসের সময় আপনি কংগ্রেসে যোগদান

করিয়া সুভাষবাবুর ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর মত একটি কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া তুলুন। আপনার অতীত ইতিহাস আছে। আপনি বহু বৎসর জেলে ছিলেন। আপনি চেষ্টা করিলে কংগ্রেসের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিবেন। এবং ভগৎ সিং যাহাতে ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর চার্জে থাকিতে পারে সে ব্যবস্থা করিবেন।'

"আমি ভগৎ সিংকে বলিলাম, 'তুমি পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলা হইতে পাঁচ হাজার ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করার চেষ্টা কর। এই দল হইবে তোমার ভাবী বিপ্লবের প্রধান সম্বল। পাঞ্জাবীরা সামরিক জাতি। অনেকের আত্মীয়-স্বজন সৈন্যবিভাগে আছে। যদি তুমি একটি ভাল ভলাণ্টিয়ার দল গডিয়া তুলিতে পার, তবে তাহাদের দ্বারাই একটা অভ্যুত্থান সম্ভব করিতে পারিবে।' আমরা ভগৎ সিংকে খুসী করার জন্য কয়েকটা পিস্তল ও বোমা দিলাম। আমি পরে রামশরণ দাসকে বলিলাম, 'এখন এই পিস্তল বোমা ব্যবহার করিবেন না।'

"ভগৎ সিং খুশি হইয়া পাঞ্জাব চলিয়া গেল।"

('জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী-মহারাজ)

শিব বর্মা লিখেছেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ভগৎ H. S. R. A দলের দিল্লী সভার কার্যাবলী সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। নেতারা দলের কর্মসূচীকে সমর্থন জানান। কথাসূত্রে তারা জানান পূর্বে শিব বর্মা বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে যার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সে দলের বিশ্বস্ত লোক ছিল না। ফলে যথার্থভাবে দিল্লীর সভায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব হয়নি।

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন :

"ভগৎ সিং প্রথমে দল গঠন করার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। তখন তাহার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইলে চমকপ্রদ কিছু করিতে হইবে। নতুবা পাঞ্জাবের যুবকদের মোহ নিদ্রা ভঙ্গিবে না।

"কিছুদিন পরে দেখা গেল, ...এসেম্বলীতে বোমা পড়িয়াছে। এই বোমা নিক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল, 'চমকপ্রদ কিছু করিলে পাঞ্জাবের যুবকেরা জাগিবে।'

"ভগৎ সিং ইহা জানিত, এই বোমা নিক্ষেপ দ্বারা বা কতিপয় সাহেব খুন দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। ভগৎ সিং বিশ্বাস করিত, ইহা দ্বারা দেশ আগাইয়া যাইবে। দেশের যুবকদিগের মধ্যে আসিবে নবজাগরণ।

"দেশপ্রেমিক বীর ভগৎ সিং ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া দেশের যুবকদিগের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল।

"ধন্য ভগৎ সিং।" ('জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম', ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী-মহারাজ)।

ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ সাথী বিপ্লবী শিব বর্মা অবশ্য ভগৎ সিং সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী'র এই ব্যাখ্যা মানতে পারেননি। শিব বর্মা বলেছেন, দিল্লীর আইনসভায় বোমা ছোঁড়ার ঘটনাটি (৮ই এপ্রিল, ১৯২৯ সাল) ভগৎ সিং-এর কোন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফল নয়। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসন / আর্মির কেন্দ্রীয় কমিটিতে

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে, দীর্ঘ আলোচনার পরই দল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে নিছক চমকপ্রদ কিছু করে পাঞ্জাবের যুবকদের জাগাবার জন্যই ভগৎ সিং এই কাজ করেছিলেন, এটা সত্য ঘটনা নয়। এ ছাড়া শিব বর্মা বলেছেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর উপদেশমত পাঁচ হাজার যুবকের ভলান্টিয়ার সংগঠন গড়ার কথা ভগৎ সিং-এর মাধ্যমে দলে কোন সময়ই আলোচিত হয়নি। তাছাড়া এই উপদেশ ভিত্তিক প্রস্তাবটিও ছিল সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বেমানান ও অলীক কল্পনা। কয়েকদিনের জন্য বা কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ার কাজ একরকম। উপযুক্ত অর্থবল থাকলে হয়ত সেটা করা সম্ভব। কিন্তু একটা গোপন বিপ্লবী দলের বৈপ্লবাত্মক কাজের প্রয়োজনে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সুশৃঙ্খল ও উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচ হাজার যুবকের ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়টি যথেষ্ট কঠিন। (সূত্র, 'Selected writings of shaheed Bhagat Singh', By Shib Verma)।

দর্শক হিসেবে সেই সময় কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে ভগৎ সিং-এর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন সরোজ মুখার্জী, তাঁর 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা' গ্রন্থে। "হাওড়াতেই আবার ফকির দা (বর্ধমানের ফকির রায়) হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসন/আর্মির সংগঠনের ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বিনয়কে বলেন। আমরাও সংবাদ পাই ভগৎ সিং এসেছিলেন গোপনে— (১৯২৮ সালের শেষে) কলকাতা কংগ্রেস ও যুব অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা লাহোরে পুলিশের অধিকর্তা স্যান্ডার্সকে হত্যা করে গোপনে চলে গেছেন। ওঁদের সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান জেলার ছেলে বটুকেশ্বর দত্ত। জীবন মাইতি ও অন্যান্যদের কাছে আমরা ঐ সংগঠনের ইস্তেহার পাই··· এগুলোর দিকে বিনয় চৌধুরীরই বেশি যোগসূত্র ছিল। বিনয় রিভলভার- পিস্তল-কার্তুজ জোগাড় করে— আমাদের স্কুল সাথী অমরেশ্বর রায়ের (পরবর্তী যুগে আসানসোল এলাকার বিখ্যাত চিকিৎসক) কাছে ডাম্প করে রাখত। সব কাজই আমাদের একসাথে চলত।"

ঘটনাসূত্রে, কলকাতায় থাকাকালীন অবস্থায় ভগৎ সিং-এর উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ হয় অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদি দলের নবীন বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে। সান্ডার্স হত্যার সাফল্য ও নিখুঁত আত্মগোপনের ফলে, H. S. R. A-দলের যথেষ্ট প্রভাব বাড়ছিল। ওদিকে বাংলার বিপ্লবীদের নবীন অংশের কাছে, প্রবীণ নেতাদের, জেল থেকে মুক্তি পাবার পর, ধীর-স্থির ভাবে সাংগঠনিক বিস্তৃতি গড়ার কাজ ছিল, নাপসন্দ বা অপছন্দ। অসন্তুষ্ট, নবীন বিপ্লবী কর্মীদের নিয়ে গঠিত বিদ্রোহী, অ্যাডভান্স বা রিভল্টিং গ্রুপের অন্যতম নেতা যতীন্দ্রনাথ দাস (যতীন দাস)-এর সঙ্গে ভগৎ সিং-এর সাক্ষাৎ হল। কথাবার্তা শেষে, যতীন দাস রাজী হলেন, ভগৎ সিং-এর অনুরোধে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির অস্ত্রভাণ্ডারকে শক্তিশালী করতে। এ সম্পর্কে বাংলার নেতাদেরও সমর্থন মিলল। দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমার ভাণ্ডার গড়ার কাজে প্রশিক্ষণ দিতে ও সক্রিয়ভাবে দলের কাজে সাহায্য করতে সম্মত হলেন যতীন দাস। পরবর্তীকালে, ভগৎ

সিং-এর প্রস্তাব অনুযায়ী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত করে, H. S. R. A-র কেন্দ্রীয় কর্মস্থল হবে আগ্রা এবং সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপ্লবী কর্মীরা যতীন দাসের কাছে বোমা বানাবার কৌশল শিখতে আসবে, যাতে ভবিষৎ-এ H. S. R. A-এর অস্ত্রভাণ্ডারে অস্ত্রের ঘাটতি না হয়। এর পর ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ সালে যতীন দাস আগ্রায় এলেন এবং পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হল।

কলকাতায় থাকাকালীন, ভগৎ সিং প্রত্যক্ষ করেছিলেন, শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিশালী জোয়ার। প্রায় বিশ হাজার শ্রমিকের জমায়েত থেকে মিছিল এগিয়ে এসেছিল পার্ক সার্কাস ময়দানের দিকে, যেখানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। কংগ্রেস অধিবেশনের স্বেচ্ছাবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জি. ও. সি) সুভাষচন্দ্র বসু ঘোড়ায় চড়ে, . পুরোদস্তুর মিলিটারি পোশাক পরে, সব আয়োজন সামলাচ্ছিলেন। শ্রমিকদের মিছিল আটকে গেল। কিছুটা সংঘর্ষও হল। অবশেষে, নেহরুজীর উদ্যোগে অধিবেশনের গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল, তাদের দর্শক হিসেবে বসবার সুবিধা দিতে। গান্ধীজীও তাদের দুচার কথার আশ্বাসবাণী শুনিয়ে ছিলেন।

এই ঘটনার সূত্রে 'কীর্তি কৃষাণ' পাটির নেতা, কমরেড সোহন সিং জোশের[২৬] সঙ্গেও ভগৎ সিং-এর কথা হল, তাঁদের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে। ভগৎ তাঁকে বললেন, 'আমরা আপনার দলের কর্মসূচী ও কাজকর্মকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কিন্তু আমরা মনে করি, সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা, বিশ্বাস ও সাহস জাগাবার জন্যই বিদেশী শত্রুদের প্রতিটি আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রত্যাঘাত করার এটাই উপযুক্ত সময়।'

ভগৎ সিং অত্যন্ত গোপনে, কলকাতার পলাতক অবস্থান সময়টুকু পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে, দলের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা চালাচ্ছিলেন।

এরই ফাঁকে ভগৎ দেখা করলেন বরানগরে ২৬, যোগেন্দ্র বসাক রোডের 'বসাক বাগানে' (বি. টি. রোডে, বর্তমান পালপাড়া পুলিশ দপ্তরের বিপরীতের রাস্তা) অবস্থানরত তাঁর পিতা, কিষেণ সিং প্রমুখদের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু এবং পাঞ্জাবে ঋষি অরবিন্দ প্রেরিত বিপ্লবী নেতা ও সংগঠক যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যিনি সেই সময় সর্বত্যাগী সন্নাসী, 'নিরালম্ব স্বামী'-রূপে, ভিন্ন পরিচয়ে, সকলের কাছে পরিচিত হয়েছেন। বাড়িটি ছিল বিজয়বসন্তবাবুর (সূত্র, 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়)। কলকাতা অবস্থানের দিন চার-পাঁচেকের মধ্যেই ভগৎ সিংকে শেঠ ছাঁজুরামের বাড়ি ছেড়ে, নতুন আস্তানায় এসে উঠতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে দুর্গাদেবীও লাহোরে ফেরৎ চলে গেছেন।

ভগৎ সিং-এর নতুন আস্তানা ছিল এক হোস্টেল। ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যতীন দাস। একদিন হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়ান অবস্থায় দেখলেন উল্টোদিকের রাস্তায় এক বিহারী গোয়ালা দুধ দোয়াচ্ছে। দীর্ঘসময় ভগৎ-এর পলাতক অবস্থায় কেটেছে। টাটকা কাঁচা দুধ, যেটা খাওয়া, তাঁর সখ, সেটা মেটেনি অনেকদিন। ভগৎ গোয়ালাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম নেবে এই একপাত্র দুধের?' গোয়ালা পুরো একটাকা চেয়ে

বসল। ভগৎ রাজী হয়ে ঐ একপাত্র দুধই শেষ করে ফেললেন। গোয়ালাও নগদ গোটা একটা টাকা পেয়ে খুশি। যতীন দাসও শুনলেন ঘটনাটা। কিছুদিন বাদে তিনি ভুলেও গিয়েছিলেন সেটা। দিল্লীর আইনসভায় বোমা পড়বার পর কাগজে ছবি বেরল ভগৎ সিং-এর। হঠাৎ একদিন সেই বিহারী গোয়ালা যতীন দাসের কাছে এসে হাজির। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে সে যতীন দাসকে ফেরৎ দিল। 'কি ব্যাপার'? গোয়ালা বলল, 'আমার অনেক ভাগ্যি যে এমন একজন লোক আমার দুধের পাত্রে চুমুক দিয়ে দুধ খেয়েছেন। বাবু, কাগজে আপনার এখানে থাকা সেই বাবুটির ছবি বেরিয়েছে। সে তো একজন বড় মানুষ, আপনি তাকে টাকাটা ফেরৎ দেবেন।' পরে ঘটনাটা শুনে, ভগৎ অভিভূত হয়ে বলেছিলেন যে, একজন সাধারণ গোয়ালার মধ্যে যদি এই ভাব জেগে ওঠে, তবে বুঝতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রভাবে সাধারণ মানুষও প্রভাবান্বিত হতে চলেছেন। বৃটিশ রাজশক্তির দিনও শেষ হতে চলল। ভারতকে আর বেশিদিন দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পারবে না।

ফেল্ট-হ্যাট পরা ভগৎ সিং-এর ছবি সর্বসাধাবণ্যে অতি পরিচিত। গবেষক বীরেন্দ্র সিঁধুর মতে সেই প্রসিদ্ধ ছবিটি নাকি ভগৎ সিং-এর কলকাতা অবস্থানকালে তোলা ছবি। ৮ই এপ্রিল ১৯২৯ সালে, দিল্লীর আইনসভায গ্রেপ্তার হবার সময় ভগৎ সিং-এব কাছ থেকে পুলিশ যে রিভলবারটি উদ্ধার করে বলে শোনা যায সেটিও বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলীর দেওয়া অস্ত্র, যা তিনি পেয়েছিলেন কলকাতায় অবস্থান কালে।

কলকাতায ভগৎ সিং-এর আরও চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয বোমা বানাবার কৌশল শেখা সম্পর্কে। কলকাতায সব ঋতুতেই ববফ পাওযা যেত, যা কিনা আগ্রায তখন সহজ ছিল না। যতীন দাস পরিকল্পনা করেন বোমায ব্যবহৃত পলতে যা তখন 'গানকটন'-এ তৈরি হোত সেটা কলকাতাতেই বানান হবে এবং বিপ্লবী কর্মীরা তার কৌশল শিখে নেবে। মধ্য কলকাতার শ্রীমানী মার্কেটের উল্টো দিকে, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমান বিধান সরণী) অবস্থিত 'আর্যসমাজ মন্দির' ভবনের সর্বোচ্চতলে অতি গোপনে বোমা বানাবাব উপকরণ হিসেবে 'গানকটন' তৈরি করার কৌশল শেখাবার এক ব্যবস্থা হয়েছিল যতীন দাসের পরিচালনায়। এই গোপন শিক্ষাশিবিরে ভগৎ সিং-সহ উপস্থিত ছিলেন বিহারের ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, কমলনাথ তেওয়ারী, পাঞ্জাবের বিজযকুমার সিন্‌হা। যতীন দাসের নির্দেশেই পরে বোমার জন্য 'পিকরিক এ্যাসিড' বানাবার মাল মশলা, কলকাতা থেকে কিনে, আগ্রায় পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়। আর 'গানকটন' যায় অতি যত্নে বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে।

কলকাতার সংক্ষিপ্ত অবস্থান ভগৎ সিং-এর কাছে রাজনৈতিক, সামরিক সমস্ত দিক থেকেই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুপরিকল্পিতভাবে, ভগৎ এই স্বল্প সময়ের অবস্থানকে, দলের তৎকালীন ও পরবর্তী প্রয়োজনে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়ে, পলায়ন-পর্বকে উদ্দেশ্যমূলক ও বিপ্লবী কর্মের পরিপূরক করে তোলেন।

সান্ডার্স হত্যার পর সরকারী রিপোর্ট :

১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৮ তারিখে সান্ডার্স হত্যার পরবর্তী সময়ের মধ্যেও পুলিশ ও সরকারী দপ্তর ভগৎ সিং-দের সম্পর্কে কোন হদিশই করতে পারে না। পাঞ্জাব সরকার ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৯ তারিখে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি রিপোর্ট পাঠায় (Letter no.1696 II / police, dated, Lahore 14.1.29)। রিপোর্টের এই বয়ানের মাধ্যমে তৎকালীন অবস্থাটা অনুধাবন করা সহজ হয়। রিপোর্টটি এইরকম :

"১৭ই ডিসেম্বরের টেলিগ্রামের সূত্রে জানান হচ্ছে।

"১৭ই ডিসেম্বর, বেলা ৪-২০ মিনিটে মিঃ সান্ডার্স জেলা পুলিশ দপ্তর থেকে তার মোটর সাইকেলে রওনা হন। অফিসের সামনের রাস্তায় যাবার পথে, গেটের কাছাকাছি আসতেই, হেড কনস্টেবল চনন সিং পেছন থেকে ছুটে এসে তাকে থামিয়ে, তার হাতে অফিসে ভুলে ফেলে আসা চাবিটা দেয়। মিঃ সান্ডার্স চাবিটা নিয়ে গেট পার হয়ে রাস্তায় আসেন। তিনি রাস্তায় আসতেই, সেখানে অপেক্ষারত দুজন লোক তার ওপর গুলি চালায়। গুলিতে আহত হয়ে মিঃ সান্ডার্স মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যায়। ইতিমধ্যে হত্যাকারীরা ছুটে পালাতে থাকে, তখন হেড কনস্টেবল চনন সিং তাদের ধরবার জন্য তাড়া করে। হত্যাকারীরা জেলা পুলিশ দপ্তরের উল্টোদিকে ডি. এ. ভি কলেজের গেটের ভেতর ঢুকে পড়ে। হেড কনস্টেবলকে সেখানে অপেক্ষারত একটি লোক গুলিতে জখম করে দেয়।

"ডি. এ. ভি কলেজের মাঠ ও দালানের মধ্য দিয়ে হত্যাকারীর দল পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে পিস্তলের গুলির আওয়াজকে মোটর সাইকেলের ব্যাক্‌ফায়ার ভেবে দপ্তরের পুলিশেরা ভুল করেছিল। যদিও পরে বিপদ ঘন্টা থেকে পুলিশ বুঝতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ হত্যাকারীদের ধরবার জন্য অনুসন্ধানী পুলিশ দল বার হয়। কিন্তু হত্যাকারীদের নাগাল পায় না।

"নিহত পুলিশ অফিসার মিঃ সান্ডার্স ৩০শে অক্টোবর তারিখে লাহোর রেল স্টেশনে জনতাকে রুখবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন—যখন পুলিশের হাতে লালা লাজপত রায় আহত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। এ ছাড়াও তিনি লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উত্তেজক সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই উত্তেজনা সব চাইতে বেশি ছড়িয়ে পরে নওজওয়ান ভারতসভার ডাকা সভায় যেখানে মূলত ছাত্ররাই অংশ নিয়েছিল।

"এখন অবধি হত্যার সন্দেহে, হত্যার কাজে সাহায্য করা এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ষোলজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচজন—ধনবর্তী, বীরেন্দর, হংসরাজ ভোরা, ধরম ও যশ লাহোর স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সদস্য। বাকী এগারজন নওজওয়ান ভারতসভার সদস্য। এরা হল, আহমেদ-উদ্-দীন, কে-এন সাইগল, এম-এ-মজিদ, শান্তারাম, মীর মহম্মদ আবদুল, লাভুরাম, শান্তরাম পোন্ধা, আমোলক রাম, হরি কৃষেণ শেঠী, কেশিব বান্দু এবং ইউ পি'র রাজ কিশোর সিং।"

সান্ডার্স হত্যার পরবর্তী পলায়ন পর্ব ও আত্মগোপন অবস্থা থেকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে, ভগৎ সিং ও তাঁর দলের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। পুলিশী রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৯ তারিখ অবধি ইংরেজ সরকারী দপ্তর ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু এবং দলনেতা চন্দ্রশেখর আজাদদের সম্পর্কে কোন হদিশই করতে পারেনি। যদিও ইতিমধ্যে ভগৎ সিং কলকাতার কর্মকাণ্ডে প্রকাশ্যে এসেছিলেন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচী তৈরি করার কাজে সক্রিয় ছিলেন।

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের উপযুক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছিল ভগৎ সিং-এর এই সময়ের বিপদজনক কার্যাবলীর মধ্যে। বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতা থেকেও তিনি বিচ্যুত হননি একচুল। তাঁর আত্মগোপন ও পলাতক থাকার সময়টাকে তিনি যথার্থভাবেই ব্যবহার করেছেন দলের কাজে, বিপ্লবের কাজে।

৭

মুক্ত জীবনের শেষ অধ্যায়

(জানুয়ারী ১৯২৯—এপ্রিল ১৯২৯)

কলকাতার পলাতক জীবন শেষ করে, ভগৎ সিং ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের, প্রথম সপ্তাহে, আগ্রায় ফিরে এলেন। আগ্রায় কেন্দ্রীয়ভাবে দলের কাজকর্মের বেশ বড় আয়োজন চলছিল। সান্ডার্স হত্যার পর দলের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিনা রাজনৈতিক ডাকাতিতেই, দলের তহবিলে, দান এবং সাহায্য হিসেবে ভাল টাকা এসেছিল। আগ্রায়, দুটো আস্তানার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটা 'হিং কী মন্ডী'তে, আর একটা 'নমক কী মন্ডী'তে। 'নমক কী মন্ডী'তে বোমা বানাবার কৌশল শেখার জন্য পাঞ্জাব থেকে সুখদেব এবং রাজপুতনা থেকে কুন্দনলালকে ডেকে আনা হল। এখানে রাসায়নিক পদার্থ থেকে 'প্রিক্রিক এ্যাসিড' বানিয়ে সেটাকে 'ক্লোরিপ্রিক্রেট' বানাবার প্রক্রিয়া চলছিল। প্রথমবারের প্রয়াসে তো পরীক্ষার পাত্রগুলো ফেটে গিয়ে সব বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, দ্বিতীয়বারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এল। দিল্লী আইনসভায় ভগৎ সিং-রা যে বোমা ফেলেছিলেন তার মশলা, এইখানেই, জানুয়ারী ১৯২৯ তারিখে বানান হয়েছিল।

যতীন দাস আগ্রা কেন্দ্রে এলেন ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে। এরপর বোমা বানাবার কৌশল শিখতে দলের বিভিন্ন প্রান্তের বাছাইকরা বিপ্লবী কর্মীরা আসতেন। নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, মতামত বিনিময়ও চলত কাজের ফাঁকে। ধীরে ধীরে, আগ্রা কেন্দ্রে, বিপুল পুস্তক ভাণ্ডার গড়ে উঠল। যার মধ্যে উল্লেখ করা চলে, হিন্দী, ইংরাজী বিভিন্ন ভাষার বই যেমন, (1) The History of the Revolutionary

struggle in British India, Open & Secret; (2) The Ideal of Republic; (3) 1914-15 Rising; (4) Ideal of Equality, Liberty, Fraternity; (5) Indian Princes & Revolutionaries (Sarkar's Pamphlet); (6) Turkish Messages to Indian Muslim Rulers; (7) Berlin Committee and the German Plot; (8) Non-Co-operation; (9) Indistinct Ideal of Independence; (10) Failure of non-Co-operation and the Revolutionary Parties; (11) Communist thought; (12) Spiritualism; (13) Advanced Socialist thought; (14) Communist School of thought; (15) Nehru Report; (16) Terrorists and Mass Revolutionaries; (17) Anarchism and Socialism; (18) Communism; (19) Syndicalism and Collectivism; (20) The Revolution and the World Revolution; (21) Modern Breach Loaders ('আধুনিক বন্দুকোঁ,' হিন্দী) (22) Use of Explosives; (23) Monopoly or How Labour is Robbed ইত্যাদি বই।

এসব বই ছাড়াও, আগ্রা কেন্দ্রে, 'ভারতীয ইতিহাসের ভৌগোলিক আধার', 'মখ্‌জনে-উল-অদবিয়াত', 'ভারতীয় সড়কোঁ কি নক্সো', 'বিবাহ্ ঔর প্রেম', 'Eternal city', 'Studies in the Psychology of Sex', 'What never Happened', 'Les Miserables' ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষযের বাইরের সাহিত্যও, দলের কর্মীদের অধ্যয়নের জন্য থাকত। ভগৎ সিং-সহ্, অন্যান্য বিপ্লবী কর্মীদের অধ্যয়নের প্রতি প্রবল আকর্ষণের ফলেই, এই পুস্তকভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল।

আগ্রা কেন্দ্রে দলের নেতা ও কর্মীরা শত আশঙ্কা ও জীবনসংশয়ের মধ্যে প্রতিটি ক্ষণ অতিবাহিত করতেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই সেখানে আনন্দের আসর বসে যেত। চলত হাসি-ঠাট্টা, গান, হৈ চৈ। ভগৎ সিং মহানন্দে সকলকে গান, কবিতা শোনাতেন। আজাদ তার প্রিয় গান গাইতে বলত, 'মা, হমেঁ বিদা দো, জাতে হৌ হম বিজয়কেতু ফহ্‌রানে আজ'। শিবরাম হরি রাজগুরু ছিল হাসি, মজা, চুটকি করার ওস্তাদ। আজাদের কথা মত গান ধরে মাঝপথে থেমে গিয়ে হাসতে হাসতে সে গাইত, 'অভী পুলিশ আতা হৌ, বিজয়কেতু লেকর।' রাজগুরুর আরও সব মজার মজার কথায় আসর জমে উঠত।

একদিন এমনি এক মজলিসে হাসি ঠাট্টা জমেছিল, কারা কিভাবে ধরা পড়বে এবং সেই মজার দৃশ্যটি কেমন হবে, সেই বিষয় নিয়ে।

একজন বলল, 'এই হজরত (রাজগুরু) নির্ঘাৎ ঘুমোন অবস্থায় ধরা পড়বে। ঘুমের বাহাদুরী আছে ওর, চলতে চলতে ঘুমোয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। ধরা পড়ার পর ওর ঘুম ভাঙ্গবে পুলিশ লক-আপে। ঘুম ভাঙলে চোখ কচ্‌লে অবাক হয়ে ও বলবে, সত্যিই ধরা পড়েছি! নাকি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলাম!

সকলের হো হো, হাসির মধ্যে আর একজন বলল, 'বিজয় সিন্‌হা আর ভগৎ সিং কোন সিনেমা হলে ধরা পডবে। তখন ওরা নির্ঘাৎ পুলিশকে বলবে, বেশ তো, ভাল করেছ, আমাদের পাকড়েছ! কিন্তু, এত তাড়ার কি আছে! সিনেমাটাতো পুরো দেখতে দাও!'

আবার একদফা হাসি হল। এবার চন্দ্রশেখর আজাদকে নিয়ে হাসি-মস্করা শুরু হোল। একজন বলল, 'পণ্ডিতজী নির্ঘাৎ বুন্দেলখন্ডের পাহাডে শিকার করতে গিযে কোন রাজভক্ত বিশ্বাসঘাতকের সূত্রে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই শেষে ধরা পডবেন।'

ভগৎ সিং বললেন, 'পণ্ডিতজী, আপনার জন্য কিন্তু একটা দড়িতে হবে না। দুটো দডি চাই। একটা গলার জন্য, আর একটা ভারি পেটের জন্য।'

সকলের হাসির মধ্যে চন্দ্রশেখর আজাদও হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'দেখ্, ওসব ফাঁসি যাবার শখ আমার নেই। তোদের জন্য শুভেচ্ছা রইল। দডি-টডি ওসব তোদের গলায় মানায়। এই দেখছিস সাঙাৎ (পিস্তল)। যতক্ষণ ও আমার সঙ্গে আছে, মায়ের দুধ খাওয়া কোন লাল আছে, যে আমাকে জিন্দা পাকডাবে ?'

এমনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাল্কা চালে অনেক হাসি-মজা চলত আগ্রায়, দলের কেন্দ্রে। ভগৎ সিং এবং তাঁর বিপ্লবী সাথীরা ছিলেন জীবনের প্রতি মায়া মমতা হীন, নির্বিকার, নির্লিপ্ত। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ছিল তাঁদের বিপদের হাতে সঁপে দেওযা। বিপ্লবের সংকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভগৎ সিংরা এমনিভাবেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িযেও জীবনকে সজীব রেখেছিলেন।

দিল্লী আইনসভায় বোমাকাণ্ডের পশ্চাৎপট :

১৯২৮-এর এপ্রিল থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাস জামসেদপুরের টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের এক দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট চলে। অবশেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে টাটা মালিকদের আলোচনা হয় এবং ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে শ্রমিক-মালিক বিরোধের একটা মীমাংসা হয়।

এমনিভাবে বিশের দশকের শেষ দিক থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা দেখা দেয়। পাশাপাশি গড়ে উঠতে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত আন্দোলন। শ্রম ও পুঁজির সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সরকারী দমনমূলক ব্যবস্থা মজবুত করার প্রয়াস শুরু হয়, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে। সাধারণভাবে মানুষের কণ্ঠরোধের সবরকম সরকারী অপপ্রয়াস লাগাম ছাড়া গতিতে নেমে আসে।

এই পশ্চাৎপট সম্পর্কে শিব বর্মা লিখেছেন, "সাধারণভাবে বিশের দশক এবং বিশেষভাবে ১৯২৮-৩০-এর বছরগুলি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গী আন্দোলন, ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধি, চাকরীর শর্তের উন্নতি ইত্যাদি ন্যায়সঙ্গত দাবীতে আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

শ্রমিক, যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট চিন্তার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। একমাত্র ঐ সময়েই সারা দেশ জুড়ে একটা সুসংগঠিত বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন মাথা চাড়া দেয়।...” ('Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh', edited by Shiv Verma, Foreword, B. T. Ranadive)

শিব বর্মা তাঁর 'শহীদ স্মৃতি' গ্রন্থে এই সময়ের কথা উল্লেখ করে ভগৎ সিং-এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এইভাবে :

“...ভগৎ সিংহ দেশের রাজনৈতিক গতিবিধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক থাকত। ১৯২৭-২৮-এর শ্রমিক ধর্মঘটগুলি এবং সেই ধর্মঘটগুলির সঙ্গে অন্য দেশের শ্রমিকদের, আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় প্রদান, ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় শ্রমিকদের ইংলন্ডের শ্রমিকদের দ্বারা অর্থ দিয়ে সাহায্য, ইংরাজ শ্রমিক নেতাদের ভারতে এসে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে কার্যকরীভাবে যোগদান, যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ভারত সরকারের শাসানি, সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বিধানসভার 'ট্রেড ডিসপিউট বিল' ও 'পাব্লিক সেফ্টি বিল' আনা, সমগ্র দেশবাসী ও সব রাজনীতিক দলগুলির একসুরে বিল দুটির বিরোধিতা, ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ভগৎ খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আসছিল। ভগৎ বলত যে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর সেই অভূতপূর্ব জাগরণ দেশের রাজনীতিক জীবনে একটি নূতন মোড়।

“আন্দোলনের আগামী বিপ্লবী সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে ভগৎ প্রায় রোজই সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলত। এর মধ্যেই ভাইসরয় তাঁর ভাষণে ইঙ্গিত দিলেন যে, যদি এসেম্বলি বিল দুটি পাশ না করে, তাহলে তিনি তাঁর বিশেষ অধিকার বলে অর্ডিন্যান্স রূপে সে দুটিকে চালু করে দেবেন। সংবাদপত্রে সেই ভাষণ ছাপা হতেই ভগৎ সিং কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকল। ভগৎ বলল যে ইংরাজ এসেম্বলিতে বিল দুটি এইজন্য পাশ করাতে চায় যাতে তারা দুনিয়াকে বলতে পারে যে, দমনমূলক আইন ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পাশ করেছেন। এরূপ অবস্থায় যদি সেগুলি চালু হয়ই, তাহলে ভাইসরয়ের বিশেষ অধিকার বলেই চালু হোক। ভগৎ বলল, 'ইংরাজ সরকার বয়রা (কালা) হয়ে গিয়েছে। দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে এই বিলগুলির বিরুদ্ধে যে আওয়াজ উঠছে সেগুলি সে শুনতে পাচ্ছে না। তার কান খোলার ব্যবস্থা করতে হবে'।”

কলেজের ছাত্রাবস্থায় লাইব্রেরীয়ান রাজারামজীর মাধ্যমে 'সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' নামে বইটির 'হিংসার মনোবিজ্ঞান' অধ্যায়ে, ফরাসী বিপ্লবী বৈলিয়োঁর একটি বিবৃতি পড়েছিলেন ভগৎ সিং। বৈলিয়োঁ, ফ্রান্সের শাসক শ্রেণীকে, শ্রমিকদের দাবী ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে, আসন্ন রক্তক্ষয়ী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দিতে, ফ্রান্সের বিধানসভায় বোমা ছুঁড়ে বলেছিলেন, 'It takes a loud voice to make a deaf hear' (বধির বা কালাদের শোনাতে হলে খুবই উঁচু গলায় বলার প্রয়োজন হয়)।

দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে ভগৎ সিং-এরও মনে পড়ে গেল বিপ্লবী বৈলিয়োঁর পন্থাপদ্ধতির কথা। দলের সভায় এই পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন ভগৎ।

আসলে যে দুটি বিল আইনে রূপান্তরিত করার অপচেষ্টা চলছিল, তার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল, শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আন্দোলন, বামপন্থী তথা সাম্যবাদী চিন্তা ভাবনার প্রসার ও প্রভাব ভিত্তিক আসন্ন সম্ভাব্য গণঅভ্যুত্থানকে ধ্বংস করা। 'পাবলিক সেফটি বিল'-এর লক্ষ্য ছিল, এ দেশে শ্রমিক আন্দোলন ও সাম্যবাদী কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে আসা বিদেশী, বিশেষ করে বৃটিশ ও অন্যান্য দেশের নেতা, সংগঠক ও প্রচারকদের এ দেশ থেকে তাড়ান। আর 'ট্রেড ডিসপিউট বিল'-এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের বুকে বেড়ে ওঠা শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে, খর্ব করা ও ধ্বংস করা।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভার সমস্ত বিরোধী সদস্যরাই দলমত নির্বিশেষে এই দুটি বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। সংবাদপত্র-সহ জনসাধারণের বিভিন্ন সভা-সমিতিতেও ব্যাপক প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছিল এই বিলের বিরুদ্ধে। কিন্তু এসব প্রতিবাদের উচ্চকণ্ঠস্বর ইংরেজ সরকারের কানে পৌঁছচ্ছিল না। সমস্ত বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজ সরকার ১৯২৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পাবলিক সেফটি বিলটিকে বিধানসভার আলোচনাভুক্ত করেছিল। ২৪শে সেপ্টেম্বর বিধানসভায় এটি অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার আবার এটিকে কিছু সংশোধন করে বিধানসভার গ্রহণের জন্য পেশ করল।

দ্বিতীয় বিল, অর্থাৎ 'ট্রেড ডিসপিউট বিল'টিও প্রথমে উঠেছিল ৪/৯/১৯২৮ তারিখে। এরপর এটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয় এবং পরে কিছু সংশোধনীসহ ২/৪/১৯২৯ তারিখে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট হয়। ৮ই এপ্রিল, ১৯২৯ তারিখে আইনসভায় এ সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

ভগৎ সিং এই সময়টাতে আগ্রায় ছিলেন। তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তিনি দলের কাছে সরকারের এই ঔদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে, সাড়া জাগানো প্রতিবাদ করার প্রস্তাব রাখেন। লাহোরে ছুটে যান বন্ধু সুখদেবের কাছে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। ভগৎ সিং দলের সভায় যেসব প্রস্তাব রাখেন, তার সংক্ষিপ্ত রূপ হল : (১) দিল্লীর আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ করে সরকারের স্বৈরাচারী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করা উচিত, (২) যারা দলের পক্ষ থেকে এই অ্যাকসনে নিযুক্ত হবে তারা বোমা ছোঁড়ার পর পালাবে না। তারা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। এবং বিচারকালে আদালতকে তারা দলের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মসূচী প্রচারের কাজে প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করবে। (৩) ভগৎ সিং-সহ সাথী আর একজনকে দলের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য নির্বাচিত করতে হবে। (সূত্র, 'Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh', by Shib Verma)।

ভগৎ সিং-এর তিনটি প্রস্তাবের প্রথম দুটি কেন্দ্রীয় কমিটিতে উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হবার পর, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু তৃতীয় যে প্রস্তাবে ভগৎ সিং ঐ বোমা ফেলার কাজে নিজের নাম রেখেছিলেন, সেই প্রস্তাব নিয়েই বাধল গণ্ডগোল।

গণ্ডগোলের মূল কারণ স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ দেবার জন্য নিজেদের মধ্যে

প্রতিযোগিতা। জীবন ও মৃত্যুকে ভগৎ সিং, রাজগুরু, বটুকেশ্বর দত্ত-রা পায়ের ভৃত্য বানিয়ে, চিত্তকে ভাবনাহীন করে, নিঃশর্তে দল ও বিপ্লবের কাজে সঁপে দিয়েছিলেন। তাই কাড়াকাড়ি পরে গিয়েছিল অ্যাকসনে অংশ নিয়ে কে সর্বাগ্রে প্রাণবিসর্জন দেবেন, এই নিয়ে। এই মানসিকতার মূল্যায়ন গভীর হৃদয়ানুভূতি ভিন্ন নিছক ইতিহাস চর্চার কর্ম নয়।

H. S. R. A দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই অ্যাকসনে কারা নির্বাচিত হবেন সেই প্রশ্ন বার বার উঠেছে। ভগৎ সিং-এর সঙ্গে কখনো জয়দেব কাপুর, কখনো-বা রাজগুরুর নাম উঠত। বিজয়কুমার সিন্‌হা এবং শিব বর্মা ভগৎ সিং-কে পাঠাবার বিরোধী ছিলেন। তাঁদের কথার যুক্তি ছিল, এই কাজে চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং এঁদের কাউকেই পাঠান উচিত নয়। কারণ, দলের ভবিষ্যৎ-এর জন্য এই দুজন নেতাই অপরিহার্য। এই অ্যাকসনে পাঠিয়ে এঁদের কাউকেই দল হারাতে পারে না। এতে দলের বিরাট ক্ষতি হবে।

বাংলার বর্ধমানের আদি বাসিন্দা, বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত 'কাকোরী' অ্যাকসনের সময় থেকেই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু, ঐ ঘটনার পব দলের কাজে সাময়িক নিষ্ক্রিয়তার সময় তিনি কানপুর ছেড়ে বিহারে চলে গিয়েছিলেন। দলের সক্রিয় কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কখনো ঘনিষ্ঠ হোত, কখনো বা কিছুটা ঢিলে হোত। দল দিল্লী আইনসভায় বোমা ফেলার প্রস্তাব গ্রহণ করার পর, বটুকেশ্বর দত্ত অভিযোগ করলেন যে, তাঁর সঙ্গে দলের এতদিনের ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কেন অ্যাকসনে অংশ নেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। গভীর অভিমানের সঙ্গে বটুকেশ্বর বললেন যে, যদি দল তাঁকে এইভাবে বার বার সক্রিয় কর্মকাণ্ডে অংশ নেবার সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তাহলে তিনিও সংগঠনের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবেন। (সূত্র, 'সিংহাবলোকন', যশপাল)

এইরকম চাপের সামনে দল একসময় প্রায় এই রকম সিদ্ধান্তই নিয়ে নিচ্ছিল যে, ঠিক আছে তাহলে বটুকেশ্বর দত্ত এবং বিজয়কুমার সিন্‌হাকেই নির্বাচন করা হোক এই অ্যাকসনে। কিন্তু রাজগুরু প্রবল প্রতিবাদ করলেন এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে। তাঁর দাবী এই কাজে তিনি কারও চেয়ে কম নন। সান্ডার্স হত্যাকাণ্ডে দল তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল তিনি তা নির্ভুলভাবে পালন করেছিলেন। সান্ডার্সের ওপর তাঁর গুলি ছিল অব্যর্থ। সুতরাং দিল্লী আইনসভায় বোমা ফেলার অ্যাকসনে, উপযুক্ত লোক হিসেবেই, তাঁকে পাঠান হোক ভগৎ সিং-এর সঙ্গে। সাথী হিসেবে এই কাজে নেতৃত্ব দেবার সব-চাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি ভগৎ সিং। রাজগুরু ও ভগৎ সিং জুটিকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হোক। কিন্তু দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ভগৎ সিং কেউই রাজগুরুকে এই কাজে নিযুক্ত করতে রাজী হল না।

রাজগুরু ছুটলেন ঝাঁসী। চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দাবী জানালেন। আজাদ তাঁর সব কথা শুনে ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, 'রাজগুরু, অন্য অ্যাক-শনের সঙ্গে এই বোমা ছোঁড়ার কাজের তফাৎটা বোঝবার চেষ্টা কর। এই

অ্যাকশনের সঙ্গে আদালতে বিবৃতি দেবার প্রশ্ন জড়িত। ইংরাজী ভাষায় তোমার তো দখল নেই বললেই চলে। ধরা পড়বার পর তোমাদের দু'জনকে আলাদা করে রাখবে। সেই অবস্থায় এই বোমা ছোঁড়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য, বিবৃতি দিয়ে ভালভাবে প্রচার করতে না পারলে, সমস্ত অ্যাকশনটার মৌল উদ্দেশ্যই বিফল হয়ে যাবে।'

আজাদের কথা শুনেও রাজগুরু ক্ষান্ত হতে চান না। তিনি বলেন, 'বেশ তো, আপনি ভগৎ সিং-কে বলে আমার জন্যও ইংরাজীতে বিবৃতি লিখিয়ে নিন। আমি সেটা পুরোপুরি মুখস্থ করব। আপনি তা শুনবেন। যদি এতটুকু ভুল হয়, এমনকি কমা, দাঁড়িও যদি সঠিকভাবে না বলতে পারি আমাকে এই অ্যাকশনে পাঠাবেন না।'

এত করেও রাজগুরু চন্দ্রশেখব আজাদকে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত করাতে পারলেন না। রাজগুরু মর্মাহত হয়ে পুনা চলে গেলেন।

ভগৎ সিং-কে বাদ দিয়ে, অন্য দুজনকে, এই অ্যাকশনে পাঠান হচ্ছে ; এই খবর পৌঁছল সুখদেবের কাছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন না, যেখানে এই সিদ্ধান্ত হয়। সুখদেব ছুটে এলেন দিল্লীতে। ভগৎ সিংকে বাদ দিয়ে এই অ্যাকশনের জন্য অন্যদের পাঠানোর সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করলেন তিনি। ভগৎ সিংকে এই কাজে পাঠানোর অর্থ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠান, এই কথা সুখদেব ভাল ভাবেই জানতেন। অথচ দলের মধ্যে সবচাইতে ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় বন্ধু ভগৎকে, সর্বাপেক্ষা যোগ্যব্যক্তি হিসেবে, দলের কাজে, বিপ্লবের কাজে সঁপে দিতে, সুখদেবের হৃদয় কাঁপল না।

ভগৎ সিং-এর প্রতি সুখদেবের মমতা, ভালবাসা ছিল সবচাইতে বেশি। সুখদেবের সকল ভালবাসা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন ভগৎ সিং। সুখদেব আগ্রা বা গোয়ালিয়র এলে তাঁরা পরস্পরকে এমনভাবে আলিঙ্গন করতেন যেন সেখানে আর কেউ নেই। এরপর দুজনে নিভৃতে বসে কথাবার্তাব মধ্য দিয়ে রাত কাবার করে দিতেন। তাঁদের আলোচনা চলত পাঞ্জাবেব বিভিন্ন পার্টির, বিভিন্ন নেতা ও কর্মীদের কার্যকলাপ ইত্যাদি নানান বিষয়ে। টীকা-টিপ্পনী, হাসি, ঠাট্টা চলত গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। এ সত্ত্বেও, আশ্চর্যকাণ্ড, দলের কাজে, বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার সামনে যথাসময়ে আদর্শের জন্য সুখদেব তাঁর এই সবচেযে প্রিয বন্ধুকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠাতে দ্বিধা করল না। (সূত্র, 'শহীদ স্মৃতি'—শিব বর্মা)।

সুখদেব ভগৎ সিং-কে একান্তে ডেকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল, সেই অনুযায়ী তো আইনসভায় বোমা ফেলার জন্য, তোমার অতি অবশ্যই যাবাব কথা ; তাহলে, অন্য সাথীদের নাম স্থির হল কি করে?'

ভগৎ সিং জবাবে বললেন যে, তিনি প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম অগ্রাহ্য হয়েছে। কারণ, দল বলতে চাইছে, সংগঠনের ভবিষ্যৎ-এর জন্য তাঁকে পিছনে রাখাই নাকি জরুরী।

সুখদেব নিজস্ব রুক্ষ এবং কড়া ঢঙে একথার বিরোধিতা করে বললেন, 'এসব বাজে কথা! তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে, আমি বুঝছি, তুমি কোন্ রাস্তায় হাঁটছ! তোমার

দেখছি খুব অহংকার হয়েছে! তুমি নিজেই নিজেকে দলের একমাত্র সহায়, সম্বল এবং অবলম্বন ভাবতে আরম্ভ করেছ, তাই না? তুমি তো দেখছি, সান্যালদাদা (শচীন্দ্রনাথ সান্যাল) আর জয়চন্দ্রজী (জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার), বনে গেছ! তোমার অন্তিম পরিণতি কি হবে জান? তুমিও, এমনি করে, একদিন ভাই পরমানন্দ বনে যাবে। তোমার সম্পর্কেও একদিন এইরকমই রায় শোনানো হবে।'

সুখদেব ১৯১৪-১৫ সালে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়, হাইকোর্টের জজের ভাই পরমানন্দ সম্পর্কে মন্তব্যের উল্লেখ করেছিলেন। জজ তাঁর রায়ে বলেছিলেন, 'ভাই পরমানন্দ এই বিপ্লবী সংগঠন (গদর পার্টি)-এর মাথা এবং সূত্রধর হলেও ব্যক্তিগত ভাবে ভীতু কাপুরুষ। ইনি সংকট সময়ে দলের অন্যদের এগিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন।'

সুখদেবের এ কথা ছিল ভগৎ সিং-এর প্রতি নিদারুণ আঘাত। মরিয়া হয়ে সেই আঘাত হেনেছিলেন প্রাণের বন্ধু সুখদেব, কেবলমাত্র যেমন করে হোক সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে, উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করে, দলের আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মহান উদ্দেশ্যে।

ভগৎ সিং এমনিতেই ছিলেন অতি শান্ত প্রকৃতির মানুষ। রাগ, তেজ, উত্তেজনা তাঁর স্বভাব নয়। বন্ধু সুখদেবের আক্রমণাত্মক কথাবার্তা তিনি চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। সুখদেব কিন্তু এত আক্রমণেও ক্ষান্তি দিলেন না। চূড়ান্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ হেনে বললেন, 'ভাল করে ভেবে দেখ ভগৎ, আসলে তুমি এখন মৃত্যুর সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছ। কারণ জীবনের নানান প্রলোভনের[২৭] হাতছানিতে তুমি মোহগ্রস্ত। আর তাই অজুহাত দাঁড় করাচ্ছ দলের নামে। যেন দলের প্রয়োজনে তোমার বেঁচে থাকা জরুরী। দেখ ভগৎ, তুমি অন্যদের যা খুশি উল্টো-পাল্টা বোঝাতে পার। কিন্তু যা সত্যি তা তুমি আমার কাছে এবং আমিও তোমার কাছে গোপন রাখতে পারি না। আসলে তুমি পিছলে যাবার চেষ্টা করছ!'

অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে ভগৎ সিং চুপচাপ বন্ধু সুখদেবের বিষোদ্গার শুনে যাচ্ছিলেন। কোন কথা বলছিলেন না। কেবল মাঝে মাঝে পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত আক্রমণকারীর চারদিকে পায়চারী করে যাচ্ছিলেন। এবার ক্ষিপ্ত হয়ে ভগৎ বললেন, 'এ্যাসেম্বলীতে বোমা ফেলার কাজে আমি যাবই। কেন্দ্রীয় কমিটিকে আমার নামের প্রস্তাব মানতেই হবে। আর সুখদেব, তুমি আজ যেভাবে আমাকে অপমান করলে, এর জবাব আমি দেব না। কিন্তু দয়া করে, এরপর আর কোনদিন তুমি আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে এসো না।'

ভগৎ সিং-এর অনুরোধে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি আবার বৈঠকে বসল। সুখদেব বসে রইল, এককোণে। একটি কথাও বলল না। ভগৎ সিং-এর জেদের জন্য দলকে তার পূর্বের সিদ্ধান্ত বদল করতে হল। নতুন সিদ্ধান্তে, ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের ওপর আইনসভায় বোমা ফেলার কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল।

এত কাণ্ড করার পেছনে, সুখদেবের একটিই মাত্র অভ্রান্ত যুক্তি ছিল যে, যে উদ্দেশ্যে দল এই অ্যাকশনে নামছে তাকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে সার্থক ও সফলরূপে সম্পন্ন করতে পারবেন দলের একমাত্র যোগ্য নেতা ভগৎ সিং। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেও দলের বৃহত্তর স্বার্থে, বিপ্লবের আদর্শে, সুখদেবকে এই কাজ করতেই হবে। সুখদেবের যুক্তি ছিল, অ্যাকশন হবে, দলের দুজন কর্মীকে বিসর্জনও দিতে হবে, অথচ বিপ্লবী উদ্দেশ্য সফল হবে না ; এ হতে পারে না। তাই সে যেন-তেন-প্রকারেণ, ভগৎ-কে উত্তেজিত করে, তাকে বাধ্য করেছিলেন এই অ্যাকশনে অংশ নিতে। কিন্তু সুখদেব এই সিদ্ধান্তে মনের দিক থেকে বিরাট আঘাত পেলেন। সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সুখদেব রুক্ষ করুণ স্বরে বললেন, 'I have done my duty towards my friend' (আমি আমার বন্ধুর প্রতি আপন দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেছি)।

কাউকে কিছু না বলে বিষন্ন হৃদয়ে সুখদেব সেই দিনই লাহোর চলে গেলেন। শিব বর্মা লিখেছেন, "দুর্গা বৌদিদির কাছে শুনলাম যে পরের দিন সুখদেব যখন লাহোর পৌঁছাল, তখনো তার চোখ খুব ফোলা। আপন প্রাণের বন্ধুকে নিজের উদ্যোগেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে, সে অঝোরে কেঁদেছে। সেদিনটা সে একান্তে থেকেছে। কারও সঙ্গে কথা বলেনি। পুরো ঘটনাটা যখন সে ঘটাল তখন সুখদেব না দেখাল কোন দুর্বলতা, না ফেলল একফোঁটা চোখের জল। কিন্তু, প্রিয় বন্ধু ভগৎ-এর জন্য তাঁর অন্তর কত ব্যাকুল, কতই না বিচলিত হয়েছিল। দলের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য সাধনের জন্য সে তার প্রিয়তম বন্ধুর প্রাণের বাজী লাগিয়েছিল।"

১৯২৯ সালের ৭ই এপ্রিলের দুপুরে সুখদেব অনেক খোঁজাখুঁজি করে, ভগবতীচরণ ভোরাকে খুঁজে বার করলেন। 'ভগৎ সিং-এর সঙ্গে অন্তিমবার দেখা করতে চাও তো আজ রাত্রের গাড়িতেই দিল্লী চলো। বৌদিকেও সঙ্গে নিয়ে নাও' ভগবতীকে বললেন সুখদেব।

ভগবতী ও তাঁর স্ত্রী দুর্গাদেবী তৎক্ষণাৎ রাজী। সুশীলা দিদিও তখন ছিলেন ওঁদের কাছে। তিনিও চললেন সঙ্গে। আর লাহোর থেকে পালাবার পথে ট্রেনযাত্রায় সর্বক্ষণ যে 'লম্বা চাচা, লম্বা চাচা' করে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল, সেই দুর্গাদেবীর শিশুপুত্র, শচীও চলল সঙ্গে। ৮ই এপ্রিল সকালে, এরা সকলে এসে পৌঁছলেন দিল্লী স্টেশনে। কুদ্‌সিয়াবাগে সকলকে অপেক্ষা করতে বলে সুখদেব অন্য দিকে চলে গেলেন।

স্বল্পক্ষণের প্রতীক্ষা শেষে দেখা গেল সুখদেব ভগৎ সিং-কে সঙ্গে নিয়ে হাজির। সকলের মধ্যে কথাবার্তা হল। কিন্তু কি হতে চলেছে সে সব বিষয় নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য হল না। দলের কঠিন অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত সেসব কথা। ভগৎ-এর প্রিয় বস্তু রসগোল্লা আর কমলালেবু। দুর্গাবৌদি আর সুশীলাদিদি ভগৎকে অতি যত্নে দুটো প্রিয় খাদ্যই খাওয়ালেন। অন্তিম বিদায়ের ক্ষণে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, দুজনে ভগৎ-এর কপালে চুন-হলুদের তিলক ও বিপদমুক্তির টীকা লাগিয়ে, পরম স্নেহে বিদায় জানালেন। সকাল ১০-৩০টা নাগাদ, ভগৎ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আইনসভায় বোমাকাণ্ড :

৮ই এপ্রিল, ১৯২৯ তারিখে, দিল্লীর আইনসভায় বোমা ফেলার প্রাক্‌প্রস্তুতি হিসেবে, দলের নির্দেশে দিল্লীর কাশ্মীরী গেটে রামনাথের ফটোর দোকান থেকে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ক'দিন আগে একসঙ্গে, কযেকটা ফটো তুলে আনেন। এই ফটোগুলিই ঘটনার পরে লাহোরের 'বন্দে মাতরম', 'The Hindustan Times' এবং 'Pioneer' সংবাদপত্রগুলিতে যথাক্রমে ১২, ১৮, ও ২০শে এপ্রিলের সংখ্যায ছেপে বার হয়।

বোমাকাণ্ডের প্রস্তুতি হিসেবে দল জয়দেব কাপুরকে দিল্লীর আইনসভায যাতাযাত করে, সব কিছু দেখে শুনে বুঝে নিযে, গোটা প্ল্যান পাকা করার নির্দেশ দেয়। জযদেব হিন্দু-কলেজের অর্থশাস্ত্রের ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিযে দিল্লী আইনসভার লাইব্রেরীতে যাতায়াতের পথ প্রশস্ত করে রাখেন, দিন পনেরো আগে থেকেই। বেশ কয়েকটি অধিবেশনও পর্যবেক্ষণ করেন, দর্শক গ্যালারী থেকে। বোমাকাণ্ডের দিন দুই আগে জয়দেবই ভগৎ সিং-কে আইনসভার ভেতরে নিয়ে গিয়ে সব কিছু দেখিয়ে ও বুঝিয়ে আনেন। ঘটনার দিন, ৮ই এপ্রিল ১৯২৯ তারিখে জয়দেব বিধানসভায় ঢোকার অনুমতি হিসেবে তিনটে পাশের ব্যবস্থা করলেন। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে নিয়ে জয়দেব দর্শকদেব গ্যালারী অবধি পৌঁছে দিয়ে তাদের কাছ থেকে পাশদুটো ফেরৎ নিয়ে নিলেন। পাশগুলি এক কংগ্রেসী এম.এল.এ'র দস্তখতে পাওয়া গিয়েছিল, এইজন্যে বাইরে এসে জয়দেব পাশগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এর কারণ, যাতে গ্রেপ্তার হবার পর তাদের হেফাজত থেকে পাশগুলো পেয়ে পুলিশ ঐ কংগ্রেসী এম.এল.এ-দের না হয়রানি করতে পারে। বিপ্লবীদের পরিকল্পনার দূরদর্শিতা লক্ষণীয়।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের পরনে ছিল খাকী শার্ট ও খাকী হাফপ্যান্ট। ভগৎ সিং-এর গায়ে ছিল নীল রঙের একটা কোট এবং বটুকেশ্বরের গায়ে, হাল্কা নীল রঙের কোট। গ্রেপ্তারের পরের বিবৃতি অনুযায়ী সার্জেন্ট টেরি বলেছেন ভগৎ সিং-এর মাথায় কোন টুপি ছিল না। কিন্তু আদালতে অন্য এক সাক্ষী বলেছেন, ভগৎ-এর মাথায় একটা টুপি ছিল।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত পূর্বপরিকল্পিত এমন একটি স্থান বেছে নিয়ে বসলেন যেখান থেকে সরকারী সদস্যদের আসনগুলি সবচেয়ে কাছে হয় এবং সরাসরি বাধাহীনভাবে দেখা যায়। বোমার নিশানা স্থল নির্বাচনও ছিল এক কঠিন কাজ। কারণ সরকারী দলের নেতা হোম মিনিস্টার জন (মতান্তরে জর্জ) স্যুস্টার এবং বিরোধী দলনেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদের আসনের অবস্থান ছিল কাছাকাছি। জন স্যুস্টারের ওপর বোমা ফেললে তার দ্বারা স্পীকারের আসনে বসা বিটলভাই পটেলেরও ক্ষতি হতে পারত। এইসব কারণে, পরিকল্পনা করা হয়েছিল বোমা ফেলা হবে জন স্যুস্টারের গদী আঁটা চেয়ারের কাঠের তৈরি কাঠামোর পিছন দিকে, যাতে কংগ্রেস বেঞ্চের সদস্যদের ওপর এর কোন প্রতিক্রিয়া না হয়।

দর্শকাসন কানায় কানায় ভর্তি ছিল। ভীড় ঠাসা অধিবেশন কক্ষে 'বিল' গুলির পুনর্বিবেচনার আলোচনা শুরু হল। সরকারী সদস্যরা বক্তৃতা দিয়ে এর সমর্থন জানাতে গিয়ে বললেন, 'এটা অবশ্যই আইনে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভারতের অশিক্ষিত যুবকরা বিদেশী রাশিয়ানদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছে এবং বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার দুরভিসন্ধি করছে', ইত্যাদি। প্রভুভক্ত সদস্যদের বক্তৃতা শুনে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত মুচকি হাসলেন। আলোচনা শেষে যে মুহূর্তে, স্পীকার বিটলভাই পটেল ভোটের ফলাফল ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে, সরকারী পক্ষের পেছনের বেঞ্চ থেকে জোরে বিস্ফোরণ ঘটল। অধিবেশন কক্ষ ধোঁয়ায় ভরে গেল। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত নিজ নিজ সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম বোমাটা ছুঁড়েছেন ভগৎ সিং অব্যর্থ লক্ষ্যে, হোম মিনিস্টার জন স্যুস্টারের কাঠের কৌচের পেছনে। সীট নম্বর ৪বি, ৫, ৩৩ এবং ৩৪এব সক প্যাসেজে। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে অধিবেশন কক্ষের সদস্যরা সাময়িকভাবে বযরা হযে, ভযে, আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বোমাটা ছুঁড়লেন বটুকেশ্বর দত্ত ঠিক ঐ জায়গাটা লক্ষ্য করে। এবার ভয়ে আতঙ্কে যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল প্রাণভয়ে। অধিবেশন কক্ষ ও দর্শকাসন ফাঁকা হয়ে গেল। সাইমন সাহেব ভাইসরয়ের গ্যালাবীতে বসে অধিবেশন দেখছিলেন। সবচাইতে আগে তিনি পালালেন। কিছু সদস্য বাইরে ভাগলেন, কিছু টেবিলের নীচে আশ্রয় নিলেন, কিছু শৌচালয়ে গিয়ে লুকোলেন।

হোম মিনিস্টার স্যাব জন স্যুস্টার স্থাণুবৎ দাঁডিয়ে ছিলেন তার বসার আসনের সামনে। ভগৎ সিং-এর পিস্তল গর্জে উঠল তার দিকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হযে গুলি লাগল ডেস্কে। ভগৎ-এর পরবর্তী গুলি ছুটবাব আগেই আতঙ্কে ডেস্কের তলায় গিযে আত্মরক্ষা করলেন প্রবল ক্ষমতাশালী হোম মিনিস্টার জন স্যুস্টার। ভগৎ-এব পিস্তলে তখনোও ছ'টা গুলি ভর্তি। পকেটেও আটটা গুলি মজুত। কিন্তু ভগৎ আর কারও ওপর গুলি চালালেন না। (যশপাল এইভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, প্রত্যক্ষদর্শী Lt. Gen B.M. Kaul-এর বর্ণনায় পিস্তলের উল্লেখ নেই। আদালতেও পুলিশের এই অভিযোগ টেকে না)।

প্রথম বোমা ছোড়ার পরক্ষণেই, অতি উচ্চকণ্ঠে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত স্লোগান দিলেন :

'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' এবং 'দুনিযার মজদুর এক হও'। স্লোগান দেবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে লেখা লাল রঙের ঘোষণা পত্র[২৮] হলের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন তাঁরা। যে ঘোষণাপত্রে লেখা ছিল, 'দি হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'-র 'নোটিশ'। নোটিশ-টা ছিল ছাপান, কিন্তু তার বক্তব্য বিষয় ছিল টাইপ করা। নোটিশের শেষে সই ছিল, 'বলরাজ', কমাণ্ডার-ইন্-চীফ। টাইপ করা ঘোষণার শেষ অংশে ছিল স্লোগান, 'LONG LIVE THE REVOLUTION'।

আইনসভায় বোমা ছোঁড়ার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বি.এম.কাউল। যিনি পরবর্তী জীবনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত লেফটেনান্ট জেনারেল হন। তাঁর লেখায় ঘটনার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে। লেখাটি এইরকম :

"আমি মাঝেমধ্যে দিল্লীর আইনসভায় যেতাম এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মদন মোহন মালব্য এবং মহম্মদ আলি জিন্না'র মত উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দের সাড়া জাগান বক্তৃতা শুনতাম। একদিন আমি আইনসভায় গেলাম 'পাবলিক সেফটি বিল' নিয়ে বিতর্ক শুনতে। ...প্রবল উত্তেজনায় সেদিন দর্শকাসন পূর্ণ ছিল। মতিলাল নেহরু সবে গা-গরমকরা বক্তৃতা শুরু করেছেন...কিছুক্ষণ বাদেই সভায় গোলমাল আর প্রচণ্ড হাঙ্গামা শুরু হোল। দুজন যুবক, যারা আমার অত্যন্ত কাছেই বসেছিল, যাদের আমি আগে আদৌ চিনতাম না, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। তাদের মধ্যে একজন কোটের মধ্য থেকে এক বাণ্ডিল ছাপান লিফলেট বার করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকল এবং সেই মুহূর্তেই অধিবেশন কক্ষ কাঁপিয়ে পরপর দুটো বোমা পড়ল। একটা ফেলল ভগৎ সিং আর একটা বটুকেশ্বর দত্ত। (এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের এই হিংসাত্মক কাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কি। গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমি শান্তি ও অহিংসায় বিশ্বাসী। কিন্তু সেটা আমি যে কোন মূল্যেই চাই না। পাথরের শান্তি, কবরের শান্তি আমার কাম্য নয়। যেখানে আমাকে কাপুরুষতা ও হিংসার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হবে, আমি হিংসার পক্ষেই রায় দেব। কাপুরুষতার পক্ষে নয়।')

"বোমার শব্দে সভায় চরম অরাজক, বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হোল। ভয়ে, আতঙ্কে লোকেরা যে যেদিক পারল পালাতে থাকল। একজন মেদবহুল সদস্য অতিকষ্টে বেঞ্চের নীচে ঢুকবার চেষ্টা করল। কেউ শৌচালযের দিকে, আশ্রয়ের জন্য ছুটল। কেবলমাত্র দুজন ভারতীয় নেতাকে দেখলাম নির্ভয়ে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এঁরা হলেন স্পীকার বিটলভাই পটেল এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। পণ্ডিতজী তাঁর দলের সদস্যদের অভয় দিয়ে ডাকতে থাকলেন, 'আরে ভাই, ভাগতে কিঁউ হো! ইয়ে তো কই আপনে হি আদমি মালুম হোতে হ্যায়' (আরে ভাই, ভাগছ কেন! বোমা ছোঁড়া ছেলেদের দেখে তো মনে হচ্ছে আমাদের নিজেদের লোক।)

"অনেক লোকের সঙ্গে আমিও সন্দেহ বশে আটকে পড়লাম। কিন্তু, ভগৎ সিং এবং বি.কে দত্ত, পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল। যার ফলে, নির্দোষ লোকেরা হয়রানির হাত থেকে বাঁচল। পুলিশ যখন এই দুই বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে এল, তখন তারা চীৎকার করে স্লোগান দিলেন 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' এবং জনতার মাঝখান দিয়ে ব্যাঘ্রতেজে, নির্ভীক, বীরপদক্ষেপে, এগিয়ে গেলেন। আমি গর্বের সঙ্গে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাদের ছোঁড়া বোমায় সারা দেশের ভারতীয়রা কেঁপে উঠেছিল। (ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান এই প্রথম সর্বসমক্ষে উচ্চারিত হল, এদের কণ্ঠে। এরপর সারা দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে এই স্লোগান হয়েছিল, রণহুংকার)।" ('Untold Story'-Lt Gen. B. M. Kaul)।

এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অন্যতম নেতা বটুকেশ্বর দত্ত, স্বাধীনোত্তর ভারতে শেষজীবনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যখন হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁর সেই শেষ সময়ে (জুলাই, ১৯৬৫), লেঃ জেনারেল বি. এম. কাউল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য তিনি সামান্য কিছু করতে পারেন

কিনা। বৃদ্ধ বটুকেশ্বর দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন, 'না, না, আমি কারও কাছে নিজের জন্য কিছু চাই না।' বলতে বলতে বৃদ্ধ বটুকেশ্বর দত্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। চোখ এসেছিল জলে ভরে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, যাঁদের জীবনের বিনিময়ে দেশ আজাদী পেয়েছে, শেষজীবনে তাঁদেরই অসহায়ভাবে এই স্বাধীন ভারতে চোখের জল ফেলে বিদায় নিতে হয়েছে অবহেলা ও অবজ্ঞার মধ্যে। জুলাই ১৯৬৫ সালে মৃত্যুর পর, স্বাধীন ভারতের দয়ালু সরকার, বটুকেশ্বর দত্তকে পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে তাঁর সহযোদ্ধা শহীদ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর পাশে তাঁকে সমাহিত করেছিলেন। হয়ত এটাই তাঁর জীবনে না হোক, মরণে সবচাইতে বড় পাওয়া।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের গ্রেপ্তার বরণ :

আচমকা খোদ দিল্লীর বুকে, আইনসভায় এমন বোমা পড়ার ঘটনায় ইংরেজ পুলিশ অবধি হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। গ্যালারী ফাঁকা হয়ে গেছে। সভার সদস্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। ফাঁকা গ্যালারীতে দুজন যুবক নির্ভীক অচঞ্চল ভঙ্গিতে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। ইচ্ছে থাকলে, তাঁরা অতি সহজেই বোমাকাণ্ডের পর, পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু, তাঁরা পালাবার বা আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করেননি। এহেন অসমসাহসী দুই বিপ্লবীর দিকে এগিয়ে যেতে পুলিশেরও ভয় হচ্ছিল। ইংরেজ পুলিশ সার্জেন্ট টেরী দূর থেকে এঁদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'এইসব কাজ কি তোমরা করেছ?'

ভগৎ সিং মুচকি হাসলেন। গুলিভরা পিস্তল তখনো তাঁর হাতে। চাইলে ঐ ইংরেজ সার্জেন্টকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু ভগৎ-এর লড়াই ব্যক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। আইনসভায় স্যার জর্জ স্যুস্টারের বিরুদ্ধে ভগৎ-এর গুলি ছুটেছিল, কারণ সেই হোম মিনিস্টার বৃটিশ দমন-পীড়ন ব্যবস্থার প্রতীকী প্রতিনিধি ছিল।

এবার সার্জেন্ট টেরীর সঙ্গে পুলিশ বাহিনী নিয়ে যোগ দিতে এল আর এক পুলিশ অফিসার, ইনস্পেক্টর মিঃ জনসন। আসফ আলী, যিনি স্বাধীন ভারতে উড়িষ্যার গর্ভর্নর্ হয়েছিলেন, যিনি বটুকেশ্বর দত্তের হয়ে আদালতে আইনজীবী হিসেবে লড়াই করেছিলেন, তাঁর একটি লেখায় এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলেছেন যে, ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর সন্ধানে যেতে যেতে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, পুলিশ অফিসার মিঃ জনসনকে উদ্দেশ্য করে ভগৎ সিং বলছেন, 'Don't worry, we shall tell the whole world we did it'. (চিন্তা কোর না। আমরা সারা দুনিয়ার সামনে বলব যে এই কাজ আমরাই করেছি)।

ভগৎ ও বটুকেশ্বর আত্মসমর্পণ করলেন। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাদের সাড়ম্বরে গ্রেপ্তার করল। তারপর অতি সন্তর্পণে বিশাল পুলিশী বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তাদের আলাদা আলাদা গাড়িতে তুলল। গাড়ি চলল, চাঁদনী চকের কোতয়ালীর দিকে।

ইতিমধ্যে সর্বত্র সরকারী বার্তা পৌঁছে গেল। ঘটনার খবর দিয়ে লন্ডনে টেলিগ্রাম

গেল (নং ১৩২০০, তাং ৮/৪/২৯)। কলকাতা থেকে Special Anti Terrorist Police চেয়ে সরকারী টেলিগ্রাম গেল। Statesman পত্রিকার সাংবাদিক লালা দুর্গাদাস সমস্ত টেলিগ্রাম সরকারী ব্যবস্থায় রিজার্ভ দেখে লন্ডন দপ্তরের মাধ্যমে কলকাতায় খবর পাঠালেন। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরল। সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন ছেয়ে গেল।

৮

কারান্তরালের জীবন সংগ্রাম

(৮ই এপ্রিল ১৯২৯—৮ই অক্টোবর ১৯৩০)

মাত্র বাইশ বছরের জীবদ্দশায়, ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল থেকে, ভগৎ সিং তাঁর এ যাবৎকালের মুক্ত জীবনযাত্রায় স্বেচ্ছা অবসর ডেকে আনলেন। দেশের স্বাধীনতা, বিপ্লব ও শোষণমুক্ত সামাজিক সাম্য ভিত্তিক সমাজ গঠনের উজ্জ্বল আশা নিয়ে, ভগৎ সিং সজ্ঞানে, সচেতনভাবে নিজের স্বাভাবিক মুক্ত জীবনে ইতি টেনে, নিজেকে কারান্তরালে ঠেলে দিলেন।

কিন্তু ভগৎ সিং-এর স্তরের বিপ্লবীদের কাছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতায় অর্থপূর্ণ। জেলের জীবন বলেই ভগৎ সিং তাঁর জীবনকে সামাজিক জীবন বোধের দায়িত্ব কর্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। কারান্তরালের দিনগুলিও তাই বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর কাছে বিপ্লবী জীবন সংগ্রামেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ।

১৯২৯-এর ৮ই এপ্রিল, গ্রেপ্তারের পর ভগৎ সিং-কে দিল্লীর চাঁদনীচকের কোতোয়ালীতে রাখা হয়েছিল। এরপর ১৬ই এপ্রিল নাগাদ তাঁকে তুলে আনা হোল দিল্লীর পুরোনো সেক্রেটারিয়টের কাছে সিভিল লাইনস পুলিশ স্টেশনে।

এদিকে পুলিশ সুখদেবের লাহোরের বোমা বানাবার গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে একে একে সুখদেব, জয়গোপাল এবং কিশোরীলালকে গ্রেপ্তার করল। 'জয়গোপাল অপরাধ স্বীকার করল। তারপব হংসরাজ ভোরাও স্বীকারোক্তি দিল। এর ফলে আরও গ্রেপ্তার, আরও স্বীকারোক্তির ঘটনা ঘটল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিহার, যুক্ত-প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে দলের বেশিরভাগ নেতা ও কর্মীই পুলিশের হাতে এসে গেল। কিছু সংগঠক আত্মগোপন করতে পারল। আমিও আত্মগোপনের প্রস্তুতিপর্বেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম।' ('Bhagat Singh and his Comrades', by Ajoy Ghosh, Communist Party Publication)।

এরই মধ্যে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে দিল্লীর সিভিল লাইনস পুলিশ স্টেশন থেকে খোদ দিল্লী জেলে পাঠান হোল। পুলিশ অনেক কসরৎ করল এঁদের কাছ থেকে বিবৃতি আদায় করতে। কিন্তু ব্যর্থ হোল। ভগৎ-এর বাবা কিষেণ সিং এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ দিল্লীতে এসে ছেলের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হোল। পুলিশ তাঁকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিল না।

জেলে ভগৎ সিং-এর সাহস ও মনোবল ছিল অতি উঁচু পর্দায়। ইংরেজ প্রশাসনের সব কিছুকেই তিনি তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করছিলেন। আদালতী কারবারটা তাঁর কাছে ছিল যেন একটা সাজান নাটক। আইনজীবিদের সংগঠন যেহেতু তাঁর এবং দলের চিন্তা, আদর্শ ও জীবনধারার বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল, সেই কারণে তিনি তাঁর বাবাকে তাঁর সপক্ষে উকিল নিযোগ করায় আপত্তি জানিয়েছিলেন। ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৯ তারিখের জেল থেকে পাঠান এক চিঠিতে ভগৎ লিখলেন :

"আমি এখন জেল বন্দী। শুনতে পাচ্ছি জেলের মধ্যেই আগামী ৭ই মে কেস শুরু হবে। আশা করা যায় মাসখানেকের মধ্যেই সকলে মিলে গোটা নাটকটা শেষ করে দেবে। দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি শুনেছি আপনি এখানে এসেছিলেন এবং আমার মামলায় একজন উকিল দাঁড করাবার জন্য কথাবার্তাও বলেছেন। আমার সঙ্গে দেখা করারও চেষ্টা করেছেন বলে শুনেছি। কিন্তু তখন ঠিকমত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

"আপনি যেদিন আসবেন সেদিনই দেখা করার ব্যবস্থা করা যাবে। উকিল, ব্যারিস্টার ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই আমার মামলায়। আপনি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাহলে দয়া করে একাই আসবেন। মাকে আনবেন না। তিনি অনাবশ্যক কান্নাকাটি করবেন। যদি সম্ভব হয়, আমার জন্য কিছু ভাল উপন্যাস আনবেন।" (উর্দুভাষায় লেখা এই চিঠি যায়, কিষেণ সিং, ইনসিওরেন্স এজেন্ট C/o, কংগ্রেস কমিটি, ব্রাডলৌ হল, লাহোর এই ঠিকানায়)।

কিন্তু পুলিশ সহজে পিতা-পুত্রেব সাক্ষাৎ হতে দেযনি। বটুকেশ্বর দত্তের উকিল আসফ আলীর (স্বাধীন ভারতে উডিষ্যার গভর্নর্ হন) মাধ্যমে পিটিসন পাঠিয়ে অবশেষে ৪ঠা মে, ১৯২৯ তারিখে, জেলারের সামনে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি মেলে তাঁর বাবা কিষেণ সিং-এর। সামান্য সময়ে পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের সামনে কথাবার্তার মধ্যে ভগৎ বাবাকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাঁর মামলায় উকিল নিয়োগ করে অর্থের অপচয় না করেন। কিন্তু পিতৃহৃদয় আদর্শবান পুত্রের এই অনুরোধ রক্ষা করার অক্ষমতা প্রকাশ করে। পরিবারের স্বার্থে এই আইনী সাহায্য গ্রহণের ওপর কিষেণ সিং জোর দেন।

জেলার তাঁদের কথাবার্তার মাঝপথেই জোর করে সাক্ষাৎকারে ইতি টেনে দেয়।

আইনসভায় বোমাকাণ্ডের মামলা :

৭ই মে, ১৯২৯ তারিখে দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট জেলের ভেতর এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের (মিঃ এফ্-বি-পুল) আদালতে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের মামলার শুনানী শুরু হয়। সেই সময়কার কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছে Hindustan Times পত্রিকা। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি থেকে জেল অবধি এবং জেল অভিমুখী সমস্ত রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সি.আই.ডি'র লোকেরা চারধারে কড়া নজরদারী রাখে। জেলের চৌহদ্দীর চারদিকেও বসে সতর্ক প্রহরা। আদালতের প্রবেশ পথে

সকলকেই পুলিশী তল্লাশী পার হতে হয়। সংবাদপত্রের লোকেরাও এই তল্লাশী থেকে বাদ যান না।

আদালত কক্ষ কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায়। ভগৎ সিং-এর বাবা কিষেণ সিং, কিষেণ সিং-এর মা এবং বিপ্লবী সর্দার অজিত সিং-এর স্ত্রীও আদালত কক্ষে হাজির হন। দুজন শিক্ষানবীশ ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত থাকেন মামলার দর্শক হিসেবে। অভিযুক্তদের পক্ষের উকিল হিসেবে হাজির হন আসফ আলী এবং সরকারী পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আর. বি. সুরজ নারায়ণ। আসফ আলী সাহেবের স্ত্রীও দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। সকাল ৯-৫০ মিনিটে, বিচারক মিঃ এফ্.বি.পুল আদালত কক্ষে এসে পৌঁছান।

এর কিছুক্ষণ বাদেই, সকাল ১০-১০ মিনিটে, ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে আদালত কক্ষে নিয়ে আসা হয়। আদালতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ভগৎ সিং উচ্চস্বরে স্লোগান দিতে থাকেন, 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, Long live Revolution' । আর পাশাপাশি বটুকেশ্বর দত্তও স্লোগান দেন, 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, Down with Imperialism'। আদালত কক্ষে এই আচমকা স্লোগানে সাড়া পড়ে যায়। বিচারক মিঃ পুল পুলিশকে আদেশ দেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বরের হাতে হাতকড়া পরাতে। হাতকড়া পরিয়ে তাঁদের লোহার গরাদের মধ্যে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়, পুলিশ ও সি. আই. ডি-র লোকেদের কড়া প্রহরায়। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বরকে দেখা যায় সহাস্যমুখে নিরুদ্বেগে বসে থাকতে।

আদালতের কাজ শুরু হয়। পরপর এগারোজন সরকারী পক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি। বিরতি পর্বে, পুলিশ অফিসারদের সমক্ষে, ভগৎ সিং-এর বাবা কিষেণ সিং, তাঁর মা, অজিত সিং-এর স্ত্রী এঁদের ভগৎ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হয়। ভগৎ কথাসূত্রে বলেন, 'ইংরেজ সরকার আমাকে ফাঁসিতে লটকাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তোমরা যেন এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোর না।'

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর, আদালত পুনরায় চালু হলে, ভগৎ বিচারকের কাছে দাবী করেন, মীরাট কেসের আসামীদের যেমন পত্র পত্রিকা পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাঁদেরও যেন সেই সুযোগ দেওয়া হয়। বিচারক ভগৎ-এর দাবী নাকচ করে দেন। এরপর আদালতের কাজ শেষ হয় বেলা ৪-১০ মিনিটে।

পরদিন, ৮ই মে, ১৯২৯ তারিখে পুনরায় সকাল ১০-২০ মিনিটে আদালতের কাজ শুরু হয়। একইভাবে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তরা উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দেন। তারপর, সরকারী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর্ব। সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব শেষে, বিচারক জিজ্ঞাসা করেন, যে আসামীরা কোন বিবৃতি দেবেন কিনা। ভগৎ ও বটুকেশ্বর তাদের অসম্মতি জানিয়ে দেন। এবার বিচারক ভগৎ-কে প্রশ্ন করেন, 'তুমি আদালত কক্ষে ঢুকেই স্লোগান দিলে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। এর অর্থ কি? এর সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কই বা কি?

'বিপ্লব বলতে কি বোঝায়' ?

ভগৎ সিং-এর সেদিনের জবাব এক ঐতিহাসিক বিষয়। ভগৎ বললেন, "বিপ্লব

মানে রক্তক্ষয়ী হানাহানি নয়। বিপ্লবের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা মেটাবারও সম্পর্ক নেই। বিপ্লবের অর্থে বোমা বা পিস্তলের চর্চাও বোঝায় না। 'বিপ্লব' এই কথাটার দ্বারা আমরা এটাই বোঝাতে চাই যে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, যা কিনা জ্বলন্তরূপে অন্যায়ের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এই সমাজের যারা মূল ভিত্তি, যাদের শ্রমে সমাজের সব কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, সেই খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমকে শোষণ করা হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণী শোষিত হচ্ছে শাসকের হাতে। মৌলিক অধিকার থেকে এই সমাজে তারা বঞ্চিত। ...অথচ, সমাজের যারা পরগাছা শ্রেণী, সেই পুঁজিপতি, শোষক লুটেরার দল, তাদেব স্ফূর্তির জন্য যথেচ্ছ টাকা ওড়াচ্ছে। এই ভযঙ্কর বৈষম্য যা কিনা অন্যায়ের শক্তির জোবে সমাজের ওপর চাপিয়ে রাখা হয়েছে, তা অবশ্যম্ভাবী রূপে এক চরম বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ ডেকে আনবে। বর্তমান বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারবে না। এটা পরিষ্কার বোঝার সময় এসেছে যে, শোষক শ্রেণীর যথেচ্ছ শোষণ ও স্ফূর্তির এই শোষণ ব্যবস্থা একটা আগ্নেয়গিরির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে।

"মানব সভ্যতার এই সৌধ, এই মানব সমাজকে, যদি যথাসময়ে রক্ষা করা না যায় তাহলে এটা খান খান হয়ে ভেঙে পডবে। এই কারণেই বর্তমান সমাজের আমূল পরিবর্তন, তথা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। আর এই প্রযোজনের গুরুত্ব যারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, তাদের ওপরই দায়িত্ব বর্তাবে গোটা সমাজকে পুনর্গঠিত করে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার। যতদিন না এই কাজ সম্পন্ন হয়, যতদিন না মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয়, যতদিন না এক রাষ্ট্রের দ্বারা আর এক রাষ্ট্র এবং জাতির সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধ হয়, ততদিন সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে আজকের যে চরম দুঃখ, দুর্দশা এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। আর এই কাজটা সুসম্পন্ন না করেই যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলা এবং বিশ্বশান্তিব নয়া যুগবার্তার ঘোষণা করার অর্থ খোলাখুলি, নগ্ন ভণ্ডামি।"

সমগ্র দুনিয়ার মানবসমাজ, আজকের বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, ভগৎ সিং-এর এই কথাগুলি, ঋষি-প্রতীম ভবিষ্যৎবাণীব মতোই, সত্য বলে, উপলব্ধি করতে পারছে। মাত্র বাইশ বছরের এক তরুণ যুবক আদালতে দাঁড়িয়ে দীপ্তকণ্ঠে এই সত্যের ঘোষণা করেছিলেন, আজ (১৯৯৬ সাল) থেকে ৬৭ বছর আগে (১৯২৯ সালে)। ভগৎ সিং-এর যোগ্য সাথী শিব বর্মা তাই ভগৎ-এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সঠিকভাবেই বলেছেন :

"সাধারণ মানুষ জানে না, ভগৎ সিং সত্যিই কি ছিলেন। লোকেরা এইটুকুই কেবল জানে যে ভগৎ সিং একজন বীর ছিলেন। তিনি লালা লাজপত রায়ের হত্যার বদলা নিয়েছিলেন। দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটা বোমা ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু ভগৎ সিং যে কোন উচ্চস্তরের চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবী, এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এসত্য অনেকেই জানে না।" ('Selected writings of Shaheed Bhagat Singh', edited by Shiv Verma)।

এরপর, নিম্নআদালত থেকে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে ফৌজদারি করে, বা দায়রায় সোপরদ্দ করে, বিচারের জন্য পাঠান হোল। দিল্লীর দায়রা বিচারক বা সেসন জাজের আদালতে বিচার শুরু হোল।

৪ঠা জুন, ১৯২৯ তারিখে সেসন জাজ মিঃ লিয়োনাই মিডল্টনের আদালতে শুনানীর জন্য আসামীদের আনা হোল। ইতিমধ্যে নিম্ন আদালতে এঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (Indian Penal Code) ৩০৭ নং ধারা (Attempt to murder) এবং বিস্ফোরক বিষয় সংক্রান্ত আইনের (Explosive Substance Act) ৩নং ধারায় হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ বা চার্জ গঠিত হয়ে গেছে। সরকারী সাক্ষী-সাবুদ পর্ব শেষ হবার পর এবাব সেই সুবর্ণ সুযোগের মুহূর্ত হাজির হল। ভগৎ সিং-কে দলের নীতি ও কর্মসূচী অনুযায়ী এবার আদালতের মঞ্চকে বিপ্লবী প্রচারের কাজে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। আদালতে তাদের কাজের সমর্থনে একটি বিবৃতি দিতে হবে। দিবা-রাত্র কঠোর পরিশ্রম করে ভগৎ সিং ইংরাজী ভাষায় তাঁর এই ঐতিহাসিক বিবৃতিটি প্রস্তুত করলেন। এটি কেবল আদালতে পেশ করা সাধারণ বিবৃতি নয়। এটি তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত একটি যুগান্তকারী নীতি সংক্রান্ত দলিল। বিবৃতিটি এতই হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল যে আইনজীবী মিঃ আসফ আলী যখন ভগৎ সিং-এর পক্ষে এটি আদালতে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন একসময় বিচারকের পরামর্শদাতা এ্যাসেসরদেরও চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

৬ই জুন, ১৯২৯ তারিখে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের পক্ষে আদালতে এই বিবৃতি পেশ করেন আইনজীবী মিঃ আসফ আলী। বিবৃতিটির কিছু অংশ : "আমাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি আমাদের আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া কর্তব্য।

"এই প্রসঙ্গে নিম্নের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে :

"১। আইনসভাকক্ষে কি বোমাগুলি নিক্ষেপ করা হয়েছিল? হয়ে থাকলে, তার উদ্দেশ্য কি ছিল?

"২। নিম্ন আদালতের তৈয়ারি অভিযোগগুলি কি সঠিক অথবা ভুল?

"প্রথম প্রশ্নের প্রথমার্ধের উত্তরে আমরা স্বীকৃতি সূচক উত্তরই দেব। কিন্তু সাক্ষ্যদানের সময় তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ নির্জলা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেহেতু ঘটনার দায়-দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করছি না, তাই এই বিবৃতির মাধ্যমে যথার্থ সত্য কি সেটা উদ্ঘাটিত হোক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সার্জেন্ট টেরির সাক্ষ্যে যে কথা বলা হয়েছে যে, সে গ্রেপ্তারের সময় আমাদের একজনের কাছ থেকে পিস্তল উদ্ধার করেছে, এটা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ আত্মসমর্পণের সময় আমাদের কারও কাছেই পিস্তল ছিল না।...

"প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয়ার্ধের উত্তরে আমরা বাধ্য হব, এ সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত বক্তব্য রাখতে। এর কারণ, বর্তমানে এই বোমা নিক্ষেপের যে ঘটনা ঐতিহাসিক রূপ নিয়েছে,

তার পশ্চাৎ-এ কি উদ্দেশ্য এবং কি পারিপার্শ্বিক অবস্থা কাজ করছে তার একটা সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থিত করা দরকার।

"কিছু পুলিশ অফিসার জেলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বলেছেন যে, ভাইসরয় (বড়লাট) নাকি কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বোমা নিক্ষেপের এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি নয় ; এর উদ্দেশ্য সমগ্র প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। এই কথাটা শুনেই আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে, বোমা নিক্ষেপের ঘটনার মূল্যায়ন যথার্থই হয়েছে।

"আমাদের মানুষের প্রতি ভালবাসা কারো চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। আমরা কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা হিংসার দ্বারা পরিচালিত হই না। সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে আমরা মানুষের জীবনকে মূল্যবান ও পবিত্র মনে করি।

"মেকী-সমাজতন্ত্রী দেওয়ান চমনলাল আমাদের সম্পর্কে কুৎসা করে বলেছেন যে, আমরা নাকি চরম অপরাধী এবং কাপুরুষোচিত আক্রমণকারী, অত্যাচারী এবং দেশের কলঙ্ক। এটা সম্পূর্ণ ভুল। লাহোর থেকে প্রকাশিত 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় আমাদের সম্পর্কে 'পাগল', 'উন্মাদ' এসব কথা লেখা হয়েছে। হয়ত বা অন্যরাও এইরকম ভুল ভাবতে পারেন। কিন্তু এইসব ধারণা এবং ভাবনা চিন্তা পুরোপুরি মিথ্যা।

"আমরা সবিনয়ে বলি যে, আমরা এইসব ভুল, বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার উপযুক্ত নই। আমরা তেমন বড় কেউ নই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা, তার অতীত ইতিহাস ও তার মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ দেবার কাজে নিয়োজিত মনযোগী ও আগ্রহী শিক্ষার্থী। সামান্য ছাত্র মাত্র। কিন্তু, আমরা ছল-চাতুরী এবং ভণ্ডামীকে ঘৃণা করি।

"এ দেশে জন্মলগ্ন থেকেই ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র তার অকর্মণ্যতা, অযোগ্যতাকেই জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি সুদূর প্রসারী জনবিরোধী ক্ষতিকারক দুষ্কর্মের আখড়াতেও পরিণত হয়েছে। বাস্তবিকভাবে, আমাদের প্রতিবাদ, এই জনবিরোধী শোষণমূলক ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে আমরা যতই বিচার-বিবেচনা করেছি, ততই আমাদের গভীর উপলব্ধি ঘটেছে যে, এই প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে ভারতকে এক দীন, হীন, অসহায় জাতির দেশ হিসেবে উপস্থিত করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যেই কাজ করে চলেছে। আসলে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সম্পন্ন নিষ্পেষণকারী এই প্রতিষ্ঠানটি দায়িত্বহীন ও স্বৈরাচারী ক্ষমতার প্রতীক। দেশের জনপ্রতিনিধিরা বহুবার জাতীয় স্বার্থের দাবীপত্র পেশ করেছে এই প্রতিষ্ঠানটির কাছে। কিন্তু সেই সব দাবীপত্রের অন্তিম পরিণতি ও স্থান হয়েছে বাজে কাগজের ঝুড়িতে।…

"বড়লাটের কার্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য স্বর্গীয় এস. আর. দাশ তার ছেলের কাছে লেখা চিঠিতে ঠিকই বলেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের সুখ-নিদ্রা ভাঙাতে হলে বোমা বিস্ফোরণই প্রয়োজন। দিল্লীর আইনসভায় বোমা ফেলার কর্মকাণ্ডে আমরা এই প্রয়োজনের

কথা স্মরণে রেখেছি। শ্রমিক সাধারণের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ প্রদর্শন করার জন্যও আমরা এ কাজ করেছি। এই সব অসহায়, মূক মানুষের মর্মান্তিক ক্লেশ ব্যক্ত করার, আর কোন পথ খোলা ছিল না। আমাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল 'বধিরকে শোনান', শুনতে বাধ্য করা।...আমরা কেবল 'বিপদ সংকেত' দেখিয়েছি। আসন্ন ভয়ঙ্কর দিনগুলিকে যারা দেখতে পারছে না, অথচ বেপরোয়া ভাবে ছুটে চলেছে, তাদের জন্য এটা আমাদের সতর্কবার্তা।

" 'কাল্পনিক অহিংসা' সম্পর্কে আজকের দিনের নওজওয়ানরা সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। আমরা এই বোমাকাণ্ডের মাধ্যমে সেই 'কাল্পনিক অহিংসা'ব যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করেছি মাত্র।...

"নিছক আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে যে বলপ্রয়োগ করা হয়, তাকেই 'হিংসা' বলা হয়। এক্ষেত্রে, 'হিংসা' নীতিগতভাবে অন্যায বা অনুচিত। কিন্তু, যখন কোন ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্য সাধনে এর ব্যবহার করা হয় তখন সে কাজ নৈতিক দিক থেকে যুক্তিসম্মত ও সমর্থন-যোগ্য। যে কোন ভাবেই হোক বলপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া উচিত, এহেন চিন্তা কাল্পনিক ও অবাস্তব। আজ সারা দেশে যে নতুন বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম শুরু হয়েছে, যার শুভ আগমনের শুভ-সংবাদ শুনিয়েছি আমরা, সেই সংগ্রাম ও আন্দোলনের নৈতিক ও আদর্শগত প্রেরণা এসেছে, গুরু গোবিন্দ সিং, শিবাজী, কামাল পাশা, রিজা খান, ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, লাফায়েৎ এবং লেনিনের মত মানুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

"যেহেতু, এদেশের বিদেশী সরকার এবং ভারতীয় জননেতা উভযেই দেশের বুকে গড়ে ওঠা নয়াজাগরণ ও সশস্ত্র সংগ্রামের অস্তিত্ব সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে আছেন, সেই কারণেই, আমরা এটা উচিৎ মনে কবেছি যে, একটা যোগ্য সতর্কবার্তা ঘোষণা করা প্রয়োজন, যেটা এদের কানে পৌঁছবে।

"এতক্ষণ আমরা এই বোমাকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেছি। এবার আমাদের এই কাজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সংজ্ঞা নির্ণয় করব।

"ব্যক্তিগত ভাবে কারও প্রতি ক্রোধ বা বিদ্বেষ বশত দিল্লী আইনসভায় বোমা ফেলা হয়নি। যারা এই বোমাকাণ্ডে সামান্যতম আঘাতও পেয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ, রাগ বা বিদ্বেষ নেই। বরং পুনরায় আমরা বলি যে মানুষের জীবনের মূল্য আমাদের কাছে অনেক উঁচুতে, ভাষার গণ্ডীর বাইরে। মনুষ্য জাতির তথা মানব কল্যাণে, আমরা নিজেদের জীবন বলিদান করতে রাজী। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা অকারণে অপরকে আঘাত করতে যাব না। সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর ভাড়াটে সৈনিকরা সুশৃঙ্খলভাবে বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুতাপে মানুষকে হত্যা করে। বিপরীত ক্রমে, আমরা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমাদের হাতে যতটা ক্ষমতা আছে তাকে প্রয়োগ করেই আমরা মানুষের জীবন রক্ষা করতে উদ্যোগী। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করছি যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমরাই বোমা ছুঁড়েছি।...

"সরকারী বিশেষজ্ঞ যাই সাক্ষ্য দিক, বাস্তবে, আমরা যে বোমাগুলি ছুঁড়েছি সেগুলোর ফলে আইনসভা হলে কেবল একটি খালি বেঞ্চের ক্ষতি হয়েছে, আর আধ ডজনের

কম কিছু ব্যক্তির দেহ সামান্য ছড়ে গেছে। সরকারী বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে রায় দিয়েছেন এ এক অলৌকিক বা অদ্ভুত কাণ্ড। কিন্তু আমরা জানি এই ঘটনাটা একটা সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিণতি। প্রথমত, বোমাগুলি সুচিন্তিতভাবেই কাঠের বেঞ্চ ও ডেস্কের মাঝখানে একটা নির্বাচিত ফাঁকা জায়গায় ফাটানো হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঐ বিস্ফোরণের মাত্র ফুট দুয়েকের মধ্যে যারা ছিলেন যেমন, মিঃ পি. রাও, মিঃ শঙ্কর রাও এবং স্যার জর্জ স্যুস্টার— এদের কেউই তেমন আঘাত পান নি, পেলেও হয়ত সামান্য ছড়ে যাওয়ার মত আঁচড় লেগেছে মাত্র। কিন্তু সরকারী বিশেষজ্ঞ তার সাক্ষ্যে (যা ছিল কাল্পনিক এবং বাড়াবাড়ি) যে বয়ান দিয়েছেন সেই অনুযায়ীই যদি এই বোমাগুলি ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং মারাত্মক বিস্ফোরক পিক্রেট দিয়েই বানান হোত, তাহলে ঐ জায়গার কাঠের বেড়া ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে, বিস্ফোরণের বেশ কয়েক গজের চৌহদ্দীর লোকজনকে, শুইয়ে দিত সেই বোমা।

"একথাও বলা দরকার যে, এই বোমা যদি আরও শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্যসহ 'পেলিট' জাতীয় আঘাতকারী জিনিস দিয়ে তৈরি করা হত তাহলে এর বিস্ফোরণে আইনসভার বেশিভাগ সদস্যেরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, যদি আমরা চাইতাম তাহলে বোমাগুলি আমরা সরকারী সারির সদস্যদের দিকেও ছুঁড়তে পারতাম, যেখানে অনেক নামীদামী সরকারী প্রতিনিধি ছিলেন। অথবা স্যার জন সাইমনকেও আমরা বোমার লক্ষ্য করতে পারতাম। (সেই সাইমন, যাকে 'গো ব্যাক' স্লোগানে ভারত ছাড়া করতে উত্তাল হয়েছিল দেশ) সাইমন সেদিন সভার 'প্রেসিডেন্ট গ্যালারীতে' উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এসব কাজ আদৌ আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যেই ছিল না। যে উদ্দেশ্যে বোমা বানান হয়েছিল, (উচ্চস্বরে প্রতিবাদ ও সতর্কবার্তার ঘোষণা) বোমাগুলি সেই কাজগুলিই সুসম্পন্ন করেছে। যদি অলৌকিক, বিস্ময়কর বা অদ্ভুত কিছু ঘটে থাকে তা হল যে, ঐ বোমা সঠিক লক্ষ্যে, নিরাপদ স্থানেই ল্যান্ড করেছিল বা পড়েছিল।

"এরপর আমরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছি, কৃতকর্মের দণ্ডভোগের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই কাজের মাধ্যমে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শোষকশ্রেণীকে এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছি যে, ব্যক্তিকে খতম করে তারা তাদের আদর্শকে খতম করতে পারবে না। আমাদের মত অতি সামান্য দুজন নগণ্য ব্যক্তিকে নিগৃহীত করে তারা সমগ্র জাতিকে দমন করতে পারবে না। শাসক শ্রেণীকে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে শিক্ষা নিতে বলি যে, বাস্তিল কারাগার এবং 'পরিচয় জ্ঞাপক অনুজ্ঞাপত্র' ('letters de Cachets') ফ্রান্সের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। ফাঁসির দড়ি এবং সাইবেরিয়ার জনবিরল নির্জন অঞ্চলে নির্বাসন দিয়ে বা সেখানকার খনিতে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়েও রুশ বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে নেভান যায়নি।···

"বিদেশী শোষকরা কি ভেবেছেন জবরদস্তি ঐ অর্ডিনান্স এবং 'সেফটি বিল' (নিরাপত্তা আইন) জারী করে ভারতের জনগণের স্বাধীনতার হৃদয়াগ্নি নিভিয়ে দেওয়া যাবে? না, তা সম্ভব নয়। ষড়যন্ত্রের সন্ধান করে বা উচ্চ আদর্শের ধারক, বাহক তরুণ যুবকদের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধের মামলা দায়ের করে, জেলে পাঠিয়ে, কাঠোর দণ্ড দিয়ে বিপ্লবের আগমনও রোধ করা যাবে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা সময়োচিত সতর্কবার্তা ঘোষণা করেছি। শোষক শাসক শ্রেণীর সেটি কর্ণগোচর হলে অকারণ লোকক্ষয় এবং সাধারণভাবে মানুষের ক্লেশ নিবারিত হতে পারে।

"আমরা আমাদের জীবনকে বাজী রেখে এই গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীকে যথাসময়ে যথোচিতভাবে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করে দিয়েছি।

"আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছি।...

"বিপ্লব হল, মানুষের সত্ত্বার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অধিকার। স্বাধীনতা হল, মানুষের অবিনশ্বর, অক্ষয় জন্মগত অধিকার। আর শ্রমিকশ্রেণী হল, সমাজের প্রকৃত পালক ও পোষক। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দেওয়াই শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য।

"এই সব বিশ্বাস ও আদর্শের সঠিক রূপায়ণ করতে গিয়ে আমাদের ওপর যে কোন দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, শাস্তি নেমে আসুক, আমরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি আছি। বিপ্লবের বেদীমূলে, আমরা আমাদের জীবন-যৌবনকে নৈবেদ্য হিসেবে অর্পণ করেছি। এই মহান উদ্দেশ্য ও আদর্শের কাছে, আমাদের আত্মবলিদান, অতি নগন্য ও তুচ্ছ।

"আমরা আমাদের কাজ করেছি। আমরা পরিতৃপ্ত। সানন্দে আগামী বিপ্লবের প্রতীক্ষা করব।

"ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। Long Live Revolution".

সেসন জাজের রায় :

ভগৎ সিং-এর ৬/৬/২৯ তারিখের আদালতে প্রদত্ত বিবৃতিটির কিছু অংশ সম্পর্কে সেসন জাজ আপত্তি তুললেন। পরদিন আদালতে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর ও ডিফেন্স কাউন্সিল (আসফ আলী) দুজনের কাছেই তাঁর আপত্তির কথা জানালেন। আসফ আলী ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আলোচনা করে এই নিয়ে আর বিতর্ক বাড়াতে চাইলেন না। ফলে, বিচারকের আদেশে ঐ বিবৃতির কিছু অংশের পরিবর্তন করে, সেটিকে আদালতের রেকর্ড বা দলিল হিসেবে গ্রাহ্য করা হল।

দিল্লীর চীফ কমিশনার ভগৎ সিং-এর বিবৃতিটি যাতে হুবহু ছাপা না হয় সেই সম্বলিত এক নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রের আগেই দিল্লীর 'দি পাইওনিয়ার' পত্রিকা বিবৃতিটি হুবহু ছেপে দিয়েছিল। পরে আদালতের পরিমার্জিত ও গৃহীত বিবৃতিটি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনামে ছাপা হয়ে ব্যাপক প্রচার পায়। ভগৎ মজা করে, আদালতকে দলীয় প্রচারের কাজে ব্যবহার করাটাকে 'ড্রামা' বা নাটক বলে উল্লেখ করতেন। কিন্তু, এই নাটকের মূল নায়ক ভগৎ সিং যে উদ্দেশ্যে নিজের ও

সাথী বটুকেশ্বরের প্রাণকে বাজী রেখে নেমেছিলেন, এককথায়, সেই উদ্দেশ্য সর্বাংশে সার্থক হয়েছিল।

১০/৬/২৯ তারিখে আদালতে শুনানীর কাজ শেষ হল। ১২ই জুন ১৯২৯ তারিখে সেসন জাজ তাঁর বিচারের রায় শোনালেন। রায়ের অংশবিশেষ :

"…এটি প্রমাণিত হয়েছে যে ভগৎ সিং প্রথম বোমাটি ছুঁড়েছিলেন। তিনি হত্যা করার উদ্দেশ্যে অথবা এমনভাবে আহত করা যাতে মৃত্যু হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বোমা ছুঁড়েছিলেন। আমি লক্ষ্য করেছি এরই ফলে স্যার জর্জ স্যুস্টার, মিঃ পি. আর. রাও এবং মিঃ শঙ্কর রাও আঘাত পেয়েছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৮ ধারায় এই কাজের শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা সামান্য কিছু কম শাস্তি ধার্য করা আছে।…

"এও প্রমাণিত হয়েছে যে বটুকেশ্বর দত্ত দ্বিতীয় বোমাটি ছুঁড়ে ছিল একই উদ্দেশ্যে।…

"আমি দুজন আসামীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলিই প্রমাণিত হওয়ায় তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করছি এবং সেই অনুযায়ী দণ্ডাদেশ ঘোষণা করছি।

"আমি ভগৎ সিং ও বি. কে. দত্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দিচ্ছি।"

লাহোর জেলে স্থানান্তরিত :

সেসন আদালতের রাযের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করার সিদ্ধান্ত হয়। এখানেও ভগৎ সিং-এর একই উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। উচ্চতম আদালতকে নিজেদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচাবের কাজে 'ড্রামা' বা নাটক হিসেবে, প্রচারের কাজে লাগান। তৎকালীন সময়ে, গোপন দলীয় কার্যক্রমে তত্ত্ব, আদর্শ ইত্যাদির ব্যাপক প্রচারে বহু বাধা, বিঘ্ন ছিল। তাই ভগৎ সিং-এর, আদালতকে খোলাখুলি দলের প্রচারের প্লাটফর্ম বানানোর উদ্দেশ্য, পুরোমাত্রায সাফল্য পেয়েছিল।

জাস্টিস ফোর্ড এবং জাস্টিস এডিসনের এজলাসে এই মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী হয়। টানা দুই-তিন দিন আসফ আলী, ভগৎ সিং-ও বি. কে দত্তের পক্ষে সওযাল করেন। ভগৎ সিং-ও হাইকোর্টে তাঁর বক্তব্য রাখেন। ১৩ই জানুয়ারী ১৯৩০ তারিখে হাইকোর্টের রায়ে আপীল বাতিল হয়ে যায। সেসন জাজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবের শাস্তিই বহাল থাকে।

ইতিমধ্যে, মামলা চলাকালীন সমযে, সাণ্ডার্স হত্যাকাণ্ডের তদন্ত উপলক্ষে, ভগৎ সিং-এর কতিপয় সাথীর রাজসাক্ষী বনে যাওয়ার দুর্ঘটনা থেকে, কর্তৃপক্ষ ভগৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। ফলে, বটুকেশ্বর দত্তকে লাহোর জেলে পাঠিয়ে দিলেও ভগৎকে তারা পাঞ্জাবের কুখ্যাত মিঁয়াওয়ালী জেলে বন্দী রাখে।

মিঁয়াওয়ালী জেলে ভগৎ অন্যান্য রাজবন্দীদের সংস্পর্শে আসেন। এই বন্দীরা এখানে গদর আন্দোলন, ১৯১৪-১৫ সালের 'মার্শল ল' বিরোধী আন্দোলন এবং বব্বর অকালী আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে দীর্ঘমেয়াদী সাজা ভোগ করছিলেন। রাজবন্দীদের ওপর অমানবিক ব্যবহার, নৃশংস অত্যাচারের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভগৎ এই জেলে বিশদভাবে অবহিত হন। জেলের মধ্যে মানবিক ব্যবহার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবীতে অনশন

ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি এইসব রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের কাছে এই প্রস্তাব রাখেন :

'বন্ধুগণ, আমরা যদি আজ জেলের বাইরে থাকতাম, তাহলেও এই ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ আন্দোলন চালাতাম। সেই অন্দোলনে আমাদের মৃত্যুও হতে প্যারত। এখন জীবিত থেকেও আমরা জেলবন্দী। এই জেলও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি জেল, যেখানে দেশ্রপ্রেমিক রাজবন্দীদের রাখা হয়েছে, তাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে দুর্বল করে খতম করে দেবার জন্য। এখানে আমাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা হচ্ছে না। আসুন, আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি।'

রাজবন্দীরা প্রশ্ন করলেন, 'কিভাবে সে লড়াই চালান হবে ?'

ভগৎ জবাবে বললেন, 'অনশন ধর্মঘট। বলুন, হাত তুলে সম্মতি দিন কারা এই বৃহত্তর জাতীয় উদ্দেশ্যে এবং মানুষের মর্যাদার স্বার্থে আত্মদানে তৈরি আছেন ?'

সকলে বিনা দ্বিধায়, স্বেচ্ছায়, উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'। ভগৎ সিং ও তার সাথীদের কাছে, গ্রেপ্তার হয়ে বা শাস্তি পেয়ে হাজতবাসই, শেষ কথা ছিল না। তাই জেলের জীবনকেও সংগ্রামের জীবনে রূপান্তরিত করলেন ভগৎ সিং। জেলের মধ্যে থেকেও, তাঁর নেতৃত্বে, বিপ্লবী দেশপ্রেমিক রাজবন্দীরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ১৫ই জুন ১৯২৯ তারিখ থেকে শুরু হোল অনশন ধর্মঘট। অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হল তাদের কিছু দাবী মেনে মানুষের উপযুক্ত খাবার দিতে, জেলের মধ্যে পত্র, পত্রিকা ও বই পড়ার সুযোগ ইত্যাদি দিতে। অন্যান্য জেলেও ছড়িয়ে পড়ল এই আন্দোলন।

১৭ই জুন ১৯২৯ তারিখে, ভগৎ সিং মিঁয়াওয়ালী জেল থেকে ইনস্পেক্টর জেনারেল (জেল), পাঞ্জাব জেল, লাহোর-কে উদ্দেশ্য করে, এক পত্র লিখলেন। পত্রটি এইরকম :

"সান্ডার্স হত্যা কেসে অন্যান্য যুবক বন্ধুদের সঙ্গে আমারও বিচার হবে, এই অবস্থাতে আমাকে দিল্লী থেকে এই মিঁয়াওয়ালী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই কেসের শুনানী আগামী ২৬শে জুন, ১৯২৯ তারিখ থেকে শুরু হবার কথা। এই অবস্থায় আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কোন যুক্তিতে আমাকে এখানে আনা হোল। কারণ যাই হোক, ন্যায়বিচার দাবী করে যে, প্রতিটি বিচারাধীন বন্দীকেই তার আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি নিতে দিতে হবে এবং মামলায় লড়াই করার সবরকম সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আমাকে এখানে বন্দী করে রাখা হলে, আমি আমার উকিল নিয়োগ করার সুযোগ পাব কি করে ? এ ছাড়া আমাকে এখানে রাখা হলে, আমি আমার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগই বা রাখব কি করে ? এই জেলের অবস্থান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এখানে যাতায়াতও কষ্টসাধ্য এবং জায়গাটাও লাহোর শহর থেকে অনেক দূরে।

"এমতাবস্থায় আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, আমাকে অবিলম্বে লাহোর কেন্দ্রীয় জেলে স্থানান্তরিত করা হোক, যাতে আমি আমার বিরুদ্ধে মামলায় লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি। আশা করি, এ সম্পর্কে আপনি যথাসত্বর বিবেচনা করবেন।

"আপনার,
"ভগৎ সিং"।

কিছুদিন বাদে (২৫/৬/২৯ তারিখ নাগাদ) ভগৎ সিং-কে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হোল। এখানে বটুকেশ্বর দত্ত আগে থেকেই ছিলেন। এবার জেলের মধ্য থেকেই বৃহত্তর আন্দোলনে ভগৎ তাঁর সাথীকেও পেয়ে গেলেন।

ভগৎ সিং-এর অন্যান্য সাথী, যারা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন ছিলেন, যেমন সুখদেব, যতীন্দ্রনাথ দাস, অজয় ঘোষ, শিব বর্মা, ডাঃ গয়া প্রসাদ, জয়দেব কাপুর, শিবরাম হরি রাজগুরু, বিজযকুমার সিন্‌হা, এঁরাও সেই সময় বন্দী অবস্থায় লাহোরের বোর্স্টল জেলেই ছিলেন। ফলে ভগৎ সিং-এর পক্ষে এদের সঙ্গে মামলা সূত্রে যোগাযোগের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হোল।

১৫ই জুন, ১৯২৯ তারিখ থেকে ভগৎ যে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন, তার ফলে, তাঁর শারীরিক অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছিল। ৯ই জুলাই ১৯২৯ তারিখে তাঁর দেহের ওজন কমে দাঁড়াল ১১৯ পাউন্ড। যেখানে ১৫/৬/২৯ তারিখে ধর্মঘটের শুরুতে ওজন ছিল ১৩৩ পাউন্ড। সাথী ধর্মঘটীদেরও অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। কিন্তু তাঁরা আন্দোলন চালিযে যাচ্ছিলেন।

রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবীতে আন্দোলন :

রাজবন্দীদের মানবিক সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদার দাবিতে ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বে জেলের ভেতরের আন্দোলন এক ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ২৪/৬/২৯ তারিখে, লাহোর সেন্ট্রাল জেল থেকে তাঁদের ঐতিহাসিক দাবীপত্র পাঠালেন ভারত সরকারের হোম মেম্বারের উদ্দেশ্যে। সাত দফা দাবীর অন্তর্ভুক্ত হোল :

১। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে, আমাদের ভাল খাদ্য দিতে হবে। এই খাদ্যবস্তুর মান কমপক্ষে ইওরোপীয় বন্দীদের সমতুল্য হওয়া চাই। আমরা ইওরোপীয় বন্দীদের মত একই রকম খাদ্যবস্তুর দাবী করছি না। আমাদের দাবী, খাদ্যবস্তুর মান ঐ স্তরের হওয়া দরকার।

২। আমাদের দিয়ে জবরদস্তি ভারী ও অসম্মানজনক কাজ করান চলবে না।

৩। একমাত্র নিষিদ্ধ বই ছাড়া সব রকম বই, লেখার সরঞ্জাম, ইত্যাদি বিনা নিয়ন্ত্রণে দিতে হবে।

৪। প্রত্যেক রাজবন্দীকে প্রতিদিন কমপক্ষে একটি দৈনিক সংবাদপত্র দিতে হবে।

৫। প্রতিটি জেলে রাজবন্দীদের জন্য একটি বিশেষ ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে, যেমন ইওরোপীয় বন্দীদের জন্য করা হয়েছে। জেলের অভ্যন্তরে সমস্ত রাজবন্দীদেরই ঐ বিশেষ ওয়ার্ডে একসঙ্গে থাকার সুযোগ দিতে হবে।

৬। স্নানাদি'র সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

৭। পরিধেয় কাপড়ের মান উন্নত ধরনের হওয়া চাই।

ঐ দাবীপত্রে ভগৎ সিং ও বি. কে দত্ত অনশনকারীদের শক্তিপ্রয়োগ করে জবরদস্তি

খাওয়াবার প্রচেষ্টা বন্ধ করার দাবীও জানালেন। কারণ এরই মধ্যে একদিন ভগৎ সিং-কে জোর করে খাওয়াতে গেলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।

দাবীপত্রে, রাজনৈতিক বন্দী বলতে কাদের বিবেচনা করা হবে, সেই সূত্রে তাঁরা বললেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা যে কোন ঐ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত যেমন, ১৯১৫—১৭-এর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা এবং সাধারণ ভাবে রাজদ্রোহাত্মক মামলার আসামীদের রাজবন্দীর মর্যাদা দিতে হবে।

ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বে জেলের অভ্যন্তরের আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল বাইরে, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে। একদিন যে জালিয়ানওয়ালাবাগে, শৈশবকালে, ভগৎ আন্দোলনের প্রেরণা সংগ্রহ করতে তার পবিত্র মাটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন পরবর্তী জীবনের প্রেরণা মজুত রাখতে; এবার অমৃতসরের সেই ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালা-বাগেই অনুষ্ঠিত হল 'ভগৎ সিং দিবস'।

৩০শে জুন, ১৯২৯ তারিখে শহর কংগ্রেস ও নওজওযান ভারতসভার যৌথ উদ্যোগে রাত ৮টায় ঐতিহাসিক জালিয়ানওযালাবাগে জনসভা অনুষ্ঠিত হোল। জননেতা সৈফুদ্দিন কিচ্‌লুর সভাপতিত্বে 'ভগৎ সিং দিবস'-এর এই সভা শুরুই হোল ভগৎ-এর প্রিয় স্লোগান 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি দিয়ে। ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীদের সংগ্রামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হল। সভার শেষে হাসান-উদ্-দীন সভায় এক প্রস্তাব রাখলেন:

'বিগত ১৪ দিন যাবৎ, ভগৎ সিং ও দত্ত জেলের অভ্যন্তরে যে অনশন ধর্মঘট চালাচ্ছেন, অমৃতসরের অধিবাসীবৃন্দ সেই সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও প্রশংসা ব্যক্ত করছে। জেলের অভ্যন্তরে, রাজবন্দীদের সঙ্গে যে ঘৃণ্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতি, আমরা পূর্ণ সহানুভূতি জানাই। আমরা আমলাশাহী কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারী দিতে চাই যে, এদের এই ন্যায়সঙ্গত অনশন ধর্মঘটের ফলে যদি তাদের জীবনহানি হয় তাহলে তার সব দায় দায়িত্ব বর্তাবে সরকারের ওপর।'

সভায় সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হোল প্রবল উৎসাহে। পুলিশী রিপোর্ট থেকে আরও দেখা যায় যে, বিভিন্ন শহরে এই ধরনের 'ভগৎ সিং-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়েছিল। লাহোর শহরে নওজওয়ান ভারতসভার ডাকা জনসভা ছিল এর মধ্যে ঐতিহাসিক। ২১শে জুলাই, ১৯২৯ তারিখের এই সভায় কমপক্ষে ১০,০০০ মানুষের জমায়েত হয়েছিল। সেখান থেকে রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল।

লাহোর জেলে ঐতিহাসিক অনশন সংগ্রাম :

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের অনশন ধর্মঘট চলাকালীনই সান্ডার্স হত্যার মামলা শুরু হল, ১০ই জুলাই ১৯২৯ তারিখে। শিব বর্মাও লাহোর ষড়যন্ত্র মামালায় অভিযুক্ত বন্দী হিসাবে আদালতে ভগৎ এর সাথী হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তিনি লিখেছেন:

"অনশনের এক মাসের বেশি হয়ে গিয়েছিল তবুও সে (ভগৎ সিং) আদালতে এল। যখন স্ট্রেচারে করে আদালতে আনা হল, তখন তাকে দেখে আমাদের সকলের

চোখে জল এসে গেল। সে আমাদের আগেকার ভগৎ সিং ছিল না, যার সুন্দর স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ শরীর আমাদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে থাকত। আদালতে যে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল, সে আগেকার ভগৎ সিং-এর ছায়ামাত্র ছিল—পাণ্ডুর ও দুর্বল। কয়েক মাসের একনাগাড়ে কারাবাস-যাতনা ও দীর্ঘদিনের অনশনে তার বলিষ্ঠ শরীর শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গিয়েছিল।" ('শহীদ স্মৃতি'— শিব বর্মা)।

ভগৎ সিং-এর অপর সাথী, পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষও ছিলেন আর এক অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী বন্দী সাথী। তিনিও লিখেছেন:

"১৯২৯ সালের জুলাই মাসে আমাদের ১৩ জনকে আদালতে হাজির করা হল। সেখানেই আমরা ভগৎ সিং ও (বটুকেশ্বর) দত্তের দেখা পেলাম। কিন্তু যে ভগৎ সিং-এর বলিষ্ঠ চেহারা ছিল আমাদের দলের মধ্যে এক গর্ব করে আলোচনার বিষয়, এ ভগৎ সেই ভগৎ নয়। অতিশয় কৃশ, দুর্বল কাহিল চেহারার ভগৎকে স্ট্রেচারে করে আদালতে বযে আনা হোল। মাসখানেক ধরে পুলিশ ভগৎ এবং দত্তের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, তার ওপর রাজনৈতিক বন্দীদের মানবিক মর্যাদার দাবীতে চলেছে তাদের একটানা অনশন ধর্মঘট। শারীরিক দিক থেকে বিপর্যস্ত সে এক অন্য চেহারার ভগৎ সিং। আদালতে দেখা হতেই আমাদের চোখ জলে ভরে এল।" ("Bhagat Singh and his Comrades', Ajoy Ghosh)।

শিব বর্মার বর্ণনা থেকে আরও বিশদ জানা যায়। সেই বর্ণনা এইরকম:

"একসঙ্গে মিলিত হবার পর, প্রায় তিনদিন ধরে, আমরা এই নিয়ে বিতর্ক করলুম, যে আদালতের সামনে আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের নীতি কি হওয়া উচিত। ভগৎ সিং এত দুর্বল হযে পড়েছিল যে কথাবার্তার মাঝখানে, খানিকক্ষণ পরে পরে, আরাম কেদারায় শুয়ে তাকে জিরিয়ে নিতে হত। এসব সত্ত্বেও সে বিতর্কে যোগদান করল ও চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করল।

"ভগৎ বলতে চাইছিল যে গ্রেপ্তার হবার পর সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি এবং একথা ভাবাও ভুল হবে যে আমাদের করার আর কিছু নেই। ভগৎ বলল, 'যারা ছাড়া পেতে পারে তাদের ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মকদ্দমা রাজনীতিক উদ্দেশ্যে রাজনীতিগত ভাবেই লড়তে হবে। শত্রুর আদালত সম্পর্কে কোন ভ্রম বা আশা করা আমাদের বিপ্লবীদের পক্ষে মূর্খতা এবং সেই জন্য, আমাদের বিদেশী সরকারের আদালতী নাটক ও মেকী ন্যায় বিচারের আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে, বিপ্লবীদের অজেয় মানসিক শক্তির পরিচয় দেওয়া উচিত।'

"ভগৎ আদালতকে বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারের মঞ্চরূপে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে এও চাইছিল যে আমরা আদালতে ও জেলে রাজনীতিক বন্দীদের অধিকারের জন্য নিরলস সংগ্রাম করি। সরকার, তার আদালত ও তার নীতির প্রতি, আমাদের ঘৃণা, নিজেদের প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে, উপযুক্ত অবসরে, প্রকাশ করতে হবে।

শেষে যদি বিবৃতি দেবার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে রাজনীতিক বিবৃতি দিয়ে, সম্পূর্ণ ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানা হোক। ভগৎ সিং-এর এই কথাগুলি সব সাথীরা সমর্থন করল।...

"আদালতকে প্রচারের মঞ্চরূপে ব্যবহার করার আমাদের পরিকল্পনা বেশ সাফল্য লাভ করেছিল।"

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের অনশন ধর্মঘট চলাকালীনই ১২ই জুলাই, ১৯২৯ তারিখে ভগৎ-এর অন্যতম বন্দী-সাথী জয়দেব স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের মধ্যেই ঘোষণা করলেন যে ভগৎ ও দত্তের দাবীগুলির সমর্থনে ঐ মামলার বাকী বন্দীরাও অনশন ধর্মঘট শুরু করবে।

"অবশেষে ১৩ই জুলাই, ১৯২৯ তারিখে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের সমর্থনে আমাদের মধ্যে দু'চার জন ব্যতীত আর সবাই অনশন সংগ্রাম আরম্ভ করল।

"আমাদের মধ্যে, একমাত্র যতীন দাস[২১] ছাড়া, কারো অনশনের অভিজ্ঞতা ছিল না। ভাবাবেগে চালিত হয়ে অনশন সংগ্রামে যোগ দিতে যতীন্দ্রনাথ নিষেধ করল সাথীদের। সে বলল, 'রিভলবার পিস্তল নিয়ে লড়াই করার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন এক অনশন সংগ্রামে আমরা নামছি। অনশন সংগ্রামীকে তিল-তিল করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে হয়। শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ সমরে গুলির আঘাতে প্রাণ দেওয়া , বা ফাঁসির রশিতে জীবন দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। অনশনে অংশ নিয়ে পরে পিছু হটলে বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠা ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। তাই বলছি যে যোগ দিয়ে পিছিয়ে পড়ার চেয়ে, প্রথম থেকেই অনশনে যোগ না দেওয়াই সমীচীন।'

"যতীন দাস আরো বলে যে, সে নিজে অনশন আরম্ভ করলে যতদিন না সরকার দাবী সনদ মেনে না নেয়, ততদিন অনশন চালিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে বলে যে, তাড়া-হুড়ো করে কিছু না করাই ভাল।..."('শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা)।

যতীন দাসের হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৩/৭/২৯ তারিখ থেকে ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অনশন সংগ্রাম শুরু হোল। ওদিকে মামলার কাজও চলছিল। অনশনকারীদেরও আদালতে হাজির করা হচ্ছিল। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত সরকার ঐ অনশনে দুর্বল বন্দীদেরও হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে আসত। ১৭ই জুলাই, ১৯২৯ তারিখে ঘটে গেল তাই নিয়ে প্রবল উত্তেজনার ঘটনা। ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বে বন্দীরা হাতকড়া পরানোর বিরোধিতা করল। দীর্ঘ অনশনে দুর্বল ভগৎ সিংকে স্ট্রেচারে বয়ে আনা হয়েছিল। তিনি ঐ দুর্বল অবস্থাতেও কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে হাতকড়া লাগাবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। শীর্ণ, অবসন্ন শরীরেও তাঁর তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মিঃ ম্যাজিস্ট্রেট, আমরা কিন্তু পুলিশের এই জবরদস্তি হাতকড়া পরাবার কাজকে আমাদের প্রতি অপমান বলেই মনে করছি। আপনাকে চোখ বন্ধ করে পুলিশের কাজকে সমর্থন করতে হবে, এমন হতে পারে না। আপনি আমাদের প্রতি যোগ্য বিচার প্রদর্শন করুন। আমরা দেখছি, আপনি আমাদের কোন অভিযোগই

কানে নিচ্ছেন না। শুনুন, আপনার প্রতি আমাদের কোন আস্থা নেই, যেহেতু আপনাকে দেখা যাচ্ছে সবকিছুতেই পুলিশের কথায় চলেছেন। আপনিই বলুন, এই হাতকড়া পরা অবস্থায় আমরা কিভাবে বিচার চলাকালে কাগজে প্রয়োজনীয় লেখার কাজ চালাব? নোট নেব? কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করব এবং মামলার ব্যাপারে কাজ করব?'

ম্যাজিস্ট্রেটকে নিরুত্তাপ দেখে আরও উত্তেজিত হলেন ভগৎ সিং। চোখ মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল ঐ দুর্বল দেহেও।

ভগৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আপনার এই আদালতে আমরা কোন বিচার পাব না! বলুন, কেন এই বলপ্রয়োগ? কেন এই জবরদস্তি? জবাব দিন, আপনি, নাকি ঐ পুলিশ অফিসার কে.বি-আবদুল, কে এই আদালতের নিয়ন্ত্রক? কে চালাচ্ছে এই আদালত?'

প্রতিবাদের ফল হল, বিচারক, ভগৎ-এর এই ন্যায়সঙ্গত সোচ্চার দাবী তোলার অপরাধে, তাকে আদালত অবমাননা এবং আদালতের শান্তিভঙ্গের শাস্তির নিদান পাঠালেন, জেলের সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্টের কাছে।

ইতিমধ্যে, টেলিফোনে ইন্সপেক্টর জেনারেলের (জেল) আদেশে, জেল কর্তৃপক্ষ ভগৎ সিং ও দত্তের জন্য স্পেশ্যাল ডায়েটের (খাদ্যবস্তু) বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু ভগৎ সিং জেল কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তিনি দাবী করলেন সরকার যদি তাদের দাবী মেনে এই স্পেশ্যাল ডায়েটের ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে সেই আদেশ সরকারী গেজেটে ছেপে বার করা হোক, এবং রাজবন্দীদের জন্য এই বিশেষ উন্নত মানের খাদ্যবস্তু সর্বত্রই চালু হোক। সরকার এই দাবীর প্রতি কান দিল না। বোঝা গেল, এটা ছিল ভগৎ সিং-দের প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সংগ্রামকে দুর্বল করে দেবার সরকারী চক্রান্ত।

অনশনকারীদের জবরদস্তি খাওয়াবার অপচেষ্টা :

এই প্রসঙ্গে শিব বর্মা বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

"আমাদের আহারে প্রলুব্ধ করার জন্য লোভনীয় সুগন্ধি খাদ্যাদি আমাদের জেল কুঠুরির মধ্যে সাজিয়ে রেখে যেত। যে মুহূর্তে জেল কর্তৃপক্ষ সব রান্না করা সুখাদ্য, তার উপর দুধ-ফল-মিষ্টি ইত্যাদি রেখে যেত, সঙ্গে সঙ্গে সাথীরা সেই সব জিনিস কুঠুরির বাইরে ফেলে দিত অথবা তৎক্ষণাৎ সব নোংরা করে, নষ্ট করে রেখে দিত।

"কিন্তু যতীন দাস ছিলেন একমাত্র লোক, যাঁর আত্মপ্রত্যয় ছিল এমন দৃঢ়, যে সে এই সব ভোজ্য খাদ্য কখনো ফেলেও দেয়নি অথবা নোংরাও করেনি। কর্তৃপক্ষ গুনে গুনে সব খাদ্য মিলিয়ে নিয়ে তার কুঠুরি থেকে খাবার সরিয়ে নিত প্রতিদিন।

"দশদিন পরে কয়েকজনের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় সরকারের দ্বারা নিযুক্ত ডাক্তারের দল আমাদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব নিল। তারা এগারো দিনের থেকে নাক দিয়ে জোর করে দুধ গেলানোর এক তামাশা শুরু করে দিল। আট দশ জন বাছাই করা

শক্ত-সমর্থ জোয়ান, আমাদের মধ্যে একজনকে ঘিরে ফেলত, আর ধরে মাটিতে ফেলে দিত। সাথীরা প্রতিরোধ করে যতক্ষণ শক্তিতে কুলোত ততক্ষণ তাদের সঙ্গে লড়ত। একজনের সঙ্গে আট-দশ জনের ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তারা সাথীকে কাবু করে, তার উপর চেপে বসে পড়ত। তখন ডাক্তার নাক দিয়ে রবারের একটা লম্বা নল পেটে ঢুকিয়ে দিত। অনশনকারী সাথী ঢেকুর তুলে নলটি পেটের ভিতর প্রবেশে বাধা দিত। এই কসরতে নলটি কখনো কখনো মুখে এসে যেত। তখন অনশনকারী তা দাঁতে চেপে ধরে পড়ে থাকত। এরপর ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হত। নিরুপায় হয়ে ডাক্তার কখনো কখনো তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলত এবং রাগে বিড়বিড় করতে করতে দলবলসহ অন্য কুঠুরির দিকে চলে যেত। ডাক্তারের হত পরাজয়। আর অনশনকারী সাথীর হত জয়।

"যতীন দাসের এই ধ্বস্তাধ্বস্তির অভিজ্ঞতা আগে থেকেই ছিল। তাই প্রথম দিনেই ডাক্তারকে তার কাছে হার মানতে হল। ঘটনাচক্রে এই ডাক্তার লাহোরের কোন এক পাগলা গারদের কর্তৃত্বে ছিল। জেল কর্তৃপক্ষ জোর করে দুধ গেলানোর কলা-কৌশল বিশেষজ্ঞ বলে তাকে আনিয়েছিল। পাগলাদের মাঝে থেকেই হয়ত তারও এক পাগলাটে ঝোঁক এসে গিয়েছিল। লোকটা অহঙ্কারী ও বদরাগীও ছিল। যতীন দাসের কাছে এই বিশেষজ্ঞ মহাশয় প্রথম দিনেই হেরে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কুঠুরির মধ্যে সকলের সামনে সে যতীন দাসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলল, 'কাল দেখে নেব কি করে আপনি আমার কাজে বাধা দেন।' যতীন দাস সে কথায় মৃদু হাসলেন মাত্র। ডাক্তার লম্বা লম্বা পা ফেলে রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেল।

"২৬শে জুলাই, ১৯২৯ তারিখের ঘটনা। অন্যান্য অনশনকারী সাথীদের জবরদস্তি দুধ গেলানোর পালা সেরে সেই ডাক্তার সবার শেষে যতীন দাসকে ধরল। সে একটা হেস্তনেস্ত করতে নামল। ঠেলাঠেলি ধ্বস্তাধ্বস্তির পূর্ব ভূমিকা সাঙ্গ হল। ডাক্তারের সঙ্গী জোয়ানরা যতীনকে পুরোপুরি কাবু করল। ডাক্তার নাক দিয়ে রবারের নল ঢুকিয়ে দিল। যতীন দাস নলটি মুখের দিকে নিয়ে এসে দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখল। ডাক্তার এবার নাকের অন্য ফুটো দিয়ে আর একটা নল ঢোকাতে লাগল। দম বন্ধ হবার অবস্থা হল যতীন দাসের। তবুও সে মুখ বন্ধ রেখেই চেষ্টা করতে লাগল নল যাতে পেটে না যায়। এরই মধ্যে দ্বিতীয় নলটার মুখ চলে গেল যতীন দাসের ফুসফুসের দিকে। ডাক্তারের দেরি সইছিল না। তার পাগলাটে গোঁ! তাকে জিততেই হবে, যে করে হোক! দম বন্ধ হয়ে চোখ কপালে উঠল যতীন দাসের। সেই অসহায় অবস্থার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই ডাক্তার সেরখানেক দুধ ঢেলে দিল নল দিয়ে। দুধ নল বেয়ে চলে গেল ফুসফুসে। বিজয়োল্লাসে যতীন দাসকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে ডাক্তার চলে গেল।

"...চারপাশে আমাদের দেখে (একটু সুস্থ হলে) যতীন দাস একবার মুচকি হাসলো। ক্ষীণ গলায় জিতেন্দ্রনাথ সান্যালকে সম্বোধন করে বলল, 'এখন আর ওরা আমাকে ধরতে পারবে না।'

"সেই দিন থেকে তিলে তিলে যতীন দাসের মৃত্যুর পথে যাত্রা শুরু হল। শহীদের

মৃত্যুবরণের পথে প্রত্যেকটি মুহূর্তে তার শান্ত ও সৌম্য চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের রেখা আরও গভীর হয়ে ফুটে উঠল।" ('শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা।)

এদিকে, একটানা অনশন সংগ্রামে ভগৎ সিং-ও ক্রমাগত শরীরের ওজন হারাচ্ছিলেন। তারই মধ্যে সাথীদের সঙ্গে মামলা বিষয়ে আলোচনার ছুতো করে, ভগৎ বোর্স্টল জেলে যেতেন, সংগ্রামরত বিপ্লবী সাথীদের দেখাশুনা করতে, তাদের উৎসাহ দিতে।

ইতিমধ্যে, খবর এল, যতীন দাসের অবস্থা খারাপের দিকে এগোচ্ছে। সারা দেহে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে গেছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ডাক্তার ওষুধ প্রয়োগ করতে চাইল। কিন্তু যতীন দাস রাজী নন। ডাক্তার গোপিচাঁদ ভার্গব (পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হন) সহ বহু কংগ্রেসের নেতা, ডিফেন্স কমিটির সদস্যবৃন্দ তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু যতীন দাস তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। অবশেষে খবর গেল ভগৎ সিং-এর কাছে। ভগৎ এলেন। কথা বললেন। অনুরোধ করলেন। রাজী হলেন যতীন দাস। সকলে অবাক। জেলের জনৈক কর্তাব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে যতীন দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কারো অনুরোধ রাখেননি। কিন্তু ভগৎ সিং বলতেই রাজী হলেন কেন ?' উত্তরে যতীন দাস বললেন, 'মশাই, আপনি জানেন না ভগৎ সিং কি ধরনের বিপ্লবী। সে এক বীরপুরুষ। আমি কখনো ভগৎ-এর কথা ফেলতে পারি না।'

যতীন দাস ভগৎকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে নাকি ওরা জবরদস্তি ফিডিং দিয়েছে ?' ভগৎ বললেন, 'আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি ওদের সঙ্গে লড়েছি। ওদের ঠেকাবার চেষ্টা করেছি। শেষে ওরা জোর করে ফিডিং দিল। আমার নাকের ফুটোগুলো বড্ড বড়। এই হয়েছে আমার বিপত্তি। ওরা সহজেই ঐ ফুটো দিয়ে নল চালিয়ে ফিডিং করছে।' দুজনের মধ্যে আরও মজার কথা হল। যতীন দাসের নাকের ফুটো খুব ছোট্ট, চড়ুই পাখির মত। তাই ওদের গায়ের জোরের ফিডিং বিপর্যয়! ইত্যাদি।

কিন্তু সমস্ত মজার মধ্যেও এটা ছিল এক কঠিন রূঢ় সত্য, যে জবরদস্তি নাকে নল ঢুকিয়ে ফিডিং-এর দুষ্কর্ম ভগৎকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যেতে অব্যাহতি দিয়েছিল আর যতীন দাসকে তিলে তিলে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রতি ইঞ্চি ইঞ্চি পথে বীর শহীদের মৃত্যুবরণে ঠেলে দিয়েছিল।

৬ এবং ৯ই আগস্ট, ১৯২৯ তারিখে পাঞ্জাব সরকার অনশনকারীদের খাদ্যবস্তু, ড্রেস ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের দাবী সম্পর্কে সামান্য সুবিধা দেবার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীরা এই আংশিক সুবিধায় রাজী হলেন না। অনশন সংগ্রাম চলতে থাকল।

২১শে আগষ্ট, ১৯২৯ তারিখে ডাঃ গোপিচাঁদ ভার্গব এবং বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন (প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক) ভগৎ সিং-এর সঙ্গে যতীন দাসের এক সাক্ষাৎকার নিতে এলেন।

ট্যান্ডন যতীন দাসকে বললেন, 'ভাই, তোমাকে তো বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। আমি বলতে চাইছি, সংগ্রামের স্বার্থেই তো তোমাকে আরও কিছুটা সময় টিকে থাকতে হবে।

যতীন দাস: 'কেন, আমি তো বেঁচেই আছি!'

ট্যান্ডন: 'ওষুধ-পথ্য ছাড়া কি করে বাঁচবে?'

যতীন দাস: 'কেন আমার ইচ্ছা শক্তির জোরে।'

ডাঃ গোপিচাঁদ: 'আমি মনে করি তা সম্ভব নয় ভাই। আমি তোমাকে তোমার আদর্শ থেকে সরে আসতে বলছি না। তুমি তোমার অনশন সংগ্রাম চালিয়ে যাও। কিন্তু আমাদের অনুরোধ, আরও কিছুটা সময় নেবার জন্য তুমি টিকে থাক, বেঁচে থাক। আমরা সকলে অনুরোধ করছি তুমি অন্তত আর দিন পনেরো বেঁচে থাক, তোমার এই লড়াই-এর ফলাফল দেখবার জন্য। তারপর যদি দেখ তোমার সব দাবীর ফয়সালা হল না, তখন ওষুধ-পথ্য নেওয়া বন্ধ কোর, আমরাও তোমাকে আর অনুরোধ করব না।'

যতীন দাস: 'এই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। এখন আমি আর লড়াই থেকে পিছু হটতে পারব না। আপনারা দেখবেন আমি বাঁচব, আরও কিছুদিন বাঁচব, ওষুধ-পথ্য ছাড়াই। আমি বাঁচব আমার মনের জোরে, ইচ্ছাশক্তির জোরে। আপনারা দেখবেন'।

সবশেষে ভগৎ সিং অনুরোধ করলেন যতীন দাসকে। প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চান না যতীন দাস। ভগৎ বারবার অনুরোধ করে, বুঝিয়ে শেষে রাজী করালেন। কিন্তু তিনি দুটি শর্ত আরোপ করলেন। বললেন, 'শোন ভগৎ সিং, আমি জানি যে, আমার শপথ ভঙ্গ করা উচিত নয়। কিন্তু তোমার অনুরোধও অগ্রাহ্য করতে পারি না। কিন্তু শর্ত হোল, এরপর দ্বিতীয়বার কিন্তু তুমি আর অনুরোধ করতে পারবে না।' যতীন দাসের দ্বিতীয় শর্ত হোল, 'জেলের কোন ডাক্তার ওষুধ-পথ্য দিলে নেব না। একমাত্র ডাক্তার গোপিচাঁদ ভার্গব যদি নিজের হাতে দেন তাহলেই নেব।' দুটো শর্তই মানা হোল।

কিন্তু, ক্ষতি যা হবার আগেই হয়ে গেছে। ২৬শে আগস্ট, ১৯২৯ তারিখে জেলের মেডিক্যাল অফিসার রিপোর্ট দিলেন, যতীন দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ ও অসাড় হয়ে যাচ্ছে। গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসছে। শরীরের নিম্নাঙ্গ তুলতে পারছেন না।

অনশন সংগ্রামীদের জীবন পণ করে সংগ্রাম চালাবার দৃঢ়তা দেখে এবং তাদের সমর্থনে দেশজুড়ে জেলের বাইরেও আন্দোলন ছড়িয়ে যেতে দেখে চিন্তিত ও আতঙ্কিত সরকার একটা 'জেল অনুসন্ধান কমিটি' তৈরি করল। তারা জেল পরিদর্শন করে এবং অনশন সংগ্রামীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের দাবীগুলির অধিকাংশই মেনে নিতে রাজী হলেন এবং সেই অনুসারে তারা তাদের গ্রহণযোগ্য সুপারিশও পেশ করলেন। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ তারিখে ভগৎ সিং ও তার কমরেডরা, একমাত্র যতীন দাস ছাড়া সকলেই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলেন। ইতিমধ্যেই ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত একটানা ৮১ দিন এবং অন্যরা ৫৩ দিন অনশন চালিয়ে গেছেন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী কমরেড যতীন দাসের প্রতি সমর্থন জানাতে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও অন্য তিনজন কমরেড দু দিন বাদে, ৪/৯/২৯ তারিখ থেকে ফের অনশন শুরু

করলেন। এই অনশন সংগ্রামের মুখ্য দাবী উঠল, যতীন দাসকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

কিন্তু যতীন দাসের ঐ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থাতেও ইংরেজ সরকার তাকে মুক্তি দিতে সম্মত হল না। জামিনে মুক্তির সরকারী প্রস্তাবও ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন যতীন দাসসহ সকলেই।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ তারিখে সকাল ৯টা থেকেই যতীন দাসের অবস্থা সঙ্গীণ হয়ে এল। বিপ্লবের ইতিহাসের এই বরেণ্য শহীদ ৬৩/৬৪ দিনের কঠিন অনশন সংগ্রাম শেষে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। মৃত্যুর আগে অতি কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করে গেলেন, 'না, না নৈষ্ঠিক শাস্ত্রবিশ্বাসী বাঙালী ফ্যাসনে আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে যাওয়া বা অন্যান্য সংকার কর্ম করিও না। আমি একজন ভারতীয়, আমি কেবল বাঙালী নই।'

K. K. Khullar তাঁর 'Shaheed Bhagat Singh' গ্রন্থে যে ভাষায় যতীন দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সেটাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'JATIN DAS DIED SO THAT THE REST OF HIS COUNTRYMEN MAY LIVE' (সমগ্র দেশবাসীকে বাঁচাতে, যতীন দাস দেহ রাখলেন)।

একথার মর্ম বুঝেছিলেন ভগৎ সিং। সকলের থেকে আলাদা করে, বিশেষ করে চিনেছিলেন তিনিই যতীন দাসকে। বিশেষ করে, প্রাণ ঢেলে ভাল বেসেছিলেন তাঁকে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে, পলাতক অবস্থায়, কলকাতা থাকাকালীন ভগৎ-ই যোগাযোগ করেছিলেন যতীন দাসের সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন পাঞ্জাবে। বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিয়ে যতীন দাস চলে গেলেন। সকলের থেকে বেশি, ভগৎ-এর বুকেই বেজে উঠল, সাথী হারাবার ব্যথা বেদনা। যতীন দাসের স্মৃতিতে গান লিখলেন ভগৎ সিং। সাথীদের কাছে ব্যথিত হৃদয়ে প্রায়ই শোনাতেন সে গান। যতীন দাসের দল গাইত এ গান:

'বক্ত আনে দে বতা দেঙ্গে তুঝে এ আসমা
হম অভি সে ক্যা বতাঁয়ে ক্যা হামারা দিল মে হৈ।'
('সময় এলে বলবো তোমায় আমার প্রাণের সেই বাসনা।
এখন থেকে কী জানাবো, এখন হৃদয় খুলতে মানা।')

যতীন দাসের মৃত্যুতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিচলিত হবার এক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, "শেষ পর্যন্ত যতীন দাসের মৃত্যু হল। এই সংবাদ যখন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল, সেইদিন গুরুদেব মনে যে বেদনা পেয়েছিলেন তা ভুলবার নয়।…শেষ পর্যন্ত মহড়া ('তপতী' নাটকের) বন্ধ করে দিলেন। সেই রাত্রেই লিখলেন 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ' গানটি। 'তপতী' নাটকে এটিকে পরে জুড়ে দিলেন। এই গানটি যে তাঁর অন্তরের কী তীব্র বেদনার প্রকাশ, আজ সে-কথা হয়তো অনেকেই জানেন না।"

(সূত্র: 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ', চিন্মোহন সেহানবীশ, পৃষ্ঠা: ৬২)

আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, যতীন দাসের মরদেহ যখন লাহোর থেকে কলকাতায় আসে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সেই মরদেহ নিয়ে মিছিলের নেতৃত্ব দেন। (সূত্র : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা', সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১২)

কিন্তু, এত আত্মবলিদান, এত নির্যাতনেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির ঘুম ভাঙতে চাইছিল না। ২০শে জানুযারী, ১৯৩০ তারিখে কর্তৃপক্ষের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ভগৎ সিং তাঁদের দাবীর কথা, সরকারী আশ্বাসবাণী'র কথা মনে করিয়ে দিলেন। প্রতিবাদ করলেন রাজবন্দীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে। এরও কোন জবাব না পেয়ে ২৮শে জানুয়ারী ১৯৩০ তারিখে লাহোর মামলার বিচারক স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে দিল্লীর সরকারেব হোম মেম্বারের কাছে এক দীর্ঘপত্রে, ভগৎ সিং তাঁদের দাবীর পুনরাবৃত্তি করে ফের অনশন সংগ্রামের হুঁশিয়ারী দিলেন। সরকার ফের নিরুত্তর রইল। বাধ্য হয়ে ভগৎ সিং তাঁর সাথীদের নিযে ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফের দু সপ্তাহের অনশন সংগ্রাম শুরু করলেন। এবার জেলের ভেতরে বাইরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হোল। জেলের বাইরে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে উঠল, ভগৎ সিং-এর দাবীর সমর্থনে। দ্বিতীয় দফার অনশনেও চলেছিল আগের মতই জববদস্তি ফিডিং। রাজবন্দীদের শরীর ও মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আন্দোলন ভাঙ্গবার চক্রান্তও হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হল ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীদের। সরকার বাধ্য হোল রাজবন্দীদের দাবী মেনে নিতে।

শিব বর্মা এই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে: "হাসপাতালে আমাদের সবাইকে এনে একত্রিত করা হল। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকেও আনা হযেছিল। খাটের ওপর রাজগুরু শুয়ে আছে। (ফোর্সড ফিডিং-এ ফুসফুসে দুধ চলে যাওয়ায় তিনি ন্যুমোনিয়ায আক্রান্ত হয়ে অসহ্য কষ্ট পেয়েছেন) আমরা রাজগুরুকে ঘিরে বসলাম। আলোচনা হল আমাদের। আমরা অনশন সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নিতে স্বীকৃত হলাম। ভগৎ সিং দুধের গেলাস রাজগুরুর মুখের কাছে ধবে বলল, 'আগে-ভাগে পালাতে চেয়েছিলে বন্ধু!'

"রাজগুরু বলল, 'ভেবেছিলাম যে আমি আগে গিয়ে তোমার জন্যও একটা কামরা 'বুক' করে রাখি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে পরিচারক ছাড়া তুমিও তো যেতে পারবে না বন্ধু!' (সান্ডার্স হত্যার পরবর্তী পলায়ন পর্বে, রাজগুরু, ভগৎ এর সঙ্গে চাকরের বেশে ট্রেনে চেপে পালিয়েছিলেন)।

"ভগৎ সিং রাজগুরুর গালে মৃদু একটা টোকা দিয়ে বলল, 'নাও, এখন দুধটুকু খাও। কথা দিচ্ছি তোমাকে আর আমি সুটকেশ মাথায় করে বইতে বলব না!

"দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল।" ('শহীদ স্মৃতি')।

*

ছাত্র সমাবেশে ভগৎ সিং-এর শুভেচ্ছা বার্তা :

১৯২৯ সালের, ১৯শে অক্টোবর লাহোর শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সারা পাঞ্জাব ব্যাপী দ্বিতীয় ছাত্র সম্মেলন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে আসেন।

১৯৩০-৩১ সালের দেশব্যাপী আসন্ন গণজাগরণের কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল এই সম্মেলন। বটুকেশ্বর দত্তেব সঙ্গে যুক্ত স্বাক্ষরে এই শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছয় সম্মেলনে। প্রকাশ্য সম্মেলনে ভগৎ সিং-এর এই বার্তা পড়ে শোনান হয়। পড়া শেষে, উচ্ছ্বসিত আবেগে, সারা ছাত্র সম্মেলন ফেটে পড়ে হাততালিতে। স্বতস্ফূর্ত স্লোগান ওঠে, 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ'। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভগৎ সিং-এর সেই শুভেচ্ছা বার্তাটির বয়ান হল এইরকম :

"কমবেড, আজ আমি আপনাদের হাতে বোমা পিস্তল তুলে নেবার আহ্বান জানাব না। আজ ছাত্রদের সামনে আরো বড, আরো মহৎ কাজেব দায়িত্ব এসেছে। জাতীয কংগ্রেসের আসন্ন লাহোর অধিবেশন থেকে দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে তীব্র সংগ্রামের আহ্বান জানাতেই হবে। জাতির ইতিহাসেব এই সংকটময যুগসন্ধিক্ষণে, যুবকদের কাঁধে বিরাট দায়িত্ব-কর্তব্যের বোঝা চাপবে। এটা স্বীকৃত সত্য যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনারা যুবকবাই মৃত্যুবরণ করছেন, অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে। সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যুবকরা নিশ্চই আবার আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে তাদের বিপ্লবের প্রতি অবিচল আস্থা ও আত্ম-বিশ্বাসেব পবিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করবেন না। আজ সময এসেছে, যুবক সমাজকেই দেশের সুদূর কোণায কোণায বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। শিল্পাঞ্চলে, বস্তিবাসী ও গ্রামেব জীর্ণ-কুটীর নিবাসী কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে, জাগাতে হবে আপনাদেরই। তবেই স্বাধীনতা আসবে। তবেই একদিন মানুষের দ্বারা, মানুষের হাতে মানুষের শোষণ বন্ধ হবে। আমাদের পাঞ্জাব প্রদেশকে রাজনৈতিক দিক থেকে পিছিযে পড়া জাযগা বলা হয়। আপনাদের প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে হবে, এটা ভুল। যুবক সমাজকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। বীব শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের কাছ থেকে উপযুক্ত প্রেরণা গ্রহণ করুন। দেশ ও জনগণের প্রতি আকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে অনুপ্রাণিত হোন। দেশের যুবকবা প্রমাণ কবে দিন যে আসন্ন স্বাধীনতাব যুদ্ধে স্থিব, দৃঢ়সংকল্প ও প্রতিজ্ঞায় অবিচল উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীর যোদ্ধা আপনারা।"

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির সপক্ষে ভগৎ সিং :

আজকাল গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি সকলেবই সুপরিচিত। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে এই ধ্বনি ছিল অপরিচিত এবং এই স্লোগানের জন্য গ্রেপ্তারও বরণ করতে হোত। ভগৎ সিং-ই প্রথম এই ধ্বনির তাৎপর্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করে গণআন্দোলনের ময়দানে একে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন।

কিন্তু রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তৎকালীন সময়ের নতুন এই ধ্বনি ও স্লোগানটির অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার বিষয়ে বেশ বিভ্রান্তিও শুরু হয। প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বহুল প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী পত্রিকা 'মডার্ন রিভিউ'-এ এই স্লোগান সম্পর্কে এমনি একটি বিভ্রান্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সংখ্যায়। প্রবন্ধটি শুরু হয় পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালায় নওজওয়ান ভারত সভার এক সমাবেশে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দেবার অপরাধে ছাত্র-যুবকদের

গ্রেপ্তারীকে কেন্দ্র করে। বৃদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, তাঁর কাছে এই 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানটি নাকি প্রায়ই অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য মনে হয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই স্লোগানের সঠিক অর্থ কি ? বিপ্লব বা বৈপ্লবাত্মক কার্যাবলী অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাবে এবং সেই অর্থে তাকে দীর্ঘজীবী হবার শুভকামনা জানানোর ইচ্ছাই যে এই স্লোগানের প্রাণসত্তা, তার সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারছিলেন না। তিনি তাই আতঙ্কিত হয়ে লিখলেন, 'এই ধরনের অবিচ্ছিন্ন বিপ্লব হয়ত কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিন্তু এর দ্বারা দেশের প্রগতি, উন্নতি এবং জনসাধারণের আলোকপ্রাপ্তির কাজ প্রায় কিছুই হবে না।' স্ববিরোধী কথায় তিনি লিখলেন, 'এটা অবশ্য নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে একবার বা একটিমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আকাঙ্ক্ষিত চরম বা চূড়ান্ত উন্নতি, প্রগতির ফল উৎপাদন করা সম্ভব নয় এবং সেই কারণেই একটা বিপ্লবের পর পুনরায পরিবর্তন ঘটানো অত্যাবশ্যক। কিন্তু তার জন্য ফের বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই, বিবর্তনের পথেই এটা হাসিল করা সম্ভব। হ্যাঁ, হযত বিপ্লবের প্রযোজন হতে পারে, কিন্তু সেটা বহু বহু যুগ পরে এবং কয়েক শতাব্দী পার কবে। কিন্তু 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' এই স্লোগানে তো এইসব কথাব ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় না।'

জেলের অভ্যন্তরে সে সময় ভগৎ সিং গভীর অধ্যয়নেব যে সাধনা চালাচ্ছিলেন, তারই সূত্রে তিনি এই প্রবন্ধটির সংস্পর্শে আসেন। প্রবন্ধটির বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ক্ষতিকারক দিকটি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার জন্য, ভগৎ আদালতের বিচারকের মাধ্যমে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, জবাব পাঠালেন। চিঠিটি পরবর্তীকালে লাহোবের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয। ভগৎ সিং-এর লেখা জবাবটি ছিল এইবকম (এতে ভগৎ ও দত্ত, দুজনেরই সই ছিল) ঃ

"...আপনার মত একজন বয়ঃবৃদ্ধ, অভিজ্ঞ এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক, যাকে প্রতিটি আলোকপ্রাপ্ত ভারতবাসী শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাঁর রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক করে খণ্ডন করা ও বিরোধিতা করার ধৃষ্টতা আমি দেখাব না। তা সত্ত্বেও, আমরা মনে করি, এটা আমাদের দায়িত্ব, ঐ ধ্বনির মাধ্যমে কি বোঝাতে চাইছি, সেটা সকলের কাছে ব্যাখ্যা করা। কারণ এই স্লোগানকে আজকের পরিস্থিতিতে এদেশে জনপ্রিয় করে তোলার কাজটা আমাদেরই করতে হবে।

" 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানের স্রষ্টা আমরা নই। রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে উঠেছিল এই স্লোগান।...এর অর্থ এমন নয় যে, রক্তক্ষয়ী নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। অথবা স্বল্পক্ষণের জন্যও কোন ব্যবস্থা স্থির থাকতে পারবে না। বহুল ব্যবহারের ফলে এই স্লোগানের এক নতুন গুরুত্ব, নতুন তাৎপর্য সৃষ্টি হয়েছে যেটা হয়তো ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এই স্লোগানের যে প্রাণসত্ত্বা ও মর্মার্থ, তাকে এইসবের থেকে পৃথক করা চলে না। রাজনীতিতে যেসব স্লোগান ব্যবহার করা হয়, বিচার করলে দেখা যায়, সেগুলি প্রায় সমস্তই, সাধারণ অর্থে গৃহীত, ব্যঞ্জনা বা প্রকাশ। এই সাধারণ

অর্থের মধ্যেই, নিহিত থাকে, আংশিক ভাবে, তার সহজাত স্বাভাবিক অর্থ এবং আংশিকভাবে বহুল ব্যবহার সূত্রে অর্জিত বা প্রাপ্ত অর্থ।

"উদাহরণত : আমাদের 'যতীন দাস দীর্ঘজীবী হউক' বা 'Long live Jatin Das' স্লোগান। যতীন দাস শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। আমরা তাহলে নিশ্চয়ই যতীন দাসের শারীরিক দিক থেকে বেঁচে ওঠার অর্থে এই স্লোগান দিচ্ছি না। এই স্লোগানের মাধ্যমে আমরা বলতে চাইছি যে, যতীন দাসের জীবনের মহান আদর্শ এবং সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য, শহীদের মৃত্যুবরণ করতে গিয়ে যে দুর্জয়, দুর্দমনীয় সাহসের সঙ্গে অকথ্য অত্যাচার ও যন্ত্রণা সইবার হিম্মত তিনি দেখিয়েছেন, সেইটা দীর্ঘজীবী হউক। এই স্লোগানের মাধ্যমে আমরাও যাতে শহীদ যতীন দাসের মত আদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, অচঞ্চল সাহস প্রদর্শন করতে পারি তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করি। এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে আমরা যতীন দাসের তেজস্বিতা ও তাঁর জীবনীশক্তির উল্লেখ করি।

"একইরূপে 'বিপ্লব' এই কথাটার অবিকল আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা উচিত হবে না। এই শব্দটির ওপর সদিচ্ছায় ও অসদিচ্ছায় নানান অর্থ ও তাৎপর্য চাপান হয়েছে। দেশের শাসক-শোষকশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত দালাল বা প্রতিনিধিত্বকারী এজেন্সীগুলির কাছে 'বিপ্লব' মানেই হল রক্তাক্ত, ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ একটা কর্মকান্ড। অপরদিকে, বিপ্লবীদের কাছে এটি একটি পবিত্র শব্দগুচ্ছ। প্রসঙ্গক্রমে, দিল্লীর সেসন জাজের আদালতে, আইনসভায় বোমাকাণ্ডের মামলা সূত্রে আমরা 'বিপ্লব' কথাটার তাৎপর্য ও অর্থ বিশদ ব্যাখ্যা করেও বলেছি।...

"এই শব্দগুচ্ছে বা স্লোগানে 'বিপ্লব' কথাটিকে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির পথে পরিবর্তন ঘটাবার আন্তরিক ইচ্ছার তাৎপর্য বা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষ সাধারণভাবে প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গেই একাত্ম হয়ে পড়ে। পবিবর্তনের চিন্তা এলেই তারা কাঁপতে শুরু করে। মানুষের এই নিশ্চেষ্ট অলস মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাবার জন্যই চাই, এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের নৈতিক চেতনাশক্তি সম্বলিত শব্দগুচ্ছ বা স্লোগান। ...পুরানো সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অবধারিত। নতুন সমাজের জন্য তাকে পথ ছেড়ে দিতেই হবে। যাতে আজকের তথাকথিত 'ভাল' ব্যবস্থাগুলি সারা দুনিয়াকে কলুষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত করতে না পারে। এই অর্থে, এই উদ্দেশ্যেই আমরা স্লোগান তুলি, 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'।"

একজন সামান্য ২২ বছরের যুবক ভগৎ সিং। তাঁরই লেখনী থেকে নির্গত হয়েছে এই অগ্নিক্ষরা, যুক্তি-সমৃদ্ধ অপূর্ব ব্যাখ্যা। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে, বয়োবৃদ্ধ ও জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কলমের বিরুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুন্সিয়ানার ঐতিহাসিক জবাব এই চিঠিটি। চিন্তার গভীরতার স্বাক্ষর এই জবাব।

ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯)-র বিচার :

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের সাজান ষড়যন্ত্র মামলার বিচার ছিল, ভগৎ সিং-সহ

অন্যান্য বন্দীদের কাছে এক জঘন্য প্রহসন। এই সাজান বিচারসভায় নিজেদের বাঁচাবার জন্য কোন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কাজ করেনি ভগৎ সিংদের ওপর। তারা মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই যে কোন চরম পবিণতির জন্যই তৈরি ছিলেন। ফলে, আদালতী কাজ-কারবারে অংশ নিতে, ভগৎ সিংদের কোন উৎসাহ ছিল না। সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও অবহেলার দৃষ্টিতে তাঁরা বিচারব্যবস্থাকে তাচ্ছিল্য করেছেন। ভগৎ সিং আদালতের কাজ কর্মকে বিশেষ কৌশলে বাধাগ্রস্ত করতেন ও এড়িয়ে যেতেন।

ভগৎ সিং-এর কৌশলের অন্যতম ছিল আদালত কক্ষে বিপ্লবী গণসঙ্গীত গাওয়া ও উচ্চস্বরে স্লোগান দেওযা। সাথী রাজবন্দীরাও তাঁর গা'ন ও স্লোগানে গলা মেলাতেন। একটা সময় এল যখন বিরক্ত হয়ে ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীরা, আদালতে হাজির হতেই অস্বীকার করলেন। তখন, পুলিশ জবরদস্তি তাঁদের আদালতে হাজিব করাত। সবকারী নথি নির্ভর এমনি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ তারিখে ভগৎ সিং-কে আদালতে হাজিব করা হলে, তিনি কাকোরী মামলায শাস্তি প্রাপ্ত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে গান শুরু করলেন। অন্যরাও তাঁব সঙ্গে যোগ দিলেন।

২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩০ তারিখে ভগৎ সিং-সহ সমস্ত রাজবন্দীরাই আদালতে এল গলায় লাল রুমাল জড়িয়ে। লেনিন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই বিপ্লবী স্লোগান দিতে থাকল। 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ', 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল জিন্দাবাদ', 'মহান লেনিন অমর রহে', 'Lenin's name will never die', 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'Down with Imperialism', 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'। ভগৎ সিং-এর পর, লেনিনেব মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে, একটি টেলিগ্রামের কপি আদালতে দাঁড়িযে পড়তে থাকেন :

"আজ, লেনিন দিবসে, আমরা তাদের সকলকেই আমাদের হৃদযেব উষ্ণ অভিনন্দন পাঠাই, যারা মহান বিপ্লবী লেনিনের নীতি ও আদর্শ সামনে রেখে, কিছু না কিছু কাজ করে চলেছেন। রাশিযার বুকে এগিয়ে চলা সামাজিক, অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা গুলিরও সাফল্য কামনা করি আমরা। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সঙ্গেও আমরা একাত্মতা প্রকাশ করি। সর্বহারার জয় অবধারিত। পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুও আসন্ন।"

মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভাপতির কাছে এই টেলিগ্রাম বার্তাটি পাঠাতে চাইলেন ভগৎ সিং। কিন্তু আদালত অনুমতি দিল না।

ভগৎ-সহ অন্যান্য বন্দীদের ক্রমাগত বাধাদান, গরহাজিরা, আত্মপক্ষ সমর্থনে উকিল নিয়োগে অস্বীকৃতি ইত্যাদি নানান কারণ দেখিয়ে সরকারী নয়া অর্ডিনান্স বলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে 'গদর' বন্দীদের বিচারের নামে যেমন এক বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছিল, তেমনি আবার একটি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হল। বিচারকদের মধ্যে কোল্ডস্ট্রিম হলেন চেযারম্যান। আর আগা হায়দার ও জি-সি হিল্টন হলেন ট্রাইবুন্যালের সদস্যবৃন্দ।

এই জাস্টিস হিলটনের কাছেই ভগৎ সিং পূর্বে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছিলেন। কারণ লাহোরের এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দৈনিক পত্রিকা 'দি সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট-এ' বিভ্রান্তিকব মিথ্যা খবর ছাপা হযেছিল। লেখা হয়েছিল ভগৎ সিংবা আদালত বযকট করেছেন। যে সংবাদ ছিল সর্বৈব মিথ্যা। ভগৎ এই প্রতিবাদপত্রে ঐ সংবাদেব বিরোধিতা করে জানিযেছিলেন, কি কারণে তাবা আদালতের কাজে অংশ নিচ্ছেন না। আসলে সে কারণগুলি ছিল, যেমন বন্দীদেব পরস্পবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও মামলার ব্যাপারে আলোচনা কবতে না দেওযা। আদালতে ভগৎকে সাহায্য করার জন্য একজন পবামর্শদাতা উকিল নিয়োগে বাধাদান। কমবেড ক্রান্তি কুমার, যিনি আদালতের কাজে বন্দীদেব সহযোগিতা করছিলেন, তাকে মিথ্যা মামলায় জেলে আটক করা। বন্দীদের দৈনিক কাগজ দেওযা বন্ধ করা। ঐ পত্রে ভগৎ বলেন, 'এইভাবে নাটক বা প্রহসনে পরিণত কবা হচ্ছে বিচার পদ্ধতিকে। আমরা আসলে আত্মপক্ষ সমর্থনে যথাযোগ্য সাহায্য পাচ্ছিনা। ...অসুবিধাগুলি দূর করা হলে আমরা আদালতের কাজে অংশ নেব।'

অবশেষে বিশেষ আদালত, লাহোরের 'পুঞ্চ হাউসে', ৫ই মে ১৯৩০ তারিখে, সকাল ১০টায তাব কাজ শুরু করল। ১০টা ১০ মিনিটে ভগৎ সিংদের আদালতে হাজিব করা হল। হাজির হযেই তাঁরা স্বল্পক্ষণ বিপ্লবী স্লোগান দিলেন। তাবপব প্রায ৮ মিনিট বিপ্লবী গান গাইলেন সমবেত কণ্ঠে। এরপর বিচারসভা শুরু হল।

ভগৎ সিং এবাব দাঁডিযে উঠে দাবী করলেন, 'এই বিচারসভা আগামী ১৫দিন বন্ধ বাখা হোক। কাবণ, যে অর্ডিনান্সবলে এই বিশেষ আদালত গঠন কবা হয়েছে তার বিরুদ্ধে যুক্তি-তত্ত্ব প্রস্তুত করবাব সময় চাই। আমরা মনে কবি এই বিশেষ আদালত আইন মোতাবেক তৈরি করা হযনি।' আদালত ভগৎ-এর দাবী নস্যাৎ করে দিলো। Mr. M. C. H Cardon Noad ছিলেন সবকাবী পক্ষের উকিল। তিনি ভগৎ সিং-সহ অন্যান্য বন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাযের করলেন। ভগৎ সিংদেব ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে বোমা তৈরি ও তার ব্যবহার করে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, খুন, ডাকাতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল।

এরপর অন্যতম অভিযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল উঠে দাঁডালেন। তাঁব হাতে ভগৎ সিং-এর তৈরি করা বিবৃতি। যে পাঁচজন বিপ্লবীকে দলের পূর্ব সিদ্ধান্ত মত নিজেরাই নিজেদের পক্ষে লডবেন বলে নির্দেশ দেওযা হয়েছিল, জে. এন সান্যাল তাদেব অন্যতম। বাকিরা হলেন বটুকেশ্বর দত্ত, মহাবীর সিং, ডাঃ গযাপ্রসাদ ও কুন্দনলাল। এদের ওপর দায়িত্ব ছিল সরাসরি সরকাব ও তার আদালতের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানানো। কারণ, ঐ আদালত বিদেশীদের দ্বারা তৈরি এক পরদেশী শত্রু সরকারের আদালত।

ভগৎ সিং-এব প্রস্তুত করা এই বিবৃতিটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবৃতি। তিনি লিখেছিলেন, "এ মামলাব কার্যাবলীতে আমরা অংশ নিতে চাই না। কারণ, এই সরকারকেই আমরা স্বীকার করি না। আমরা ঘোষণা করতে চাই মানুষই সমস্ত কর্তৃত্বের উৎস। কোন সরকার বা তার প্রতিনিধি কর্তৃত্বের দাবী করতে পারে না, যদি না তাদের কর্তৃত্বের

অধিকার জনগণের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে, জনগণের দ্বারা আসে। যেহেতু এই সরকারের ক্ষমতায় আসাটা এই নীতি বা আদর্শের বিরোধী, সেইহেতু এর অস্তিত্বই বেআইনি ও অসঙ্গত।...এই সরকার 'ল এন্ড অর্ডার' তথা আইনের শাসনের ধারক ও বাহক সেজে নিজেই শান্তি ভঙ্গ করে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। জনসাধারণকে হত্যা করে এবং সবরকম অপরাধজনক কাজ করে।"

ভগৎ জে. এন সান্যালদের পক্ষে আরও লিখলেন, "আমরা বিশ্বাস করি মানুষের প্রয়োজনেই 'ল এন্ড অর্ডার'। কিন্তু এখানে ঘটছে বিপরীত। এখানে 'ল এন্ড অর্ডার' ব্যবস্থার প্রয়োজনেই যেন মানুষ।...বর্তমান সরকারের আইন তৈরিই হয়েছে বিদেশী শাসকদের স্বার্থরক্ষায়। আমাদের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছে এই আইন। কাজেই, এর সঙ্গে জনগণের কোন নৈতিক যোগাযোগ নেই। সুতরাং সমস্ত ভারতীয়দের এটাকে অবজ্ঞা করা, বাধা দেওয়া ও অমান্য করা অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।...আমরা জানি, এই সব আদালত হচ্ছে সাজান মঞ্চ, যেখানে বিচারের নামে এক মিথ্যার পালা অভিনীত হয।"

বিশেষ আদালতের বিচারকরা আর সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। এবার তাদের নির্দেশে পুলিশ জে. এন. সান্যালের হাত থেকে ভগৎ সিং-এর লেখা বিবৃতিটি কেড়ে নিল।

জে. এন. সান্যাল তীব্র প্রতিবাদ করে শেষ অংশটি পড়বার দাবী করলেন। যে কটি লাইনে লেখা ছিল :

"এই কারণেই আমরা এই প্রহসনের অংশীদার হতে রাজী নই। এবং পরবর্তীকালে মামলার কোন কার্যাবলীতেও আমরা যোগ দেব না।"

১২ই জুন, ১৯৩০ তারিখে আদালতের মধ্যে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিশেষ ট্রাইবুন্যালের সভাপতিত্বকারী বিচারক মিঃ কোল্ডস্ট্রিম ভগৎ-এর এক সাথীর আদালত কক্ষে গাওয়া এক গানকে কেন্দ্র করে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। নামে 'কোল্ড' হলেও বিচারক সাহেব মাথা গরম করে আসামীর হাতে হাতকড়া পরাবার আদেশ দেন! হাতকড়া পরান নিয়ে বন্দীদের সঙ্গে পুলিশের গোলমাল বাধে। পুলিশ বলপ্রয়োগ করে জবরদস্তি তাদের জেলে ফেরৎ নিয়ে যায়। বন্দীদের পক্ষ থেকে আদালত বয়কট করা হয় এবং দাবী ওঠে ঐ বিচারকদের প্রকাশ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে, অথবা এই আদালত থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।

শেষে চাপে পড়ে, বিচারক মিঃ কোল্ডস্ট্রীমকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এরই সঙ্গে অপর একজন বিচারক, আগা হায়দারকেও সরকার সরিয়ে নেয়। কারণ আগা হায়দার মিঃ কোল্ডস্ট্রিম ও হিলটনের কাজকে সমর্থন না করে তাদের হাতকড়া পরাবার আদেশের বিরোধিতা করেছিলেন।

২৩শে জুন, ১৯৩০ তারিখে বিচারক মিঃ হিলটনকে ট্রাইবুন্যালের সভাপতিত্ব করতে দেখে, বন্দীরা তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। তারা দাবী করেন. বন্দীদের অপমান

করে হাতকড়া পরাবার জন্য মিঃ হিলটনকেও আদালত কক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে অথবা ঐ পদ থেকে সরে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গেই ২৫শে জুন, ১৯৩০ তারিখে ভগৎ সিং স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালেব কমিশনারের কাছে এক কড়া প্রতিবাদ পত্র পাঠান। এই পত্রে ভগৎ লেখেন, 'বিশেষ আদালতের সভাপতিকে অপসারিত করে অবস্থার কোন পরিবর্তনই ঘটান হল না। কারণ বিচারক মিঃ জি. সি. হিলটন যিনি ঐ হাতকড়া পড়াবার অপমানজনক আদেশের অংশীদার ছিলেন তিনিই অপসারিত বিচারক মিঃ কোল্ডস্ট্রিমের আসনে বসেছেন। যে কাণ্ডটা আপনারা করলেন সেটা হল কাটা ঘায়ে আপনারা নুন ছিটালেন। অপমানকর অবস্থার কোন পরিবর্তনই ঘটালেন না।'

জে. এন. সান্যাল, বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ ৫জন আসামীর কাজ ছিল উকিলের সাহায্য না নিয়ে, আদালত মঞ্চকে সরাসরি আক্রমণ করে, তার আইনগত অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ জানান। শত্রু সরকারের আদালতকে গ্রাহ্য না করে, রাজনৈতিক ভাবে তাকে আক্রমণ করা।

অপরদিকে, ভগৎ সিং-দের কাজ ছিল একইভাবে কোন উকিলের সাহায্য না নিয়ে আদালতকে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে, সরকারী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করা, আদালতের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা, রাজনৈতিক বক্তৃতা করা এবং আদালতের কার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করা। এই সূত্রে সাথীদের পরামর্শে ভগৎ একজন উকিলের সাহায্য দাবী করেন। যে উকিলের কাজ হবে আদালতের কার্যক্রম লক্ষ করে ভগৎকে তার লড়াই-এর কাজে আইনগত পরামর্শ দেওয়া। দীর্ঘ টালবাহানার পর আদালত আইনজীবী উমির্চাঁদকে ভগৎ-এর আইনী পবামর্শদাতা হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেয়।

কিন্তু আদালতী কাজ-কাববারের প্রতি ভগৎ সিং তেমন কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেন না। তাঁর মূল লক্ষ্য, বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও জ্ঞানের জগতে জেলে বন্দী থেকেও, মুক্তমনে সর্বাত্মক বিচরণ করা। জ্ঞানার্জনের প্রতি ভগৎ-এর আগ্রহ দেখে মনেই হোত না কিছুদিনের মধ্যেই এই সাজান আদালত তাঁকে প্রায় নিশ্চিত ফাঁসির হুকুম দিতে চলেছে এবং সে সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ আছে। নিরুদ্বিগ্ন, নির্লিপ্ত মনে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও, তাই ভগৎ চিঠি লিখে বন্ধু জয়দেব গুপ্তকে বইপত্রের এক বিশাল ফর্দ পাঠালেন ; অবিলম্বে সেগুলি জেলে সরবরাহ করার জন্য। ২৪শে জুলাই, ১৯৩০ তারিখের সেই পত্রটি এইরকম :

"প্রিয় জয়দেব,

"নিম্নের বইগুলো দ্বারকাদাস লাইব্রেরী থেকে আমার নামে সংগ্রহ করে, কুলবীরকে (ভগৎ-এর ছোট্ট ভাই) দিয়ে আগামী রবিবার পাঠাও।

"১। Militarism (Karl Liebknecht) ; ২। Why Men Fight (B. Russel) ; ৩। Soviets at Work ; ৪। Collapse of Second International ; ৫। Left Wing Communism ; ৬। Mutual Aid (Prince Kropotkin) ; ৭। Field,

Factories & Workshop; ৮। Civil War in France (Marx); ৯। Land Revolution in Russia; ১০। Spy (Upton Sinclair)।

"পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরী থেকে আর একটা বই সংগ্রহ করে পাঠাও, যার নাম, Historical Materialism (Bukharin)। এর সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরিয়ানের কাছে খোঁজ নিও বোর্স্টল জেলের সাথীদের জন্য তিনি কিছু বই পাঠিয়েছেন কিনা। ঐ জেলে ভয়ংকর বই-এর ঘাটতি চলছে। সুখদেবের ভাই, জযদেবের মাধ্যমে ওরা বই-এর একটা ফর্দও পাঠিয়েছে। কিন্তু ওরা এখনো অবধি কোন বই-ই পায়নি।...আমি আগামী রবিবার বোর্স্টল জেলে যাব, তুমি দেখো এর মধ্যেই যাতে তাবা বই পায। এই কাজটা অবশ্যই কবতে হবে। এটা অবশ্যই মনে রেখো।...কিছুদিন বাদে আর তোমাকে এমন কষ্ট দেব না!"

জেলে পডবার জন্য বই-য়ের নাম ও বিষযগুলিই প্রমাণ করে, ঐ সময, মৃত্যুর ফটকের সামনে দাঁডিয়ে কী আশ্চর্য প্রাণশক্তি, কী দৃঢ আত্মপ্রত্যযের সঙ্গে, ভগৎ সিং রাজনীতি, সমাজনীতি, সামরিক তত্ত্ব, দর্শন -এর মত জটিল ও কঠিন বিষযে গভীরভাবে অধ্যযন করতে আগ্রহী ছিলেন।

ভগৎ সিং-এর অধ্যযনের প্রতি গভীব নিষ্ঠায, সমস্যায় পড়েছিল জেল কর্তৃপক্ষ। কারণ, ভগৎ-এর ফরমাসে এত ঘনঘন নানান বই আসত যে, তাদেব পক্ষে সে সমস্ত বই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ছাডপত্র দেওযা এক কঠিন কাজ হযে দাঁডিযেছিল। একদিন জেলার সাহেব ভগৎকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'Do you really read these Books? I find it difficult to censore them, rather find no time' (তুমি সত্যিই কী এইসব বইগুলো পড? আমি তো দেখছি এত বই পডাব সময করে তাকে পরীক্ষার ছাড়পত্র দেওযা এক সমস্যা হয়ে দাঁডাচ্ছে।)

ভগৎ সিং-এর জবাব শুনে জেলার সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভগৎ শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'I do read these Books and you can pick any of them and ask me a question about any Chapter. I shall tell you what is written in there.' (আমি বইগুলো পড়ি। আপনি এইসব বই থেকে যে কোন একটা বেছে নিন। এবার সেই বই-এর যে কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। কি সেখানে লেখা আছে আমি বলে দিতে পারব।)।

এই ধরনের বলিষ্ঠ জবাবের এক কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের আর এক মনীষী, তপস্বী যুগস্রষ্টা পুরুষ সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামী বিবেকানন্দের মুখে। ঐ একই প্রসঙ্গে লাইব্রেরিয়ানের হতবাক হওয়া প্রশ্নের সামনে তিনিও নাকি ঐ একই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। লাইব্রেরী থেকে বিবেকানন্দের অত ঘন ঘন বই-এর চাহিদা দেখে সন্দেহ হয়েছিল লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোকের। বিবেকানন্দের গভীর ধীশক্তির পরিমাপ করতে পারেননি তিনি। (সূত্র : 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' পৃ-৪৬-৪৭)।

একইভাবে সেই সময় জেলার সাহেব ভগৎকে অবমূল্যায়ন-জনিত প্রশ্ন করে চমকে উঠেছিলেন। ভগৎ সিং সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নে ভারতবাসী আজও যেন তেমন আগ্রহী নয়। ভারতবর্ষের মাটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন অনেকেই। সকেলেই শ্রদ্ধেয। সকলেরই যথার্থ মূল্যাযন প্রয়োজন।

কিন্তু সকলেব মধ্যে ভগৎ সিং-এক অনন্য, অসাধারণ, অতুলনীয় চরিত্র। তিনি শ্রদ্ধেয শহীদকূলে যেন শহীদ-সম্রাট। শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং।

জেলে ভগৎ সিং-এর ববীন্দ্রনাথ চর্চা :

জেলে ভগৎ সিং-এব পড়াশুনা ছিল এক আদর্শ ছাত্রেব তুল্য। বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নোটবই-এ প্রযোজনীয নোট রাখতেন। মন্তব্য লিখতেন। জটিল বিষযের সংজ্ঞা নির্ণয করতেন। এই সমস্ত কাজই তিনি করে গেছেন অবধারিত ফাঁসিব সাজা মাথায় নিয়ে। এই দুর্ধর্ষ মানসিক শক্তিই তাঁকে জেলের অভ্যন্তরে ‘কেন আমি নাস্তিক’ পুস্তিকাটি লিখতে আগ্রহী করেছিল।

এই প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ’ গ্রন্থে, ভগৎ সিং-এর রবীন্দ্রনাথ চর্চা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখপর্বটি এইরকম :

“...এবার ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের আর এক শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর কথা বলব—সর্দার ভগৎ সিং। শুনেছিলাম ভগৎ সিং মৃত্যুদণ্ডের পর ‘Condemned Cell’-এ বসে শেষদিন অবধি নানা ধরনের বই পডতেন এবং প্রচুর ‘নোট’ লিখতেন একটি বড়ো খাতায়। কিছুদিন আগে আমাব সেই ‘নোট’ বইয়ের একটি পুরো Xerox কপি দেখার সুযোগ হল নেহরু মিউজিযামের ডিরেক্টর ডঃ রবীন্দ্রকুমারেব সৌজন্যে। খাতাটি শুরু হয়েছে এঙ্গেলসের ‘Origin of Family, Private Property and State’-গ্রন্থ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ‘নোট’ দিযে একেবারে পুরোদস্তুর অধ্যবসাযী ছাত্রেব মতো। তাবপর পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখলাম ভিক্টর হ্যুগো, আনাতোল ফ্রাঁস, বার্ট্রান্ড রাসেল, আপ্টন সিন্‌ক্লেযাবের লেখার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ থেকে দুটি উদ্ধৃতি—ভগৎ সিং-এব নিজের হাতে লেখা। পুরো নোটবইটি দেখার সময় ছিল না, হযতো রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে ‘নোট’ সেখানে আরো আছে এ-দুটি ছাড়াও।

“এর মধ্যে প্রথমটি হল জাপানী ছাত্রসমাবেশে রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি: ...লেখাটির (ভাষণটির) বাঁ পাশে, margin-এ ভগৎ সিং-এর হাতের লেখা পড়া যাচ্ছে, ‘Capitalism and Commercialism’।

“আর এক জাযগায় রবীন্দ্রনাথ থেকে এই উদ্ধৃতিটি লিখেছেন ভগৎ সিং :

“A judge callous to the pain he inflicts, loses the right to judge”.

“এর margin-এ ভগৎ সিং-এর লেখা পডা যায়— ‘A judge defined’।” (পৃষ্ঠা ১৭৬—১৭৮)।

ভগবতীচরণ ভোরার প্রয়াণ ও চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে ভগৎ সিং-এর মুক্তি প্রয়াস :

'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির' কমাণ্ডার-ইন-চীফ তথা সর্বাধিনায়ক, দলের শ্রদ্ধেয় নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ প্রথম থেকেই ভগৎ সিংকে দিল্লীর আইনসভায় বোমা নিক্ষেপের কাজে পাঠাতে রাজী ছিলেন না। দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে ও সুখদেবের চাপে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেও, চেয়েছিলেন যে, কমরেডরা অ্যাকসনের পর আইনসভা থেকে পালিয়ে আসুক। ভগৎ সিং-এর বিরোধিতায় এই সিদ্ধান্তও নেওয়া সম্ভব হয়নি।

শিব বর্মা লিখেছেন, "ভগৎ সিংকে এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সে (আজাদ) পাঠাবার পক্ষে ছিল না। কিন্তু ভগৎ সিং ও সুখদেবের পীড়াপীড়িতে নতি স্বীকার করে, আজাদ এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। কিন্তু অন্তর থেকে ভগৎ সিংকে হারাতে হবে এই ভাবনায় আজাদ দুঃখ বোধ করছিল।" ('শহীদ স্মৃতি')।

আজাদের নেতৃত্বে দলের কানপুর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বন্দীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার। যশপালের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়, আদালতে 'মূর্চ্ছা গ্যাস' প্রয়োগ করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার। কিন্তু, যে সব রাসায়নিক সহযোগে, এই কাণ্ডটা করা হবে, অনেক চেষ্টা করেও তার হদিশ মেলে না। ফলে আজাদের নির্দেশে নতুন পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়। ভগবতীচরণ ভোরাও এই পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশ নিতে আসেন। যশপালের যোজনা ছিল, সেন্ট্রাল জেলের সামনে, সরাসরি অ্যাকসন করে, যখন ভগৎ সিং ও দত্ত বাইরে বার হবে তখনই তাদের ছাড়িয়ে নেওযাটা সুবিধেজনক। কিন্তু জেলের মধ্য থেকে ভগৎ-এর মাধ্যমে গোপন খবর সংগ্রহ করে আজাদ বুঝতে পারেন, এই কাজটা সহজ হবে বোর্স্টাল জেলের সামনে। কারণ সেখানে সশস্ত্র পুলিশ থাকে মাত্র জনা পাঁচ ছয়েক। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় ১লা জুন ১৯৩০ তারিখে, ভগৎ সিং ও দত্তকে ছাড়াবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও আজাদের নির্দেশে ঠিক করা হয়, অর্থাৎ পালিয়ে ওরা যে বাংলোয় ছদ্মবেশে থাকবেন, পালাবার জন্য যে গাড়ির প্রয়োজন হবে, ইত্যাদি।

এই কাজে অংশ নেবার ক্ষেত্রে ভগবতীচরণ ভোরা প্রবল দাবী তোলেন। তিনি আজাদকে বলেন, 'আমি বিতর্কে যেতে চাইনা। তবে আমি চাই, দল আমাকে এই অ্যাকশনে অংশ নেবার সুযোগ দিক। যদি এই সংঘর্ষে আমার মৃত্যুও হয়, তাহলে পাঞ্জাবে ধন্বন্তরী, সুখদেবরাজ প্রমুখ যোগ্য সাথীরা দলের কাজ সামলে নেবে। সোহন (যশপাল), এই ঘটনার পর আজাদভাই-এর সঙ্গে দলের কাজে সাহায্য করবে। সে দলের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত। সুতরাং আমি চাই এবার সোহন এই অ্যাকশন থেকে বাইরে থাকুক।'

যশপাল বললেন, 'না তা হয় না। এক্ষেত্রে আমাকে এই অ্যাকশনে থাকতে না

দিলে তার খুব খারাপ প্রভাব পড়বে। লোকে ভাববে আমি নিজের জান বাঁচাবার জন্য সরে গেছি। অথবা এমনো প্রচার হতে পারে যে, আমার পরিকল্পনা গ্রাহ্য হয়নি বলেই, আমি এ কাজে সহযোগিতা করিনি।'

ভগবতী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'What nonsense! কি বাজে বকছ!' তারপর যশপালের পিঠে হাত রেখে শান্ত ধীর কণ্ঠে বললেন, 'তোমার ঐসব কথার কোন উত্তর হয় না। ভেবে দেখো, আমার বিরুদ্ধে কতই না অপপ্রচার হয়েছে। তাতে কি যায় আসে। না, না সব সময় আমি তোমার কথা রাখি। এবার তোমাকে আমার কথা রাখতে হবে।'

যশপাল মৌন থেকে সম্মতি জানাতে বাধ্য হলেন।

ইতিমধ্যে, ২৮শে মে ১৯৩০ তারিখে যশপাল আগামী অ্যাকশনের যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করার উদ্দেশ্যে চটজলদি বেরিয়ে গেছেন। তিনটে বোমার খোলে মশলা ভরে তাকে অসমাপ্ত অবস্থায রেখে, কাজের তাড়ায় চলে গেছেন যশপাল। ইতিমধ্যে অতি উৎসাহে, ভগবতীচরণ, বচ্চন ও সুখদেবরাজ এই তিনজনে ঐ অসমাপ্ত বোমার একটি তুলে নিয়ে, রাবী নদীর (ইরাবতী নদী) কিনারে, নির্জনে পরীক্ষা করার জন্য, চলে গেলেন। যশপাল ফিরে এসে সবে খোঁজ করছেন বোমার। হঠাৎ দেখা গেল বাড়ির সামনে একটা টাংগাগাড়ি এসে থামল। রক্তাক্ত দেহে গাড়ি থেকে নামল সাথী সুখদেবরাজ। সেই জানাল মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ। পরীক্ষার জন্য বোমা ছুঁড়তে গিয়ে ভগবতী মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। বচ্চনের আঘাত লাগেনি। সে আছে মৃত্যুপথযাত্রী ভগবতীর পাশে, হয়ত এতক্ষণে সব শেষ। ভগবতী শেষ কথা বলে গেছেন, 'ভগৎদের ছাড়াবার অ্যাকসন যেন বন্ধ না হয়।'

শেষকৃত্য করলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। সকলে মিলে চাদরে মোড়া ভগবতীর শবদেহকে রাবি নদীতে (ইরাবতী নদী) পাথর চাপা দিয়ে জলসমাধি দিলেন। যশপাল ভগবতীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'We must honour our Brave Leader and give him last salute'। সকলে সসম্মানে স্যালুট জানাল।

যশপাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ভগৎ সিংদের ছাড়াবার অ্যাকসন হবেই। ভগবতীর শেষ ইচ্ছা আমাদের পূর্ণ করতেই হবে।'

সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস থেকেই ভগৎ সিংদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। 'মূর্চ্ছা গ্যাস' প্রস্তুতি পর্বে সাফল্য মেলেনি। জেল ফটকের বিশেষ পাহারাদার বাহিনীর ওপর আচমকা আক্রমণ করে কাজ হাসিল করার বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনাও কার্যকরী হয়নি। দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও কমজোরী হয়ে আসছিল। কিছু কিছু কর্মীর বিশ্বস্ততার প্রশ্নেও সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল, দুর্বলতার কারণে। সবশেষে, আকস্মিক দুর্ঘটনায়, মর্মান্তিক মৃত্যু হল ভগবতীচরণ ভোরার। এসব আপাত অসুবিধেজনক অবস্থা সত্ত্বেও, চন্দ্রশেখর আজাদ ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে ছিলেন বদ্ধপরিকর।

সাথী যশপাল বলেছেন যে, জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার একটি যোজনা ছিল ভগৎ সিং-এর। বোর্স্টল জেলে সাথী বন্দীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে ভগৎ ও দত্ত যখন জেল ফটক থেকে বার হয়ে বেশ কিছুটা পায়ে হেঁটে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রিজনভ্যানের দিকে এগোবেন, সেটাই হবে অ্যাকসনের সুবর্ণসুযোগ।

১লা জুন, ১৯৩০ তারিখের সকালে, আজাদ যশপালকে নির্দেশ দিলেন, 'আজই বিকেল ৫টায় অ্যাকসন কবা হবে। ভগবতী এবং সুখদেবরাজেব জায়গায দলের কোন্ কর্মীকে নিতে চাও ঠিক করে নাও।'

দুর্গা দেবী (ভগবতীর স্ত্রী ও দলেব কর্মী-সমর্থক) ব্যাপারটা আঁচ করে আজাদের কাছে আরজি নিয়ে এলেন, 'আজকের আক্রমণে ওঁর (ভগবতীর) শূন্য স্থানে অংশ নেবার সুযোগ আমাকে দিন। সবচাইতে আগে এটা আমারই অধিকার।'

আজাদ অস্বস্তিব সঙ্গে যশপালের দিকে তাকালেন। দুজনেই বোঝালেন, 'না, না এখন তোমাকে এ কাজে নেওয়া যাবে না।'

দুর্গাদেবী জিদ ধরলেন, 'কেন ?'

আজাদের মত দৃঢ় চিত্তের সর্বাধিনাযকেরও চোখ ছলছল করে উঠল। কোনবকমে চোখ মুছে আজাদ বললেন, 'এসব ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা কবেই পা ফেলতে হবে ভাবীজী। তাছাড়া তোমার শিশুপুত্র শচীব প্রশ্নও আছে।'

দুর্গাদেবী আজ মরিযা। স্থিব কণ্ঠে সদ্য স্বামীহাবাব ব্যথা চাপা দিযে বললেন, 'শচীতো এখন আপনাদের। ও দলের জিম্মায থাকবে।'

অবশেষে, অতি কষ্টে আজাদ দুর্গা দেবীকে বুঝিযে, কোনরকমে নিবস্ত্র করলেন।

এরপর দাবী নিযে এলেন সুশীলা দিদি। তাঁকে অ্যাকসনে অংশ নিতে দেওয়া হোক। আজাদ তাঁকেও বুঝিযে-সুঝিযে সামলালেন।

শেষে, দলের কর্মী মদনগোপালকে নির্বাচন করলেন যশপাল। অ্যাকশনে যাবার আগে তাকে দেখা গেল এক ফাঁকা ঘবে আসন বিছিযে গীতা পাঠ কবতে। আজাদ সে দৃশ্যে বিরক্ত হয়ে তাঁর হতাশা প্রকাশ করলেন, 'দেখো ভাযা, গীতা থেকে সঞ্চয করা সাহস আসল সময অবধি পৌঁছতে পৌঁছতে থেমে না যায়।' আজাদের বিচার ভুল হয়নি। শেষে এই মদনগোপালই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। পুলিশের কাছে সব কিছু কবুল করেছিল।

বাড়ি থেকে পুরোদলটা বেরুবার মুখে, সুশীলা দিদি সকলকে চমকে দিলেন। 'দাঁড়াও'। দেখা গেল তাঁর হাত কেটে রক্ত ঝরছে। সেই রক্তের তিলক কেটে বিদায় দিলেন প্রিয় ভাইদের। আসন্ন যুদ্ধ জয়ের শুভাশীস, আর শুভেচ্ছা দিয়ে। কে জানে এরা আর ফিরবে কি না !

বোর্স্টল জেল ফটকের কাছাকাছি মোটর গাড়ি হাজির করলেন আজাদ। গাড়ি যেন হঠাৎ খারাপ হয়েছে, এই ছুতো করে হুড খুলে পরীক্ষা করছে ড্রাইভার। ওদিকে ইঞ্জিন চালু রাখা হয়েছে, যে কোন অবস্থার জন্য। ভগৎদের নেবার জন্য প্রিজনভ্যানকে দেখা গেল আসতে। কিন্তু একি কাণ্ড ! ভ্যানের পেছন দিকটা ধীরে ধীরে জেল ফটকের

প্রায় গায়েই লাগান হোল। কারণ বন্দীদের ভ্যানে তোলার দরজা পেছন দিকে। গাড়ির মুখ সামনে। অর্থাৎ ভগৎ ও দত্তকে জেল গেট পার হয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে এসে ভ্যানে উঠতে হবে না। তাবা জেলের দরজা থেকে বার হযে সরাসরি ভ্যানে উঠবে।

আজাদ প্রশ্ন করলেন যশপালকে, 'সোহন, এখন কি হবে!'

যশপাল উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'এগোন যাক।'

'কিভাবে?' বিস্মিত আজাদের প্রশ্ন।

'যে ভাবেই হোক', যশপাল জবাব দিলেন।

গম্ভীর স্বরে 'হুঁ' বলে চুপ কবে বইলেন আজাদ। এবাব দেখা গেল ভগৎ ও দত্ত জেলের বন্ধ দবজার লোহার গেটের দিকে আসছেন। গাডিতে বসা অবস্থায় আজাদ নির্দেশ দিলেন, 'সিগন্যাল!'

সাথী বচ্চন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁশী বাজিয়ে ভগৎ-দের সংকেত দিল। জেলের ফটকের খিডকি দরজা খুলল। আজাদেব মোটর গাডি ধীরে ধীরে জেলের দিকে এগোল।

কথা ছিল ভগৎ-এর ইশারা পেলেই জেল ফটকেব ওপর আক্রমণ শুরু হবে। যশপাল প্রথমেই সশস্ত্র পাহাবাদারদেব ওপব বোমা ছুঁড়বেন। তাবপর গুলি চালিযে ওদেব এগিযে আসতে বাধা দেবেন। বচ্চনের ওপব নির্দেশ ছিল প্রিজনভ্যানের ওপব বোমা ফেলে সেখানে বসে থাকা পুলিশদের ঠেকিযে রাখা। আব মদনগোপালের ওপর নির্দেশ ছিল এই অবস্থায ভগৎ ও বটুকেশ্ববো যখন ছুটে এগিযে আসবে তখন দ্রুত তাদেব দিকে ছুটে গিযে তাদের হাতে গুলিভবা রিভালবার তুলে দেওযা। আব আজাদ দাযিত্ব নিযেছিলেন তাব ভযঙ্কর মাউজার পিস্তল, যেটা প্রয়োজনে রাইফেলেব মতও ব্যবহার করা যায়, তার সাহায্যে ভগৎদেব পেছনে যদি কেউ ধাওয়া কবে তাব মোকাবিলা কবাব।

দেখা গেল, ভগৎ ও দত্ত ফটক থেকে বাইবে বেকলেন। কিন্তু পূর্ব পবিকল্পনা মাফিক মাথা চুলকাবাব ছলে ইশাবা কবলেন না।

আজাদ সমস্যায় পডলেন। যশপালকে প্রশ্ন করলেন, 'বলো, এখন!'

যশপাল চাপা গলায বললেন, 'এগিযে চলো।'

ড্রাইভাব ইঞ্জিন তেজী কবল। কিন্তু আজাদ তার হাতের ওপর হাত রেখে গম্ভীব কণ্ঠে বললেন, 'না, দাঁডাও।'

ভগৎ সিং ও দত্ত আজাদদেব দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সিধে ভ্যানের দরজাব দিকে পা বাডালেন।

আজাদ ধীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'ভ্যানটাকে এগিয়ে আসতে দাও।' আজাদের ভাব দেখে মনে হল, ঠিক আছে আমরা তো তৈরি, আগের পরিকল্পনায না হোক, অন্য কোন সুযোগ আসে কিনা দেখা যাক। কারণ ততক্ষণে আজাদের মোটর গাড়ি সম্পর্কে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। জান কবুল করে যে বিপ্লবীরা অ্যাকসনে নেমেছেন, তারা অবশ্য তখন সমস্ত সন্দেহ সম্পর্কে বেপরোয়া।

ভগৎ ও দত্তের ভ্যান এগিযে এল। আজাদের মোটর গাডির গা ঘেঁষেই এগোল। ভগৎ ও দত্ত আজাদদের দিকে তাকালেন। দু পক্ষেই চোখে চোখে দেখা হল। কিন্তু

ভগৎ-এর কোন ইশারা মিলল না। আজাদ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সামান্য কিছুক্ষণ বাদে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, 'জলদি ফিরে চল।' গাড়ি এবার নিরাপদ ঘাঁটির দিকে তীব্র বেগে ছুটল। আজাদ স্থিরভাবে বসে রইলেন।

ঘরে ফিরে আজাদ উত্তেজিত হয়ে যশপালকে বললেন, 'বল, ঐ অবস্থায় ছিল! খামোকা তুমি এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো বলছিলে! মাথা ঠাণ্ডা রেখে অ্যাকসনে নামতে হয়। আজ না হোক, ফের চেষ্টা করা যাবে।'

যশপাল নিজের ভুল স্বীকার করলেন। 'ঠিক বলেছো আজাদজী। তুমি সত্যিই ঠাণ্ডা. মাথায় বুদ্ধির সঙ্গে ঐ সময় নির্দেশ দিয়েছো। আমি আবেগ ও উত্তেজনায় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের সুযোগ্য কমান্ডার-ইন্-চীফের দায়িত্বই তুমি পালন করেছ।'

আজাদ শান্ত ধীর স্থির কণ্ঠে যশপালকে আশ্বস্ত করলেন, 'ভগৎ সিং ও দত্তকে ছাড়িযে আনার প্রচেষ্টা অতি অবশ্যই আমাদের চালিযে যেতে হবে। আর এই পথে ব্যর্থ হলে অন্যপথে যেতে হবে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লুণ্ঠনের যে অ্যাকসন হয়েছে (১৮/৪/৩০ তারিখে সূর্য সেনের নেতৃত্বে) তার থেকে শিক্ষা নিয়ে, ২৫—৩০ জন কমরেডকে নিয়ে একটা যোজনা বা পরিকল্পনা করা যায় কিনা আমাদের ভাবতে হবে।' (সূত্র, 'সিংহাবলোকন')।

কিন্তু মহান বিপ্লবী বীর চন্দ্রশেখর আজাদের সেই যোজনা সফল হয়নি। ইতিমধ্যেই দলের (HSRA) অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও সংকটের ফলে আজাদকে দলের কেন্দ্রীয কমিটি ভেঙে দিতে হয়েছিল, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩০ তাবিখ নাগাদ। নতুনভাবে সংগঠনকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছেন তিনি। অ্যাকশনের মধ্য দিয়ে ভগৎদের ছাড়াতে না পারলেও, জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে এক গোপন সাক্ষাৎকারে আজাদ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন লর্ড আরউইনের সঙ্গে গান্ধীজীর গোলটেবিল বৈঠকে ভগৎ সিংদের মুক্তির দাবীতে যেন শর্ত আবোপ করা হয়। আজাদের এই শর্ত মানেননি নেহরুজী। মানেননি গান্ধীজী। (সূত্র, 'সিংহাবলোকন'।)

অবশেষে এই মহান দেশপ্রেমিক বিপ্লবী আজাদ ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালের এক সকালে এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে (এখন চন্দ্রশেখর আজাদের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত পার্ক) পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরের শেষে প্রাণঘাতী গুলিতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। (সূত্র, 'সিংহাবলোকন'।)

পুত্রের জীবন রক্ষায় কিষেণ সিং-এর প্রয়াস ও ভগৎ সিং-এর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ :

২৬শে আগস্ট, ১৯৩০ তারিখ নাগাদ ভগৎ সিংদের বিচারের আদালতী কর্মকাণ্ডের প্রায় শেষ হয়ে এল। বাকী ছিল কিছু কাগজ কলমের কাজ। পরদিন জেলে ভগৎ সিংদের কাছে সরকারী সংবাদ পাঠান হল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তারা যদি সাক্ষী-সাবুদ আনতে চায়, বা নিজেরা অথবা তাদের উকিল মারফৎ যদি আদালতে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায়, তাহলে যেন তারা আদালতে হাজির হয়।

অভিযুক্তরা এ কাজের জন্য তৈরি ছিলেন না। কারণ, তারা ইতিমধ্যেই আদালতী

...নের বিরুদ্ধে তাদেব সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সবসমেত অভিযুক্তবা ৪/৫ দিন ...ত্র আদালতে হাজির হয়েছিলেন। বাকী সয়মটার আদালতী কর্মকাণ্ড চলেছে অভিযুক্তদের ...তিতে

...কিন্তু হঠাৎ অপত্য স্নেহ বশে, ভগৎ সিং-এর পিতা কিষেণ সিং, পুত্র ভগৎকে না জানিয়েই, এক দীর্ঘ আইনী ভাষার পিটিশন লিখলেন বিশেষ ট্রাইবুন্যালের বিচারপতির কাছে এবং তার অনুলিপি পাঠালেন ভাইসরযেব কাছে। আদালতেব কার্যপদ্ধতির আইনগত দিকে আঙুল দেখিযে তিনি বলিষ্ঠভাবে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ কবলেন। কিষেণ সিং বললেন :

"দেখা যাচ্ছে, ট্রাইবুন্যাল বেঞ্চ অভিজ্ঞ বিচারকদের নিযে গঠিত হলেও, তাবা এটা খেযাল করছেন না যে অভিযুক্তরা বাদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করেননি। সাক্ষীদের সাক্ষ্য-র সত্যতা যাচাই করার জন্য বিচারকরাও কোন পরীক্ষামূলক প্রশ্ন কবেননি।

"ভগৎ সিং ঘটনার দিন (সান্ডার্স হত্যা) কলকাতায ছিল···ভগৎ যে সেদিন কলকাতায ছিল এর সপক্ষে অনেক সজ্জন ব্যক্তিই সাক্ষী দেবেন। আমাকে সুযোগ দেওয়া হলে, আমিই তাদের হাজিব করব আদালতে। অথবা আদালতী সাক্ষ্য হিসেবে আপনাবাও তাদের ডাকিয়ে আনতে পাবেন, আমার বক্তব্যেব সত্যতা যাচাই করাব জন্য। এই মামলার সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কাজেই বিবাদী বা প্রতিবাদী পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ দেওযা উচিত।···আমি বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, ভগৎ সিং-কে তার সাক্ষী-সাবুদ মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হোক।"

ভগৎ সিং-এর কাছে এই পিটিশন ছিল এক আকস্মিক আঘাত। পিতার এই চিঠির বক্তব্য ছিল তাঁব কাছে নীতি ও আদর্শবিরোধী। ভগৎ প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হলেন পিতার এই কাজে। ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাতে পিছপা হলেন না। কিষেণ সিং পিতা বলে তাঁর বিরুদ্ধে কডা কথা বলতেও ক্ষান্ত হলেন না। পিতাকে লেখা ভগৎ-এর ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩০ তারিখের ঐ চিঠিটি এক ঐতিহাসিক দলিল। G. S. Deol উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যে চিঠিটিকে বলেছেন 'বিপ্লবী সাহিত্যে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান'।

ভগৎ সিং-এর চিঠিটি এইরকম :

"**আপনার চিঠি এক মারাত্মক আঘাত :** আমি এটা জেনে আশ্চর্য হচ্ছি যে আপনি আমার জীবনরক্ষার জন্য স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের কাছে এক প্রার্থনাপত্র (পিটিশন) পাঠিয়েছেন। এই সংবাদ আমাব কাছে এতই দুঃখদায়ক ও বেদনাকর যে, আমি শান্ত থেকে একে সহ্য করতে পারছি না। এই সংবাদ আমার মনের ভারসাম্যকে টলিয়ে দিয়েছে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, আপনি কি ভাবে বর্তমান অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এই ধরনের একটা প্রার্থনা পত্র পাঠানো উচিত মনে করলেন ?

"পিতা হিসেবে আপনার প্রতি সসম্মান শ্রদ্ধা জানিযেও, আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরামর্শ না করে আমার পক্ষে আপনার ঐ ধরনের পদক্ষেপ নেবার কোন অধিকার নেই। আপনি জানেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে আমার চিন্তাধারা সর্বদাই পৃথক ছিল। এই কারণে আপনার সম্মতি বা অসম্মতির ওপর ভরসা না করে আমি সর্বদাই স্বাধীনভাবে কাজ করেছি।

"**আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই না:** আশা করি আপনি একথা ভুলে যে, এই মামলার গোড়ার দিক থেকেই আপনি আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মামলা লড়তে বলেছিলেন এবং সঠিকভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপদেশ। কিন্তু আপনি এও জানেন আমি তা গ্রহণ করতে পাবিনি এবং তার বিরোধিতাই গুরুত্বের সঙ্গে মামলা লড়া অথবা আত্মপক্ষ সমর্থন করা, এসব বিষযে আমি চিন্তা করিনি এবং এ নিয়ে চিন্তা করার আমার কোন ইচ্ছাও ছিল না। আমার এই পদক্ষেপ কোন অস্পষ্ট আদর্শবাদ-প্রসূত অথবা শক্তিশালী যুক্তি নির্ভব, সে অপ্রাসঙ্গিক। এই পত্রে এই সব বিষয়েব অলোচনাও সম্ভব নয।

"আপনি জানেন এই মামলায আমি একটা নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে চলেছি। আমার প্রতিটি কাজ তাই অতিঅবশ্যই আমার নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচীব সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই উচিত। আজ হয়ত পরিস্থিতি ভিন্ন। কিন্তু পরিস্থিতি সহাযক হলেও আমি কিছুতেই আত্মপক্ষ সমর্থনে উপস্থিত হতাম না। এই মামলাপর্বে আমার একটাই নীতি কাজ করছে, সেটা হল, আমাদের বিরুদ্ধে যত গুরুতব ও মারাত্মক অভিযোগই আনা হোক, আমি এই বিচাব ব্যবস্থাব প্রতি চবম অবহেলা এবং উপেক্ষা প্রদর্শন কবে যাব। আমি মনে কবি সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদেরই এই দৃষ্টিভঙ্গিব দ্বাবা পবিচালিত হওযাই উচিত। আদালতের আইনের লড়াইকে উপেক্ষা করে, যত কঠিন শাস্তিই আসুক তার মুখোমুখি হওয়া উচিত। রাজবন্দীরা আত্মপক্ষ নিযে লডাই করতে পারে, কিন্তু সেটা হতে হবে নির্ভেজাল রাজনৈতিক মতাদর্শের লডাই। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোন থেকে নিজেকে বাঁচাবার লডাই নয। আমাদেব এই আদালতী লডাই, আমরা এই নীতিব সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই চালিয়েছি। এই কাজে আমরা কৃতকার্য হযেছি কিনা, সেটা বিচার কবাব দায়িত্ব আমার নয। আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, নিরাসক্ত থেকেই, আমাদেব কর্তব্য পালন করে চলেছি।

"**নীতি বর্জিত জীবনের কোন মূল্য নেই:** 'লাহোর ষডযন্ত্র মামলা অর্ডিনান্স' জারী করার মুখবন্ধে বডলাট সাহেব বলেছেন যে, অভিযুক্তরা দেশের আইন ও বিচাব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অবমাননার পরিবেশ তৈরি করছে। এর থেকে আজকের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমাদের কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। এরই সাহায্যে আমরা জনসাধারণের বিচারের জন্য এই কথা উপস্থিত করতে পারি যে দেশের আইনী ব্যবস্থাকে অবমাননাকর জায়গায আমরা এনেছি অথবা অন্যরা এনেছে। এই বিষযে মতপার্থক্য থাকতে পারে। আপনিও হয়ত তার একজন। কিন্তু এর অর্থ নিশ্চযই এমন নয় যে এই মতপার্থক্যের কারণেই আপনি আমাব সম্মতি ছাড়াই, এমনকি আমাকে বিন্দুমাত্র না জানিয়েই, আমার সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বাবা আমি বুঝি, আপনার কাছে স্নেহের পুত্র হিসেবে আমার মূল্য হয়ত অসীম। কিন্তু খোদ আমার নিজের কাছে, আমার জীবন, ব্যক্তিগতভাবে এত মূল্যবান নয যে নীতি, আদর্শের বিনিময়ে তাকে যেন-তেন প্রকারেণ রক্ষা করতেই হবে। আমার মত, আরও কমরেডরা আছে, যাদের মামলা আমারই মত গুরুতর। সকলের জন্যই সমানভাবে আমরা একটা সাধারণ নীতি গ্রহণ করেছি। এই নীতিতে আমরা স্থির ও অবিচল। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রতিটি কমরেডকে তার জন্য যে কোন মূল্যই দিতে হোক।

আপনার এই কাজের ফলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি সত্যিই শঙ্কিত যে কথাবার্তা ও আচরণ হয়ত সাধারণ সৌজন্যবোধের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং গৃহীত পদক্ষেপগুলি কঠোরভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে হয়ত আমার ভাষা একটু কর্কশ ও অমার্জিত হয়ে পড়ছে। আপনি দয়া করে আহত হবেন না। আমি এখন স্পষ্টভাবে, অকপটে বলতে চাই যে, আপনার এই কাজের ফলে আমার নিদারুণভাবে মনে হয়েছে, আমি যেন আচমকা ছুরিকাহত হলাম। এই কাজ যদি অন্য কেউ করত তাহলে সেটাকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই বলা যেত না। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমাকে বলতে হয়, এটা একটা স্নেহের দুর্বলতাজনিত কাজ। আর এই দুর্বলতা অত্যন্ত খারাপ নজির সৃষ্টি করল।

"**জীবনের পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হতে পারলেন না**: যে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা পার হচ্ছি, তার মধ্যেই আমাদের শক্তি ও সাহসের পরীক্ষা হচ্ছে। বাবা, মাফ করবেন, আমাকে একথা বলতেই হচ্ছে যে এই পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি। আমি জানি খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসাবে আপনি কারো চেয়েও কোন অংশেই খাটো নন। আমি এও জানি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আপনি একজন নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, এ সত্ত্বেও আপনি আমার ব্যাপারে এমন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কালসন্ধিক্ষণে অপত্যস্নেহ-জনিত দুর্বলতা প্রকাশ করলেন! এর কারণ আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

"**আমার জন্য আপনার চিঠির প্রার্থনাকে আমি অনুমোদন করি না**: পরিশেষে, আমি এই চিঠির মাধ্যমে আপনাকে, আমার সাথীদের ও সেই সমস্ত মানুষ যারা আমার মামলার বিষয়ে জানতে উৎসাহী, এমন সকলকেই অবগত করতে চাই যে, আপনার এই চিঠির প্রার্থনাকে আমি আদৌ অনুমোদন করি না। আত্মপক্ষ সমর্থন না করার পূর্ব সিদ্ধান্তেই, আমি এখনো অবিচল। এমনকি আদালত যদি আমার সহ-অভিযুক্তদের পেশ করা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন আবেদনকে গ্রহণও করে, তাহলেও আমি আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদের দলভুক্ত হতে পারব না। বিগতদিনেও জেলে অনশন ধর্মঘটের সময় সাক্ষাৎকারের বিষয়ে আমি ট্রাইবুন্যালের কাছে যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলাম তার অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংবাদপত্রে বিকৃতভাবে এমন সংবাদ প্রকাশ করা হয় যেন আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইছিলাম। কিন্তু বাস্তব সত্য হল আমি কখনোই আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করি নি। আমি এখনো আগের সেই সিদ্ধান্তেই অনড়। এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ফল দাঁড়াবে বোর্স্টল জেলের কমরেডরা আমাকে চরম বিশ্বাসঘাতক বলে ভুল বুঝবে। তাদের কাছে, আমার অবস্থানটা কি ধরনের জটিল তা বোঝাবার অবকাশটুকুও মিলবে না।

"আমি চাই জনসাধারণের কাছে সমস্ত জটিলতার বিষয়টাই বিশদভাবে উন্মুক্ত হোক, কোন রাখঢাক না রেখে। সেই কারণেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে সংবাদপত্র মাধ্যমে এই চিঠিটি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করুন।

"আপনার স্নেহের সন্তান

"ভগৎ সিং"

পুত্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করে পিতা কিষেণ সিং চিঠিটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য 'The Tribune' পত্রিকায় ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩০ তারিখের হুবহু ছাপা হয়।

ভগৎ সিং-এর সুগভীর আত্ম-মূল্যায়ন :

জেলের অভ্যন্তরে জীবন সংগ্রামে, ভগৎ সিং নিজেকে এক বিস্ময়কর স্তরে করেছিলেন। বিপ্লবী জীবনের উদ্দেশ্যমুখীনতা, গভীর আত্মোপলব্ধি, তাঁকে এক অনন্য চিন্তাশীল, দার্শনিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

আদালতী কর্মকাণ্ডের অন্তে, সময়টা ছিল, বিচাবকেব বিচারেব বায় ঘোষণা করার সময়। মানসিক দিক থেকে সকল রাজবন্দীরাই এজন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন জেলের অভ্যন্তরে। ভগৎ সিং-এর প্রিয় কমরেড সুখদেব হঠাৎ এই পরিস্থিতিতে মানসিক ভাবসাম্য হারিযে ভগৎকে জেলেব ভেতরই এক চিঠি লিখলেন। চিঠির বক্তব্য হল, আসন্ন বিচারের রায়ে যদি তাঁব ফাঁসি অথবা নিঃশর্ত মুক্তি না হযে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্য, সেক্ষেত্রে তিনি আত্মহত্যার পথে যাবেন। কারণ, যাবজ্জীবন কারাবাসের নামে কম্‌সেকম বিশ বছরের কারাযন্ত্রণা ভোগ করা তাঁর কাছে অর্থহীন।

প্রিয় কমরেডের এহেন সিদ্ধান্তে, গভীর দুঃখ পেলেন ভগৎ। কারণ তিনি লক্ষ কবলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুখদেবের চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। জেলের বাইরে যেসব ব্যাপারে সুখদেব প্রবল বিরোধিতা ও ঘৃণা প্রকাশ করতেন, ভগৎ দেখলেন সেগুলোর সম্পর্কে সুখদেবের বিশ্বাস পাল্টে গেছে। মানুষের জীবনের প্রেম, আত্মহত্যা এগুলির অন্যতম। এছাড়া শুধুমাত্র যাবজ্জীবন কারাভোগের কষ্ট সহ্য কবার মধ্য দিয়ে কিভাবে দেশের সেবা করবেন, এই প্রশ্নও তুলেছিলেন সুখদেব।

ভগৎ তাঁর জবাব চিঠির বক্তব্যে একে খণ্ডন করে বললেন, "তোমার মত মানুষের পক্ষে এই ধরনের প্রশ্ন করা খুবই বিস্ময়কর। মনে করে দেখ, কত গভীরভাবে তুমি আমি সকলে 'নওজওয়ান ভারতসভা'-র উদ্দেশ্য, 'সেবার দ্বারা কষ্ট সহ্য করা এবং আত্মত্যাগ করা'-র মহান আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করেছিলাম। আমার বিশ্বাস তুমি যতটা সম্ভব ততটাই এ কাজে নিজেকে উজাড় করে দিযেছিলে। এখন তো ভাই তাই সময় এসেছে, যা তুমি করেছো তার জন্য কষ্ট ভোগ করার। আর এটাই তো সেই মুহূর্ত, যখন তোমার এই কষ্ট ভোগ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমেই তুমি মানুষের কাছে নেতৃত্বের জায়গায় পৌঁছবে।

"যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই, কাজের যৌক্তিকতা এবং ঔচিত্য বিচার করাই মানুষের ধর্ম। উদাহরণত, আমাদের দিল্লীর লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীতে বোমা ফেলার কাজ। এই কাজের যৌক্তিকতা বিচার করেই আমরা অ্যাকসন করেছি। এখন সময় এসেছে সেই কাজের পরিণাম ও ফল ভোগ করার। তুমি কি বল ভাই, এই কাজের পর দণ্ড থেকে বাঁচবার জন্য, যদি আমরা দয়া ভিক্ষা করে আদালতে অনুনয় বিনয় করতাম, তাহলে সেটা কি উচিত কাজ হোত? মোটেই না। তাহলে জনসাধারণের ওপর তার

প্রতিক্রিয়া হোত। বিচার করে দেখ, এই ধরনের কাজ না করার ফলেই আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পূর্ণমাত্রায় সফল হয়েছি।

যখন বন্দী হই, তখন জেলের অভ্যন্তরে আমাদের দলের রাজবন্দীদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। আমরা সেই অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়াস শুরু করি। তোমাকে অত্যন্ত গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি ঐ সময় আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি মৃত্যুবরণ করতে চলেছি। কারণ, তখন একটানা অনশন সংগ্রাম চালাচ্ছিলাম। তখন কি জানতাম যে ওরা জোর জবরদস্তি নাকে নল ঢুকিয়ে, অজ্ঞান করে, পেটে দুধ চালান দিয়ে আমাদের সংগ্রামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে! অবধারিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই তো আমরা এই লড়াই শুরু করেছিলাম। তাহলে, এক্ষেত্রে কি তুমি বলবে আমরা লড়াই নয়, আসলে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম? না, কখনই না। ন্যায়সঙ্গত দাবী ও অধিকার আদায়ের জন্য যত্নশীল হওয়া এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক আদর্শ, সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক নীতির সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে, লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাকে কখনোই আত্মহত্যা বলা যায় না। আমাদের প্রিয় সাথী যতীন্দ্রনাথ দাসের মহান মৃত্যুবরণ তো সকলের পরম আকাঙ্ক্ষিত এক ঈর্ষণীয় মৃত্যু। তুমি কি যতীন দাসেব মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলবে? সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে কষ্ট সহ্য করে আমবা তার ফল পেয়েছি। সারা দেশজুড়ে এক বিরাট সর্বব্যাপী আন্দোলন শুরু হযেছে। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সফল হয়েছি। এই যে সংগ্রাম, এর মধ্যে নিজেকে যুক্ত করে মৃত্যুবরণ করা এক আদর্শ মৃত্যুবরণ।

"এ ছাড়াও আমাদের কমরেডদের মধ্যে যাদের এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, তাদের অবধারিত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, তাদের উচিত ধৈর্য সহকারে সেই দণ্ডাদেশ ঘোষণা ও ফাঁসির মঞ্চে তোলা অবধি অপেক্ষা করা। এইভাবে শহীদের মৃত্যুবরণ তো সুন্দর। কিন্তু, আত্মহত্যা করে কিছুটা দুঃখ যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার কাজটা আমার মতে, কাপুরুষোচিত কাজ। আমি তোমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, যে, মানুষের জীবনে বাধা-বিপত্তি ও সংকটের মোকাবিলার সংগ্রামই, মানুষকে তার জীবনের পূর্ণতা এনে দেয়। উচিত কথা বলতে হলে বলতে হয়, ভাই, তুমি এবং আমি কেউই আজ অবধি তেমন কোন বড় ধরনের কষ্ট ও সংকটের মোকাবিলা করিনি বা কষ্টও সহ্য করিনি। এই তো সবে আমাদের জীবনে এই আসল সংগ্রামের অধ্যায় শুরু হোল।"...

'কেবলমাত্র কালের প্রয়োজন থেকেই আমাদের জন্ম'— ভগৎ সিং :

অকারণ অহঙ্কার অথবা হতাশা যাতে কোন অবস্থায় একজন বিপ্লবীর চিন্তাকে দুর্বল না করে সেই প্রসঙ্গেই সুখদেবকে সচেতন করতে গিয়ে ভগৎ এই ঐতিহাসিক চমকপ্রদ অভাবনীয় দার্শনিক উক্তি করেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যারা তাদের ব্যক্তি ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার প্রসঙ্গে উচ্চকণ্ঠে দাবী করেন অথবা সংগ্রামের ময়দানে হতাশায় ভেঙে পড়েন, সেই সমস্ত স্তরের মানুষের উদ্দেশ্যেই ভগৎ সিং-এর এই গভীর দার্শনিক বোধ সঞ্জাত উক্তি প্রযোজ্য। যে প্রসঙ্গে সুখদেবের প্রতি ভগৎ সিং-এর এই উক্তি সেটা এইরকম:

"বাস্তবিক তোমার যদি এমনিই মনে হয় যে জেলের জীবন সত্যিই ' তাহলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে একে সংশোধন করার প্রয়াস নিচ্ছনা কেন ' তুমি বলবে যে এই আন্দোলন ও সংঘর্ষ সফল হতে পারে না। কিন্তু এটা তর্কই হবে, যার আড়ালে সমস্ত দুর্বল লোকেরাই আন্দোলন, লড়াই থেকে বাঁচাতে চায়। এটা তো সেই জবাবই হবে যা আমরা জেলের বাইরে থাকা কাছ থেকে সচরাচর শুনে থাকি। বিপ্লবী আন্দোলন থেকে কৌশলে জান বাঁচাবার জন্য তারা এইসব তর্ক করে। আজ কি আমি তোমার মুখ থেকেও এইসব জবাব শুনব? মুষ্টিমেয় কিছু কর্মকর্তাকে নিয়ে সংগঠিত আমাদের দল তার গৃহীত লক্ষ্য ও উচ্চ আদর্শকে বাস্তবায়িত করার কী ক্ষমতা রাখে? তাহলে কি আমরা এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছব, যে, এইসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে হাত দিয়ে আমরা নিতান্তই ভুল করেছি? না, এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে না। এইসব চিন্তাব মধ্য দিযে তো, যারা এইভাবে ভাবে, সেই সব ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

"তুমি চিঠিতে লিখেছ, চৌদ্দ বছর জেলের কষ্টকর বন্দীজীবন কাটাবাব পর, কোন ব্যক্তিব কাছ থেকেই এটা আশা করা যায না যে, জেলের পূর্বের জীবনে তার যা চিন্তা ও বিচারধারা ছিল জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সেটাই অটুট থাকবে। এর কাবণ হিসাবে তুমি বলেছ যে, জেলের বাতাবরণ সেই ব্যক্তির সমস্ত বিচারশক্তিকে দলে পিষে খতম করে দেবে। বেশ ভাল কথা! এবার আমি কি তোমাকে প্রশ্ন করতে পাবি যে, জেলের বাইরের বাতাবরণও কি আমাদের চিন্তা-চেতনাকে টিকিযে রাখার পক্ষে অনুকূল বাতাবরণ ছিল? নিশ্চয়ই ছিল না। তাহলে বিফলতার কারণে কি আমরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ছেড়ে দিয়েছিলাম?

"তোমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য কি এই যে, আমরা যদি এই রাস্তায না আসতাম, তাহলে দেশে আদৌ এসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডই ঘটত না? ভুল। এই যদি তোমার যুক্তি হয তাহলে আমি বলব তুমি ভুল করছ। এটা ঠিক যে বর্তমান বাতাবরণ পালটাবার কাজে আমরা কিছুটা সীমা অবধি হয়ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছি। কিন্তু আমরা তো কেবলমাত্র আমাদের কালের প্রয়োজন থেকেই জন্মেছি।"

সুগভীর দার্শনিক তাৎপর্য নিহিত আছে শেষের এই কথাটির মধ্যে। বস্তুজগতের আপন নিয়মেই, শ্রেণী সংঘর্ষের পথে, সমাজ অভ্যন্তরে বিবর্তন ও আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বৈপ্লবিক আমূল পরিবর্তনকে কালের এই অমোঘ নিয়মের চক্রে শ্রেণী সচেতনতার নিরিখে মানুষ সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমে বড়জোর ত্বরান্বিত করতে পারে অথবা সাময়িকভাবে হয়ত বাধাগ্রস্ত করতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষ অহঙ্কারবশত ভাবেন, সমাজের পরিবর্তনে, তাদের ব্যক্তিভূমিকাই মূল চালিকাশক্তি। যেন, তাদের ব্যক্তিভূমিকার জন্যেই, বা তাদের অবদানেই সমাজের পরিবর্তন ঘটল। আসলে সমাজ পরিবর্তনে এক একটা কালের বা যুগের সন্ধিক্ষণে পরিবর্তনের ক্রিয়াশীল প্রগতিমূলক ধারায় অথবা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধধারায় অংশ নেওয়া কালের নিয়মেই অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ভগৎ সিং-এর এই দার্শনিক উক্তি সর্বৈব সত্য। যুগসন্ধিক্ষণে কালের প্রয়োজন থেকেই তো তাঁরা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মে নিজেদের

ভাবেই যুক্ত করেছিলেন। আশ্চর্য দার্শনিক উপলব্ধিতে চমৎকারভাবে তিনি সেই রেছেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে।

ই গভীর রাজনৈতিক দার্শনিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ভগৎ আরও বিশ্লেষণ করেছেন। সেই বিশ্লেষণ এইরকম :

"আমি তো এই কথাও বলব যে সাম্যবাদের জন্মদাতা মার্কস, বাস্তবে ব্যক্তিগত-ভাবে সাম্যবাদী চিন্তাধারার জনক নন। আসলে ইওরোপের শিল্পবিপ্লবই কালের নিয়মে জন্ম দিয়েছিল এমন কিছু বিশেষ চিন্তা ও বিচারধারার ব্যক্তিকে। কার্ল মার্কস ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। হ্যাঁ, একথা সত্য যে মার্কস আপনার ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনার অবস্থান থেকে কালের গতিচক্রকে প্রগতির একটা সীমা অবধি এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে নিঃসন্দেহে আবশ্যিক সহায়কের ভূমিকায় কৃতকার্য হয়েছেন।

"আমি (এবং তুমিও) এই দেশে সমাজবাদ ও সাম্যবাদের চিন্তা ও বিচারধারার জন্ম দিইনি। বরং এটা তো আমাদের ওপর আমাদের সময় বা কালের এবং পরিস্থিতির প্রভাবের পরিণাম। নিঃসন্দেহে এই চিন্তা ও বিচারধারার প্রচারের কাজে আমরা অবশ্যই কিছু সাধারণ ও তুচ্ছ কাজ করেছি। এই কারণেই, আমার কথা হল, এই ধরনের এক কঠিন কাজ যখন হাতে নিয়েই নিয়েছি তখন এই কাজকে চালু রাখা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিৎ। জেলের কষ্টের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আত্মহত্যা করলে জনসাধারণকে আদর্শ পথ প্রদর্শন করা যাবে না। বরং আত্মহত্যা হবে এক প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ।...

"আশা করি এবার তুমি আমাকে আমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুমতি দেবে। শোন, আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এ আমার অটল বিশ্বাস। আমার প্রতি রাজনৈতিক অপরাধী সুলভ পুরোপুরি ক্ষমা অথবা কোন প্রকার নম্র ব্যবহারের কণামাত্র আশা নেই। আর যদি রাজনৈতিক অপরাধী হিসেবে ক্ষমা বা মুক্তি মেলেও তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে সকল বন্দীদের জন্য হবে না। বরং অন্যান্য বন্দীদের ক্ষেত্রে নিতান্ত সীমিত অর্থে এবং বহু শর্তে শৃঙ্খলিতভাবে তা হয়তবা হতে পারে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক অপরাধী সুলভ ক্ষমা হওয়া সম্ভবই নয়। আর আমি নিশ্চিতভাবে জানি তা হবেও না। এ সত্ত্বেও আমার ইচ্ছা হয়, সম্মিলিতভাবে সারা দুনিয়াজুড়ে, আমার মুক্তির দাবীর প্রস্তাব উঠুক। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এমনো অভিলাষ হয় যখন এই আন্দোলন তার চরম শিখরে পৌঁছবে তখন যেন আমাকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়। আমার ইচ্ছা যদি কোনদিন কোন উচিত ও সম্মানপূর্ণ সমঝোতা হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের মত কিছু ব্যক্তির মামলা যেন সেই রাস্তায় বাধা বিপত্তি না হয়ে দাঁড়ায়। যখন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে চলেছে, তখন কতিপয় ব্যক্তির ভবিষ্যতের ভাবনা বিস্মৃতির আড়ালে প্রেরণ করাই উচিৎ। ...ইংরেজের অন্তরেও এমন একটা পরিবর্তন ঘটানো বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে কষ্টস্বীকার ও আত্মত্যাগের মধ্য থেকেই বৈপ্লবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং তাই করা হবে।"
(সুখদেবকে লেখা ভগৎ সিং-এর চিঠির অংশ)

ভগৎ সিং-এর ফাঁসির সাজা ও দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়া :

দুনিয়া জুড়ে মামলা মকদ্দমার ইতিহাসে ভগৎ সিং-এর বিচার ও সাজা ঘোষণা এক বিচিত্র ঘটনা হিসাবে সংযোজনের দাবী রাখে। তথাকথিত 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'য় না অভিযুক্ত আসামীরা উপস্থিত হল, না তাদের পক্ষের কোন সাক্ষী-সাবুদ পরীক্ষা করা হল, না তাদের পক্ষ সমর্থনে কোন উকিল সওয়াল করল। আদালতই আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল আবার সেই আদালতই তাদের বিরুদ্ধে একতরফা বিচারের প্রহসনে দণ্ডাদেশ জারী করল।

আদালতী কর্মকাণ্ডকে যিনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি আদালতের প্রহসন-মূলক বিচারের রায় শুনতে হাজির হলেন না। ফলে ৭/১০/৩০ তারিখে ভগৎ সিং ও তার সাথীদের বিচারের রায় শোনাবার জন্য, আদালতের এক বিশেষ অফিসার জেলে এসে ভগৎ সিং-দের বিচারের রায় শোনালেন। রায়ের শেষ কথাটি এইরকম :

'ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা হিসেবে ভগৎ সিংকে তার ইচ্ছাকৃত ও কাপুরুষোচিত হত্যার অপরাধে গলায় ফাঁস দিয়ে আমৃত্যু ঝুলিয়ে দেবার সাজা দেওয়া হল।'

সাথী সুখদেব ও রাজগুরুদের ক্ষেত্রেও একইভাবে ফাঁসিতে মৃত্যু ঘটাবার সাজা ঘোষিত হল। অপরসাথী শিব বর্মা, কিশোরীলাল, ডাঃ গযাপ্রসাদ, জযদেব কাপুর, বিজয কুমার সিন্‌হা, মহাবীর সিং এবং কমলনাথ তেওযারীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হল। কুন্দনলাল ও প্রেমদত্তের ওপর যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। আর অজয় ঘোষ, জীতেন্দ্রনাথ সান্যাল ও দেওরাজকে মুক্তি দেওয়া হল। বাকী পলাতকদের মধ্যে নাম ছিল ভগবতীচরণ ভোরার। তাঁকে বিচারের রায় ছুঁতে পারল না, কারণ আগেই তাঁর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। আর কমাণ্ডার-ইন্-চীফ চন্দ্রশেখর আজাদ তখন নাগালের বাইরে।

ভগৎ সিংদের বিচারের রায় শোনাবার দিনই লাহোরে ১৪৪ ধারা জারী করল পুলিশ। কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করে, পূর্ব আয়োজন বিনাই, শহরের মিউনিসিপ্যাল গ্রাউন্ডে, এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, বিরাট জনসভা হল। সংবাদপত্রে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। তাতে ভগৎ সিং ও তার সাথীদের ফটো ছেপে বার হল।

৮ই অক্টোবর, ১৯৩০ তারিখে লাহোরসহ দেশের অন্যান্য জায়গায় সভা সমিতি মিছিল ও হরতাল হল। স্কুল-কলেজ বন্ধ হল। ছাত্র, যুবক মহিলারা প্রতিবাদে রাস্তায় নামল। বিরাট সংখ্যায় গ্রেপ্তার হল। পুলিশের নির্বিচার লাঠি-চার্জে আহত হল অসংখ্য প্রতিবাদী মানুষ। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, দিল্লী, পাটনা, লাক্ষ্ণৌ সহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে প্রহসন মূলক বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠল সাধারণ মানুষ। দিকে দিকে সমস্ত বিপ্লবীদের বিনা শর্তে মুক্তি দেবারও দাবী উঠল।

গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলল, "এই তথাকথিত বিচারের ইতিহাস, বিশ্বের রাজনৈতিক বন্দীদের বিচারের ইতিহাসে

নাহীন ঘৃণ্য ইতিহাস। বৃটিশ উপনিবেশের অসহায় শোষিত, নির্যাতিত মানুষের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবার চক্রান্তে 'লেবার ইম্‌পিরিয়ালিস্ট গভর্নমেন্টের' ক্রোধান্ধ উন্মত্ততার এই চরম প্রতিশোধাত্মক অমানবিক ও নৃশংস দণ্ডাজ্ঞা।" (বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'International Press Correspondence'-এর ১৯শে মার্চ, ১৯৩১ সংখ্যা, সূত্র G. S. Deol)।

বার্লিন থেকে প্রকাশিত ঐ পত্রিকা আরও লিখল, "লাহোর ষড়যন্ত্র ও মীরাট ষড়যন্ত্রের রাজনৈতিক পরিকল্পনার উদ্‌গাতা হল নৃশংস সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকারী, ম্যাকডোনাল্ড। এদের গৃহীত নীতি এবং স্লোগান হল 'জুডিসিয়াল মারডার' বা 'আইনী হত্যা'। আইনের নামে খুন করা। এর উদ্দেশ্য হল উপনিবেশের মানুষকে শ্বাসরুদ্ধকারী মরণকামড় দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণকে টিকিয়ে রাখা।"

কারান্তরালের জীবন সংগ্রাম ভগৎ সিং-এর জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে কিভাবে সারাদেশের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির স্বার্থে নিঃশর্তে, নৈর্বক্তিকভাবে উৎসর্গ করতে হয় তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রেখে গেছেন বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং। বিশ্বের বিপ্লবী চরিত্রের ইতিহাসে তাই তিনি অনন্য, অসাধারণ।

৯

জীবনের অন্তিম পর্ব

(৮ই অক্টোবর ১৯৩০—২৩শে মার্চ ১৯৩১)

জেলে ফাঁসির সাজা শোনাতে এসেছিলেন স্টেট এ্যাডভোকেট Mr. Noad, জেলের সুপারিন্‌টেনডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে। বিচারেব রায় শোনবার পর স্টেট এ্যাডভোকেট বললেন, 'সরদার ভগৎ সিং, আমি দুঃখিত। আদালত তোমাকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছে।'

ভগৎ সিং জবাবে বললেন, 'না, না এতে আপনার দুঃখিত বা কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। এ আমি জানতাম, শুনেওছি।'

স্টেট এ্যাডভোকেট ভগৎ-এর নির্বিকার চেহারা দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'ভগৎ তুমি একজন বীর। আমি তোমার সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করি। কিন্তু তোমার এই যৌবন এই সাজার যোগ্য নয়। তুমি বেঁচে থাকলে দেশ একদিন একজন বড় মাপের যোগ্য নেতাকে পেত।' নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ পেল স্টেট এ্যাডভোকেটের কণ্ঠে।

ভগৎ হেঁসে কবীরের দোঁহা শোনালেন,
'জিস মরণে তে জাগ ডারে, মেরে মন আনন্দ
মরণে তে হি পায়ে পুরণ পরমানন্দ।'

(যে মৃত্যুতে দুনিয়া আতঙ্কিত হয়, সেই মৃত্যু আমার মনে আনন্দ দেয়, কারণ এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পূর্ণ পরমানন্দের স্বাদ মেলে।)

অভিভূত স্টেট এ্যাডভোকেট ভগৎকে পরামর্শ দিলেন 'মার্সি পিটিশন' জমা দেবার।

ভগৎ বললেন, 'না, এসবের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, এসব অর্থহীন সাম্রাজ্যবাদী আদালতের কাছে আমরা কোন বিচারের আশা রাখি না। বৃটিশ বিচাববিভাগ সকলে একযোগে ভারতের যুবকদের নির্যাতন, যথেচ্ছ সাজা ইত্যাদির গুঁড়িয়ে দেবার কাজ চালাচ্ছে। এদের কাছে দয়া ক্ষমা ইত্যাদি মানবিক বোধের কোন ঠাঁই নেই। দয়া প্রার্থনা করলেও ওরা এই সাজাই বহাল রাখবে। শত্রুর কাছে দয়া ভিক্ষা করার চাইতে বীরের মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। আমি স্বাধীনতার জ্বলন্ত শিখার দিকে ধাবমান আত্মবলিদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পতঙ্গ। আমি পরোয়ানা।'

এরপর জেলের সুপারিন্‌টেনডেন্ট ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলের ১৪নং সেলের কাল কুঠুরির দিকে এগোবার অনুরোধ করলেন। হেড আর্দালী, লাম্বোদরকে আদেশ দিলেন বন্দীদের জিনিষপত্র তাদের নির্জন কন্‌ডেমড্ সেলে পৌঁছে দেবার। ফাঁসির অপেক্ষায় দিবারাত্রি ঐ নির্জন সেলে প্রতীক্ষার পরীক্ষা শুরু হতে চলল।

যাবার আগে ভগৎ, সুখদেব ও রাজগুরু জেলের অন্যান্য সাথীদের আলিঙ্গন করলেন। বিদায় কালে ভগৎ বললেন, 'কমরেড, এই দেখাই আমাদেব শেষ দেখা। জেলের কয়েদ জীবন শেষ করে তোমরা যখন ঘরে ফিরবে তখন যেন সাংসারিক জীবনের পাঁকে জড়িয়ে যেও না। যতক্ষণ না সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াতে পাবছ, যতক্ষণ না দেশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারছ, তোমরা যেন অলসভাবে বসে থেকো না। তোমাদের কাছে আমার এই শেষ বার্তা, শেষ অনুরোধ। বিদায কমরেড।" (সূত্র, G. S. Deol 'Shaheed Bhagat Singh')।

দিল্লী আইনসভায় বোমাকাণ্ডের সহযোগী সাথী বটুকেশ্বর দত্ত মূলতান জেলে স্থানান্তবিত হয়েছিলেন। বন্ধুকে স্মরণ করে ভগৎ নভেম্বর (১৯৩০) মাসে লাহোরের সেন্ট্রাল জেল থেকে এক চিঠি পাঠালেন। চিঠিটি এইরকম :

"প্রিয় ভাই

"আমাকে দণ্ডাদেশ শোনান হযেছে। মৃত্যুদণ্ড বরাদ্দ হয়েছে আমার জন্য। এই জেলে আরও অনেক অপরাধী আছে যারা ফাঁসির অপেক্ষায় দিন গুনছে। তাদের নিরন্তর প্রার্থনা কোনরকমে ঐ ফাঁসির দড়ি থেকে পিছলে যাবার। হয়ত আমিই একমাত্র ব্যতিক্রম যে সাহসের সঙ্গে সেই দিনটার প্রতীক্ষা করছি যেদিন আমি আমার মহান আদর্শের জন্য ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে পারব।

"আমি তোমাকে জানিয়ে রাখছি, এই দুনিয়া দেখতে পাবে কিভাবে আমি আনন্দের সঙ্গে ফাঁসি কাঠে চড়ব এবং সাহসের সঙ্গে বিপ্লবী আদর্শের জন্য আত্মবলিদান করব।

"কিন্তু ভাই আমার তো না হয় ফাঁসির সাজা হয়েছে, কিন্তু তোমার তো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে। তোমাকে তো বাঁচতে হবে। বেঁচে থেকে দুনিয়াকে দেখিয়ে যেতে হবে বিপ্লবীরা তাদের আদর্শের জন্য কেবল জীবন দিতেই পারে না, আদর্শের জন্য সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করে জীবন সংগ্রামও চালাতে পারে। বিপ্লবীদের কাছে মৃত্যু কখনোই পার্থিব দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার হাত থেকে পলায়নের উপায় বা পথ নয়।

বর্মা তাঁর 'শহীদ স্মৃতি' গ্রন্থে এই সময়কার স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে :

"সাজার পর আমাদের বোর্স্টল জেল থেকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া সেখানকার নতুন ও পুরোনো দুই খাতাই পরস্পরের লাগোয়া ছিল। ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু নতুন খাতায় ছিল আর আমরা ছিলুম পুরোনোটাতে। একরাতে হঠাৎ আমাদের কুঠুবির তালা খুলল এবং আমাদের চলতে বলা হল। আমাদের সাথীদের ফাঁসি দেবার আগেই সরকার আমাদের অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে দিতে চাইছিল।

প্রধান জেলার, তার পুরো দলবলসহ আমাদের নিয়ে ফটকের দিকে চলল। কিছুদূর গিযে সে আমাদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের সাথীদেব সঙ্গে দেখা করবে?' উদারতার জন্য ধন্যবাদ পেয়ে সে নতুন খাতার ফটক খোলাল এবং আমাদের ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর কুঠুবিগুলির (সেল) সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

"জীবনে আর এই সাথীদের দেখতে পাবো না এইকথা ভেবে সকলেরই মুখ বিষন্ন। তাদের কাছ থেকে শেষবারের বিদায় নিয়ে আমরা যখন চলে যাচ্ছি, তখন আমাদের মধ্যে একজন (জযদেব কাপুর) ভগৎ সিংকে জিজ্ঞেস করল, 'সরদাব তুমি মরতে যাচ্ছ। আমি জানতে চাই তুমি এর জন্য আপসোস কবছ না তো?'

"প্রশ্নটা শুনে প্রথমে সরদার অট্টহাস্য কবল। তারপব গম্ভীর হয়ে বলল, 'বিপ্লবের পথে পা বাডাবার সময় আমি ভেবেছিলুম যদি আমি আমার জীবন দিয়ে, দেশের চতুর্দিকে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ-এর ধ্বনি পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে মনে করব যে আমি আমাব জীবনে মূল্য পেয়ে গেছি। আজ ফাঁসির এই কুঠুরির মধ্যে, গরাদের পিছনে বসেও আমি কোটি কোটি দেশবাসীর কণ্ঠ থেকে সেই ধ্বনির হুঙ্কার শুনতে পাই। আমি বিশ্বাস কবি আমার এই ধ্বনি স্বাধীনতা সংগ্রামের চালক শক্তিরূপে সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর শেষ পর্যন্ত আঘাত কবতে থাকবে।' আবার কিছুটা থেমে নিজের স্বাভাবিক স্মিতহাস্যের মধ্যে সে ধীরে ধীরে বলল, 'আর এত ছোট জীবনের, এব চেয়ে বেশি মূল্য কিই-বা হতে পাবে'?

"আমি সকলের পিছনে ছিলুম। বিদায় নেবার সময় আমার চোখে জল এসে গেল। আমাকে কাঁদতে দেখে সে বলল, 'ভাবপ্রবণ হবার সময় এখনো আসেনি প্রভাত (শিব বর্মার ডাকনাম)। আমি তো দিন কযেকের মধ্যেই সমস্ত ঝামেলা থেকে রেহাই পেয়ে যাবো। কিন্তু তোমাদের লম্বা সফর করতে হবে। আমার বিশ্বাস উত্তরদাযিত্বের বোঝা ভারী হওযা সত্ত্বেও, এই লম্বা অভিযানে তুমি ক্লান্ত হবে না ও পরাজয স্বীকাব করে পথের মাঝখানে বসে পডবে না।' এই বলে ভগৎ গরাদের ভিতব থেকে হাত বাড়িযে আমার হাত ধরল।

"জেলার কাছে এসে আস্তে করে বলল, 'চলুন।' সরদারের সঙ্গে এই ছিল আমাদের শেষ সাক্ষাৎকার।" ('শহীদ স্মৃতি'—শিব বর্মা)।

রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা সম্পর্কে ভগৎ সিং-এর চিন্তা :

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় তাঁর বিখ্যাত 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থে ঐ সময়ে বাঙলার বাইরে বিপ্লব-তরঙ্গ স্তিমিত হলেও 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির' উদ্যোগে

অ্যাকসনগুলির মধ্যে অন্যতম শহীদ হরিকিষেণের পাঞ্জাবের গভর্নর জিয়োফ্রি মন্টমোরেন্সির ওপর গুলি চালনার ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৩০ সালের ২৩ ডিসেম্বরের দুপুরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবের কাজ সমাপ্ত হরিকিষেণ তার ওপর গুলি চালায়। গভর্নর গুলি খেয়ে বেঁচে গেলেও সাব-ইন্সপেক্টর চন্নন সিং-এর গুলিতে মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এই তরুণ হরিকিষেণের ভাই, বিপ্লবী ভগৎরামই এই ঘটনার বছর দশেক বাদে ১৯৪১ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পথপ্রদর্শক ও বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম পাহাড়ী পথে। ('কাবুল পর্ব : উত্তমচাঁদ', 'নেতাজী ও ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ')

হরিকিষেণের মামলা শুরু হয় জানুয়ারী ১৯৩১ নাগাদ এবং ফাঁসি হয় ১৯৩১ সালের ৯ই জুন, ভোর ৬টায। এই মামলার গতিপ্রকৃতির ওপর ভগৎ সিং আগাগোড়াই লক্ষ্য রাখছিলেন। হরিকিষেণের উকিল আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, 'গভর্নরকে হত্যা করা হরিকিষেণের উদ্দেশ্য ছিল না। হরিকিষেণের উদ্দেশ্য ছিল তাকে হুঁশিযারী দেওয়া।' ভগৎ-এর মতে এ ছিল অত্যন্ত জোলো সাফাই'-এর সওয়াল।

ভগৎ সিং, মামলা পরিচালনার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতাব বিরোধী বলে মনে করেন। জেল থেকেই তিনি তাঁর বন্ধুকে পরপব দুটি চিঠি পাঠিয়ে, এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন। এই দুটি চিঠির একটির হদিশ মেলে জুন ১৯৩১-এর 'পিপল' নামে এক ইংরাজী পত্রিকার প্রকাশনা থেকে।

চিঠিটির বিষয়, যুক্তির অবতারণা ও বলিষ্ঠভাবে জেলের অভ্যন্তরে ফাঁসির দড়ির সামনে দাঁড়িয়েও ভগৎ-এর বিপ্লবী উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন নেতৃত্বকারী ভূমিকা বিপ্লবের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অবদান। চিঠিটি এইরকম :

"আমার আগের চিঠি তোমার কাছে যথাসময়ে পৌঁছয়নি। ফলে যে উদ্দেশ্যে সেটা পাঠান, তা সফল না হওয়ায়, আমি দুঃখিত। এই কারণেই, আদালতে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে মামলা লড়ার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে হরিকিষেণের কেসে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা তোমাকে আবার জানাচ্ছি।···আমি যে ঘটনা ঘটে যাবার পর বিজ্ঞজনোচিত কথা বলছি না, এই চিঠি তার প্রমাণ্য দলিল হিসেবে সাক্ষী দেবে।

"যাই হোক, আমি আগের চিঠিতে বলেছিলাম হরিকিষেণের মামলায় তার উকিল যে ভাবে আসামীর সমর্থনে যুক্তি খাড়া করেছেন সেটা ঠিক হয়নি। কিন্তু তোমার ও আমার উভযের বিরোধিতা সত্ত্বেও এটা ঘটল।

"তবুও আমরা বিষযটা বিশদভাবে আলোচনা করতে পারি যাতে আমরা আগামী দিনে বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের মামলা পরিচালনা সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু নীতি তৈরি করতে পারি।···

"মানুষের কাজের পেছনে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। তাই গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর, তার সেই কাজের রাজনৈতিক গুরুত্ব হালকা হয়ে যাওয়া উচিত নয়। কাজের উদ্দেশ্য থেকে গ্রেপ্তারবরণকারী ব্যক্তির গুরুত্ব বড় হতে পারে না। আমি বিষয়টাকে পরিষ্কার করার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মিঃ হরিকিষেণ পাঞ্জাবের গভর্নরকে গুলি করে মারতে এসেছিল। আমি এখানে এই অ্যাকসনের নৈতিক দিক নিয়ে বা নীতিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা

চাই না। আমি এই বিষয়ের রাজনৈতিক দিকটা তুলে ধরতে চাই। অ্যাকসনের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এই অ্যাকসনে একজন পুলিশ অফিসার গেছে। এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রশ্ন এসেছে। দেখ, এই কেসে যেহেতু গভর্নর্ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে, সেক্ষেত্রে আদালতে একটা চমৎকার বয়ান পেশ করা যেত। নিম্ন আদালতে যেমন সত্য ঘটনা বিবৃত হয়েছিল ঠিক তেমনি বয়ান। আইনগত উদ্দেশ্যও তার দ্বারা সিদ্ধ হোত। গুলিতে সাব-ইন্‌স্পেক্টরের মৃত্যুর ঘটনাটাকে যথার্থভাবে খ্যা করার ওপরই উকিলের জ্ঞান, বুদ্ধি ও যোগ্যতার আসল পরিচয় মিলত। কিন্তু উকিল সাহেব আদালতে ঐ যে বললেন, যে, হরিকিষেণ আসলে গভর্নর্‌কে হত্যা করতে চায়নি, তাকে কেবল হুঁশিযারী দিতে চেয়েছিল, এসব কথায় কি লাভ হল?

"কোন বুদ্ধিমান লোক এক মুহূর্তের জন্যও কি এমন উদ্ভট পরিকল্পনার কথায় বিশ্বাস করবে? তাছাডা এসব কথার কোন আইনগত মূল্য আছে? নিশ্চয নেই। তাহলে এসব কথা বলে সাধারণভাবে সমগ্র বিপ্লবী প্রচেষ্টা এবং বিশেষ করে এই অ্যাকসনের মহত্ব ও মর্যাদাকে ম্লান করে দেবার কি অর্থ হয়?

"নিছক হুঁশিয়ারী ও নিষ্ফল প্রতিবাদ চিরকাল ধরে চলতে পারে না। হুঁশিযারী তো একবার দেওয়াই হয়েছে অনেকদিন আগে। তারপর থেকে বিপ্লবী দল তার সামর্থ অনুযাযী বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বড়লাটের ট্রেন উডিয়ে দেবাব যে অ্যাকসন হয়েছে সেটা কোন নিছক পরীক্ষা বা হুঁশিযারী নয। তেমনি হবিকিষেণেব অ্যাকসনটাও এই সামগ্রিক সংগ্রামের অঙ্গ। এটা কোন নিছক হুঁশিয়ারী জানানো নয়। ফলে এই অ্যাকসনে, হত্যাকাণ্ডে সাফল্য না এলেও একে সংগ্রামী মানসিকতার জয-পরাজয়ের খেলোয়াড-সুলভ দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। হরিকিষেণ তার সংগ্রামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সমর্থ হযেছে। ফলে গভর্নর্ বেঁচে যাওয়ায় সে ব্যক্তিগতভাবে খুশি হতেও পারে। কাবণ নিছক একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা নিরর্থক।

"এইসব অ্যাকসনের যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। কারণ এইসব কাজের ফলে মানুষের মধ্যে বিপ্লবের পরিপূরক মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি হবে, যেটা অন্তিম লড়াই'-এর জন্য খুবই জরুরী প্রয়োজন। এবং এটাই মূল কথা। ব্যক্তির অ্যাকসনেব উদ্দেশ্য, সমষ্টির অথবা জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন আদায কবে নেওয়া। এগুলিকেই আমবা 'কাজের মাধ্যমে প্রচার' বলে আখ্যায়িত করে থাকি।

"উপরোক্ত বিবেচনার ভিত্তিতেই তাহলে এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজ চালাতে হবে।…হরিকিষেনের অমূল্য জীবন রক্ষা করতে আমি কারও থেকে কম আগ্রহী এবং চিন্তিত নই। কিন্তু আমি তোমাকে এ কথাও জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, যে মহান বিপ্লবী উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে হরিকিষেনের জীবন আমাদের কাছে এত মূল্যবান হল, সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটা যেন অবহেলিত না হয়। যে কোন উপায়ে, যে কোন মূল্যে আমাদের নিজেদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা কখনোই আমাদের দলের নীতি নয়। ইজি-চেয়ারের সুখের রাজনীতি যারা করে ওটা তাদের নীতি হতে পারে, আমাদের নয়।

"এটা সত্যি কথা যে আত্মপক্ষ সমর্থনের কৌশলের অনেকটাই নির্ভর করে ব্যক্তির

মানসিক কাঠামো ও তার মানসিক শক্তির ওপর। কিন্তু যেখানে অভিযুক্ত কোন কোন দণ্ডকেই ভয় পায় না বরং বিপ্লবী উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আগের মতই করে, তাহলে সেক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্য তার জীবন বিপন্ন করল সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটাকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন বিবেচিত হওয়া উচিত এর পর।...

"যাই হোক, তুমি যদি এই চিঠিটা আগের চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে একসঙ্গে পড, তাহলেই আশা করি তুমি রাজনৈতিক কর্মীদের ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের কৌশল কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝতে পারবে। হরিকিষেণের মামলা সম্পর্কে আমার অভিমত যে, অবিলম্বে, হাইকোর্টে আপীল জমা দেওয়া দরকার। হরিকিষেণের জীবন রক্ষার্থে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

"আশা করি আমার দুটি চিঠি একত্রে পডলে তুমি বুঝতে পারবে রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা সম্পর্কে আমার বক্তব্য কি ধরনের।" ('Selected writings of Shaheed Bhagat Singh', by Shib Verma)।

নির্জন সেলে ভগৎ সিং-এর নিরলস বিপ্লবী কর্মপ্রয়াস :

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা এবং পরবর্তীকালে ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাংলা রচনা 'কারাকাহিনী' এবং 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'-য় নির্জন সেলে নিদারুণ যন্ত্রণাময় জীবন যাপন ও পবে তাঁর ভগবৎ ভক্তিবলে ধ্যান ও সাধনায় উত্তরণ ও নারাযণ উপলব্ধির বিশদ মর্মস্পর্শী বর্ণনা করেছেন। নির্জন কারাবাসে ইতালীব বিপ্লবী ব্রেশীর উন্মাদ হযে যাবার করুণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ধর্মপ্রাণ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গভীর ভগবৎ বিশ্বাস, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর উপনিষদীয় উপলব্ধির ভিত্তিতে শক্তি অর্জন করে নির্জন সেলের জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। সব কিছুই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা—এই ভগবৎ বিশ্বাসে সব কষ্টের মোকাবিলা করেছেন।

কিন্তু, তরুণ যুবক ভগৎ সিং-এর ফাঁসির অপেক্ষায় গোনা নির্জন কনডেমড্ সেলের দিনগুলি কেটেছে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। শক্ত যুক্তিভিত্তিক বিশ্বাসের বুনিযাদেব ওপর দাঁডানো ভগৎ সিং-এর নাস্তিকতাবোধ শ্রীঅরবিন্দের মত তাঁকে ভগবান বিশ্বাসের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ধ্যান সাধনার উপায অবলম্বন করে কঠিন নির্জনতার হাত থেকে মুক্তি দিতে কোন সাহায্যই করেনি। কোন ভগবৎভক্তি বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবলম্বন করে ভগৎ সিংকে নির্জন সেলের নিদাকণ জীবন কাটাতে হয় নি। আপন যুক্তি, তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার প্রতি অবিচল আস্থা ও গভীর অধ্যযনের প্রতি আত্মনিয়োগ করেই তিনি এই সংগ্রামে বিজয় হাসিল করেছেন।

জেলের নির্জন সেলে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ তাঁর গভীব ঈশ্বরবিশ্বাসের শক্তিতে ধ্যান সাধনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও দর্শনের এক অত্যাশ্চর্য বিকাশ ঘটিযেছেন তাঁর ব্যক্তিজীবনে। পরবর্তীকালে যে উপলব্ধি তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের এক উজ্জ্বল শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। উত্তরণ ঘটেছিল ঋষি শ্রীঅরবিন্দে।

আর পাশাপাশি সামান্য দুই এক দশকের ব্যবধানে ভগৎ সিং নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে

নির্জন সেলে বসে দুনিয়ার লক্ষকোটি শোষিত সংগ্রামী মানুষের কাছে মৃত্যুপথযাত্রীর অত্যাশ্চর্য প্রেরণাময় অপূর্ব সৃজনশীল সৃষ্টিধর্মী প্রাণবন্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ উৎসর্গ করে গেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যা অমূল্য সম্পদ। নতুন জীবন, নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রামে যা অনুপ্রেরণার উৎস।

তিনটি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে এই প্রসঙ্গে। প্রথমটি 'কেন আমি নাস্তিক'। এরপর 'ড্রিমল্যান্ড' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা ও সর্বশেষে 'তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি' আহ্বান। এছাড়া কয়েকটি ঐতিহাসিক পত্র-প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য। যেমন, "ফাঁসি নয়, গুলি করে আমাদের হত্যা করা হোক' এবং ভাই কুলবীর সিং ও কুলতার সিংকে লেখা ৩রা মার্চ ১৯৩১ তারিখের চিঠি এবং জীবনের শেষ চিঠি ২২শে মার্চ ১৯৩১ তারিখে লেখা জেলের সাথীদের উদ্দেশ্যে।

এছাড়া জেল-জীবনে ভগৎ সিং চারটি বই লেখেন। (১) সমাজতন্ত্রেব আদর্শ, (২) আত্মজীবনী, (৩) মৃত্যু ফটকের সামনে, (৪) ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস। জেল থেকে এই বইগুলির পাণ্ডুলিপি গোপনে বাইরে পাচার করা হয়। কিন্তু যেসব সাথী ও সমর্থকদেব হাতে সেগুলি সুরক্ষিত থাকার কথা ছিল, সেই ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। ফলে ভগৎ সিং-এর লেখা এই বইগুলি জনসমক্ষে আসতে পাবে না।

'কেন আমি নাস্তিক', ভগৎ সিং :

জেলের জীবনে লেখা এই পুস্তিকাটির পশ্চাৎপট হল, গদর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯১৬ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত আসামী সন্ত, বাবা রণধীর সিং-এর সঙ্গে জেলে ভগৎ সিং-এব সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন। সন্ত রণধীর সিং-এর সঙ্গে ভগৎ-এর সাক্ষাৎকারের দিনটি ছিল ১৯৩০ সালের ৪ঠা অক্টোবর, যেদিন এই ধার্মিক নেতার জেল থেকে মুক্তি হয়। ভগৎ সিং-এর নাস্তিকতা প্রসঙ্গে রণধীব সিং নাকি উত্তেজিত হয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য কবেন, 'চারদিকের সুখ্যাতি তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তোমার অহংবোধই তোমার এবং ঈশ্বরের মধ্যে পর্দার আড়াল সৃষ্টি করেছে।' ইত্যাদি।

বাবা রণধীর সিং-এর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই ভগৎ সিং এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি রচনা কবেন। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় লাহোরের 'The People' পত্রিকায় ২৭/৯/৩১ তারিখে। তিনি লেখাটি শুরুই করেন এইভাবে, "একটা নতুন প্রশ্ন উঠেছে। এটা কি সত্যি যে, আমি আমার দম্ভ ও অহংকার বশে সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না? আমাকে যে কখনো এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে একথা আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি।" দীর্ঘ প্রবন্ধের পরবর্তী কিছু নির্বাচিত অংশ :

"অন্যান্য প্রচলিত মতবাদের থেকে যেহেতু আমাদের চিন্তাধারা অনেকখানি স্বতন্ত্র, সেই অর্থে আমাদের মধ্যে একটা অহংবোধ আছে। কিন্তু এটা কোন ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এটা হয়ত আমাদের মতাদর্শের স্বাতন্ত্রের জন্য সকলেরই গর্ববোধ। কিন্তু একে

কখনোই দাম্ভিকতা বলা যায় না। দম্ভ বা আরো সঠিকভাবে বললে 'অহংকার' হল একজন মানুষের নিজের সম্পর্কে অনুচিত বা অতিরিক্ত গর্ববোধ। এই ধরনের অতিরিক্ত গর্ববোধ অথবা বিষয়টি সম্পর্কে সযত্ন অধ্যয়ন ও গভীর বিচার বিশ্লেষণের ফলেই আমার এই ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মেছে সেটা আলোচিত হওয়া দরকার।...

"একটা সময় (১৯২৫-২৬) পর্যন্ত আমি ছিলাম কেবলমাত্র ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী বিপ্লবী। নেতাদের অনুসরণ করাই ছিল তখন অবধি আমাদের কাজ। এবার দলের গোটা দায়িত্ব কাঁধে নেবার সময় এসে গেল। দলের বিভিন্ন অ্যাকসনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছু সময়ের জন্য দলের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কেবল দলের আগ্রহশীল কমরেডরাই নয়, নেতারাও আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে শুরু করলেন। আমারও আশঙ্কা হতে আরম্ভ করল আমিও না এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দলের কর্মসূচীকে অসার বলে ভাবতে শুরু করি। ঐ সময়টা ছিল আমার বিপ্লবী জীবনের সন্ধিকাল। আমার মনের অলিন্দে একটা শব্দই কেবল অনুরণিত হতে থাকল, 'অধ্যয়ন'। বিরোধী পক্ষের যুক্তিজাল খণ্ডন করার জন্য এবং নিজেদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করতে হবে। ফলে গভীরভাবে 'অধ্যযন' শুরু করলাম। আমার পুরোনো বিশ্বাস ও উপলব্ধির চমকপ্রদ পরিবর্তন হতে থাকল।... ভাববাদ ও অন্ধ বিশ্বাস বিদায় নিল। বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা আমার চর্চার বিষয় হল।...

"১৯২৬ সালের শেষ নাগাদ আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তিমান পরম সত্তার তত্ত্ব, যাতে বলা হয়েছে তিনি নাকি গোটা দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী, সেটা এক ভিত্তিহীন তত্ত্ব। বন্ধুদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করলাম। সকলের কাছে এইভাবে আমি একজন নিশ্চিত ঘোরতর নাস্তিক বলে পরিচিতি পেলাম।...

"আমাদের পূর্বপুরুষরা যেহেতু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ওপর তাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, সেই কারণেই যদি কেউ এই বিশ্বাসের কার্যকারিতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানায় অথবা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার দুঃসাহস দেখায় তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে স্বধর্মত্যাগী দুরাচার বলে আখ্যায়িত করা হয়। যদি দেখা যায় যে এইসব ব্যক্তির যুক্তিগুলো এমন জোরালো যে, পাল্টা যুক্তি দিয়ে সেগুলো খণ্ডন করা যাচ্ছে না এবং যদি দেখা যায় লোকটা এতই সাহসী যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিশাপের ভয় দেখিয়েও তাকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না; তাহলে নির্ঘাৎ তাকে আত্মম্ভরী বলে নিন্দা করা হবে এবং তার তেজস্বিতাকে অভিহিত করা হবে অহংকার বলে। তাহলে অযথা এই আলোচনায় সময় নষ্ট করে কি লাভ?...

"আমি জানি আমার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে, আমার জীবনকে তা অনেক সহজ করতে পারত, মনের ভার লাঘব করতে পারত। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস জনিত নাস্তিকতা আজ আমার চারপাশের পরিবেশকে নীরস করে তুলেছে। হয়তো তা আরও রুক্ষ ও কর্কশ হয়ে উঠবে। পরিবর্তে আমার মধ্যে যদি অতীন্দ্রিয়বাদের সামান্যতম প্রভাব থাকত, তাহলে এই নির্জন সেলের পরিবেশই আমার কাছে কাব্যিক

হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু আমি আমার চরম পরিণতি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও কোন কৃত্রিম উন্মাদনামূলক বিশ্বাসের সাহায্য নেব না। কারণ আমি বস্তুবাদী। আমি আমার নিজের মধ্যেই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুক্তি বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আমি যে সর্বক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি এমন নয়। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হল চেষ্টা করে যাওয়া, সংগ্রাম চালিয়ে যাওযা সাফল্য নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনা-চক্রের ওপর।…

"ঈশ্বরের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাব নিজস্ব ধাবণা হল, কল্পনার জগৎ-এ ঈশ্ববকে আনা হয়েছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। সমাজ-জীবনে মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতা, তার দুর্বলতা ও দোষ-ক্রটিব কথা বিবেচনা করেই এ কাজ করা হযেছে। ঈশ্বরকে এইভাবে মানুষের সামনে হাজিব করার উদ্দেশ্য হল, কঠিন কঠোর পবিস্থিতির মোকাবিলায় মানুষকে ঈশ্বরের মাধ্যমে প্রেবণা জোগানো। পৌরুষের সঙ্গে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হতে সাহায্য করা এবং জীবনের উন্নতি, সাফল্য, সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধিব উচ্ছ্বাসে মানুষকে সংযত করা। ঈশ্বরকে তাঁর একান্ত নিজস্ব ঐশ্ববিক বিধি-নিযম ও উদারতার মধ্যেই কল্পনা করা হয়েছে এবং অনেক বিস্তৃত পটে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে। মানুষের সামাজিক আচরণে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার প্রবণতাকে প্রতিবোধ করাব জন্যই ঐশ্ববিক ক্রোধ ও তাঁর নিজস্ব বিধি নিযমের নিষেধাজ্ঞা জারী রাখা হযেছে।… সুতরাং আদিমযুগের সমাজে ঈশ্বর ছিলেন অত্যন্ত প্রয়োজনের ও উপকারের পাত্র। ঈশ্বর-চিন্তা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে খুবই সাহায্য করে।

"…মানুষ যখন যুক্তি বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে স্বাবলম্বী চিন্তায় নিজের পাযে দাঁডাবার সংগ্রাম শুরু করে এবং দর্শনগতভাবে বস্তুবাদকে গ্রহণ করে, তখন তাকে এইসব ঈশ্বর-চিন্তা ত্যাগ করতে হয। পরিস্থিতি তাকে যে-কোন দুঃসহ অবস্থাতেই ফেলুক, তাকে পৌরুষ ও সাহসের সঙ্গে সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা ও কষ্টের মোকাবিলা করতে হয।

"এই হচ্ছে মোদ্দা কথায় আমাব চিন্তা ভাবনার অবস্থা। ফলে, বন্ধু, এটা আমার কোন দম্ভ নয়। এই চিন্তা-পদ্ধতিই আমাকে নাস্তিক বানিয়েছে।…ঈশ্বরে অবিশ্বাসী আমারই মত অনেক মানুষের কথা আমি পডেছি। তাঁরা বলিষ্ঠতার সঙ্গে সমস্ত দুঃখ কষ্টের মোকাবিলা করেছেন। আমিও চেষ্টা করছি শেষ দিন অবধি এমনকি ফাঁসির দড়ির সামনেও যেন প্রকৃত মানুষের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

"দেখা যাক, আমার এই লডাই কতদূর যায়। আমাব এক বন্ধু উপদেশ দিয়েছে জেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষার দিনগুলিতে আমি যেন ভগবানের প্রতি প্রার্থনা জানাই। পরে যখন সে শুনল যে আমি ঘোর নাস্তিক, তখন বলল, 'শেষের দিনগুলিতে তোমাকে ভাই ভগবান বিশ্বাসী হতেই হবে।' আমি বন্ধুটিকে বলেছি, 'না, মশাই না। এ কখনোই হবে না। এ কাজ তো তাহলে হবে আমার চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতন। একান্ত নিজের স্বার্থে স্বার্থপর হয়ে আমি কারো কাছে প্রার্থনা জানাতে যাব না।'

"পাঠক মহোদয় ও বন্ধুগণ, আপনারাই বিচার করুন, আমার এই ভাবনা, চিন্তা, যুক্তিবোধ ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নামই কি 'অহংকার'?

"যদি কেউ বলেন, 'হ্যাঁ এটাই অহংকার।' তাহলে আমি বলব, 'থাকুক এই সামান্য অহংকার, থাকুক'।"

ভগৎ সিং-এর নাস্তিকতাবোধ ছিল বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বোধের এক ঐতিহাসিক অবদান।

প্রখ্যাত অধ্যাপক বিপান চন্দ্র, ভগৎ সিং-এর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পুস্তিকার মুখবন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ভগৎ-এর দৃষ্টিভঙ্গির। তিনি বলেছেন :

"ভগৎ সিং কেবল ভারতের অন্যতম মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী সমাজ-তন্ত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রথম যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিক। দুঃখের বিষয় ভগৎ সিং সম্পর্কে শেষের এই গুণাবলীর কথা তুলনামূলকভাবে অজানাই রয়ে গেছে।···

"১৯২৭-২৮ সাল থেকে ভগৎ সিং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে, মার্কসবাদী চিন্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সাল অবধি তিনি পড়াশুনা করেছেন অবিশ্বাস্য পুস্তক-ক্ষুধায়।

"১৯২০-র দশকে ভগৎ সিং এ দেশে বিপ্লবী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদি বিষয় ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বগত বিষয়ে সারা ভারতের অন্যতম বিশেষ অধ্যয়নশীল বা পড়ুয়াদের একজন। ভগৎ সিং কেবল নিজেই অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। পাশাপাশি তিনি দলের সাথীদের মধ্যেও পড়াশুনা করা, তর্ক-বিতর্কে অংশ নেওয়া ইত্যাদি চর্চায় উৎসাহ দিয়েছিলেন।

"আমাদের দেশের মানুষের জীবনে তথা জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল ভগৎ সিং-এর মত এমন অল্পবয়সের অতি উচ্চস্তরের চিন্তাবিদ, দার্শনিককে সাম্রাজ্য-বাদীদের যূপকাষ্ঠে হত্যা করা হল। তাঁকে স্তব্ধ করা হল।"

'কেন আমি নাস্তিক' পুস্তিকার ভূমিকায় অধ্যাপক বিপান চন্দ্র এই প্রবন্ধটির দীর্ঘ মূল্যায়ন করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "ভগৎ সিং-এর, ধর্মের ভূমিকা এবং তার মৌলিক কারণগুলির ব্যাখ্যা অনবদ্য। এর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর শক্তিশালী চিন্তাশক্তির পরিচয় পাই। তাঁর বিপ্লবী সংকল্প এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নির্ভর অসামান্য চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে এই প্রবন্ধে।"

(সূত্র : 'Why I am an atheist', Published by SAMAJBADI SAHITYA SADAN, KANPUR, 2nd Edition 1982, Editor SHIBA VARMA)।

'ড্রিমল্যান্ড'-কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়, ভগৎ সিং :

ভগৎ সিং-এর লেখা এই ভূমিকাটি প্রকাশিত হয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ও গদর আন্দোলনে অভিযুক্ত প্রবীণ বিপ্লবী লালা রামশরণ দাসের লেখা 'ড্রিমল্যান্ড' বা স্বপ্নলোক কাব্যগ্রন্থে। ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে, নির্জন সেলে বসে ভগৎ সিং এই লেখাটি শেষ করেন ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩১ তারিখে। ভগৎ-এর মূল লেখাটি ছিল ইংরাজী ভাষায়। এই লেখাটির মধ্য দিয়ে ভগৎ সিং-এর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাবার পাশাপাশি বৈশিষ্ট্যমূলক

উল্লেখযোগ্য পরিচয় মেলে তার উচ্চমানের সাহিত্য সমালোচকের কলমের। লেখাটির কিছু নির্বাচিত অংশ এইরকম :

"আমার যোগ্য বন্ধু লালা রামশরণ দাস তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ড্রিমল্যান্ড'-এর ভূমিকা লিখে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সমস্যা হল যে আমি না কবি, না সাহিত্যিক, না সাহিত্য-সমালোচক, না সাংবাদিক। তাই লালাজী কেন যে এই কাজে আমাকে বেছে নিলেন তা বুঝতে পারছি না। নির্জন সেলে এখন আমি যে অবস্থায় আছি সেখানে লেখকের সঙ্গে আলোচনা, বিতর্ক-এসবের কোন সুযোগ নেই। ফলে নিরুপায় হয়েই আমাকে তাঁর ইচ্ছাপূরণ করতে হচ্ছে।...

"রাজনৈতিক পরিসরে 'ড্রিমল্যান্ড'-এর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের পরিস্থিতিতে তিনি আন্দোলনের একটা অসম্পূর্ণ দিক পূর্ণ করেছেন। বাস্তবপক্ষে বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী রাজনীতিক আন্দোলন আদর্শগতভাবে দুর্বল। বিপ্লবী আন্দোলনও এই দোষ থেকে মুক্ত নয়।...আমার জ্ঞাতসারে এমন একটি বিপ্লবী দল দেখলাম না, যারা—কি জন্য লড়ছে, এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে।

"আমরা যখন বিপ্লবের কথা বলি তখন এ কথাই বোঝাতে চাই যে, বর্তমান অবস্থায় অর্থাৎ এই বিদেশী সরকারের পরিপূর্ণ অপসারণের পর দেশে কোন্ নীতিতে পুনর্গঠন ও নির্মাণকার্য করা হবে। অপর কথায়, বিপ্লব এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর পথ নির্দেশ দেয়।...

"লালা রামশরণ দাস ১৯১৫ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। (গদর আন্দোলনের সূত্রে)। পরে আপিলে সে দণ্ড হ্রাস পেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বর্তমানে নিজে স্বয়ং ফাঁসির অপেক্ষায় কারাগারের নির্জন কুঠুরিতে থেকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে মৃত্যু অপেক্ষা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আরো কঠোর শাস্তি। লালা রামশরণ দাস পুরো চৌদ্দ বছব জেলে কাটান এবং দক্ষিণের কোন জেলে বন্দী অবস্থায় এই কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। লেখক বন্দীশালায তখন যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিয়ে সেই দিনগুলি কাটিয়েছেন তার প্রতিফলন এই কাব্যগ্রন্থে মূর্ত হয়েছে। ফলে তাঁর লেখা আরো আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী হয়েছে। এই গ্রন্থ লেখার পূর্বে লেখককে তাঁর বিষাদগ্রস্ত মানসিকতার বিরুদ্ধে যে যথেষ্ট যুঝতে হয়েছিল তা বোঝা যায়।...

"সূচনায় তিনি দার্শনিক ভাবধারা ব্যক্ত করেছেন। এই দর্শনভঙ্গি বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী আন্দোলনের লক্ষণ। এ প্রসঙ্গে লেখকের সঙ্গে আমার গভীর মতভেদ আছে। তাঁর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হল উদ্দেশ্যবাদী এবং অধ্যাত্মভিত্তিক বা অধিবিদ্যক (Metaphysical)। কিন্তু আমি বস্তুবাদী। তাই আমার কাছে দৃশ্যজগৎ কার্য-কারণ সূত্রে বাঁধা। তবুও তাঁর লেখা এই কাব্য অপ্রাসঙ্গিক বলা যাবে না। আমাদের দেশে সাধারণভাবে যে ধ্যানধারণা প্রচলিত আছে তার সঙ্গে লেখকের বক্তব্যের মিল আছে। মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে ক্লিষ্ট তাঁর অন্তর তাই প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছে সেই সংঘাতের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। এই গ্রন্থের প্রাথমিক অধ্যায় পাঠ করলে এটা প্রতিভাত হবে।

…এসব সত্ত্বেও লেখকের রহস্যবাদ নেতিবাচক হয়নি, দুঃখবাদীও নয়। রচনা স্ব-গুণে মনোগ্রাহী হয়েছে, উৎসাহসূচকও হয়ে উঠেছে। যেমন:

"Be a foundation stone obscure
And on thy breast cheerfully bear
The architecture vast and huge.
In suffering find true refuge.
Envy not the plastered top stone
On Which all wordly praise is thrown.

(চোখের আড়ালে যে ভিত/কি আনন্দে বিরাট সৌধ বুকে রেখেছে/অনেক যন্ত্রণার প্রকৃত যে আশ্রয়/প্রার্থিব সব প্রশস্তি যেখানে বর্ষিত/ঈর্ষা কোর না সেই মসৃণ শীর্ষ ফলককে।)…

"সবশেষে তাঁর কাব্যগ্রন্থের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আমি আলোচনা করছি। এই অধ্যায়েই তিনি ভাবী সমাজ কাঠামোর ওপর আলোকপাত করেছেন, যে ধরনের সমাজ কাঠামোর জন্য আমরা সবাই আগ্রহান্বিত।…কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের উদ্‌গাতা সেন্ট সাইমন, ফুঁরিয়ে এবং রবার্ট ওয়েন প্রমুখেব সমাজ বিষয়ক তত্ত্বসমূহ না থাকলে মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকাশ হত না। আমাদের নেতারা যখন তাদের আন্দোলনের ভাবাদর্শের রূপরেখা টানবেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রযোজন অনুভব করবেন তখন এই কাব্যগ্রন্থ তাদের পক্ষে সহায়ক হবে।…

"…উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আমি বিস্তৃতভাবে আমার বক্তব্য রাখলাম। অর্থাৎ সমালোচনাই করলাম। কিন্তু তাই বলে আমি তাঁর গ্রন্থের কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন করার কথা বলছি না। কেননা তাঁর বিচার-বিশ্লেষণেব একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তিনি হলেন ১৯১৪-১৫ সালের একজন বিপ্লববাদী কর্মী। তাঁর ভাবধারা সমকালীন ধ্যান-ধারণার একটি প্রতিফলন।

"আমাদের তরুণ সমাজকে এই গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ জানাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই রচনায় যা আছে সেইভাবে অবিকল তাই যেন গ্রহণ না করেন। আপনারা খোলা মনে পড়ুন। আলোচনা করুন। এবং অধ্যয়নের দ্বারা নিজেদের আদর্শ-যোগ্য করে তুলুন। ভগৎ সিং। ১৫/১/৩১।" (সূত্র: 'শহীদ-স্মৃতি', শিব বর্মা রচিত)।

'তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি', ভগৎ সিং :

নির্জন সেলে অলস অথবা হতাশভাবে ফাঁসির অপেক্ষায় দিন কাটাননি ভগৎ সিং। আসন্ন মৃত্যুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভরে অবহেলা করে জীবনের শেষটুকু নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন সারা দেশের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য। এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ ১৯৩১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এক বন্ধুকে লেখা ভগৎ সিং-এর এই ঐতিহাসিক

পত্র। এই পত্র গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ও বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে আপস আলোচনার সমকালীন। মূল পত্র ভগৎ লিখেছিলেন ইংরাজী ভাষায়। পত্র বেশ দীর্ঘ। পত্রের অঙ্গচ্ছেদ করে প্রথম এটি প্রকাশিত হয় ভগৎ-এর মৃত্যুর পর। পত্রে উল্লিখিত সোভিয়েত ইউনিয়ন, কার্ল মার্কস, লেনিন, কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছেঁটে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের গোপন দলিল হিসেবে এটি পাওয়া যায়, যার হদিশ করেন ভগৎ-এর যোগ্য সাথী শিব বর্মা। লাক্ষ্ণৌর শহীদ স্মৃতিরক্ষা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের গবেষণা কেন্দ্রের লাইব্রেরী থেকে তিনি এই চিঠির পূর্ণ বয়ান উদ্ধার করেন।

এই পত্র-দলিলটি ভারতের তৎকালীন তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের সঠিক পথনির্দেশের স্বার্থে রচিত। এই সময় কংগ্রেস দল ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে আপস আলোচনার খবর শোনা যাচ্ছিল। এই পত্র-দলিলের মাধ্যমে ভগৎ সিং বিশদ আলোচনায় ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে মূল লক্ষ্য ও আদর্শের পরিপূরক আপস রফা করা চলে এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় এই আপস সমর্থনযোগ্য নয়। কুশলী রাজনীতিকের দৃষ্টিতে ভগৎ ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের পন্থা-পদ্ধতি নিশ্চিত ভাবে একটা যেমন তেমন আপসরফায় শেষ হবে।

দীর্ঘপত্রের মধ্য ও শেষাংশে ভগৎ একে একে বিশদ ব্যাখ্যা করলেন, 'কংগ্রেস কি চায়,' 'তরুণ সমাজের কর্তব্য কি', 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির মর্মার্থ কি', 'আমাদের লক্ষ্য কি', 'আগামী দিনের সংবিধানের রচনা কি ধরনের হওয়া উচিত', 'প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের নামে প্রাদেশিক জবরদস্তি', 'পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়', 'রাজনৈতিক কর্মীর প্রয়োজন ও তাদের শিক্ষা', 'বিপ্লবী দলের সৈনিক বিভাগের প্রয়োজন'।

ভগৎ ঐতিহাসিক পত্র প্রবন্ধ শেষ করলেন এইভাবে: "উপরোক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই আমাদের দলের কাজ এগিয়ে যাওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ও সম্মেলনের মাধ্যমে দলের যুব কর্মীদের রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা উচিত। উন্নত চিন্তা চেতনায় কর্মীদের আলোকিত ও উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

"যুব কর্মীরা, আমি এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তার ভিত্তিতে যদি তোমরা কাজ শুরু কর তাহলে সর্বপ্রথম তোমাদের ধীর স্থির-মস্তিস্ক, শান্ত ও বিনয়ী হতে হবে। আমাদের বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়ণে কম করে বিশ বছরও অতিবাহিত হতে পারে। গান্ধীজীর এক বছরের মধ্যে কাল্পনিক স্বরাজ হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি ভুলে যাও। ঐ ভিত্তিতে যদি কেউ যৌবনদীপ্ত স্বপ্ন দেখে থাকে তা দশ বছরেও কাজ লাগবে না। আমি তোমাদের বলছি, আজ কেবলমাত্র আবেগ ও মৃত্যুর পথ নয়। আজ প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী লড়াই এবং তার জন্য দুঃখবরণ করা ও আত্মবলিদানের প্রস্তুতি নেওয়া। আমি বলব সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের ব্যক্তিবোধকে ধ্বংস কর। ব্যক্তিজীবনের সুখ ও আরামের

স্বপ্নকে ভুলে যাও। ব্যক্তিচরিত্র গড়ার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু কর। প্রতিটি ইঞ্চি ধরে ধরে তোমাদের কাজ এগোতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সাহস, অধ্যবসায় ও অত্যন্ত শক্তিশালী সংকল্পের দৃঢ়তা। কোন কষ্ট কিংবা কোন অসুবিধাই তোমাদের চলার পথে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করবে না। কোন ব্যর্থতা, কোন বিশ্বাসঘাতকতাই তোমাকে আহত করবে না। কোন তুচ্ছ ঘটনার প্রভাবে তুমি তোমার বিপ্লবী কর্মপথে টলবে না। দঃখ, কষ্ট, আত্মত্যাগের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তুমি একদিন বিজয় হাসিল করবে। তোমাদের প্রতিটি সাফল্য, প্রতিটি বিজয় আগামীদিনের বিপ্লবে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

"২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১"।

(সূত্র: 'Selected writings of Shaheed Bhagat Singh' ও 'শহীদ স্মৃতি', রচনা— শিব বর্মা)।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসি রদ করার প্রয়াস :

আদালতের হুকুম জারী হবার পরও সারা ভারত জুড়ে জননেতাসহ ব্যাপক অংশের জনসাধারণ ভগৎ সিং-এর ফাঁসির হুকুম রদ করার জন্য জোরদার প্রয়াস চালান।

প্রখ্যাত আইনজীবী ও জননেতারা বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে এই হুকুম রদ করার জন্য আবেদনপত্র পাঠান, যার স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ছিলেন লালা দুনিচাঁদ, ডাঃ গোপিচাঁদ প্রমুখ জননেতারা। আইনগত প্রশ্ন তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করা। ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ তারিখে, যথারীতি প্রিভি কাউন্সিল এঁদেব আবেদন নাকচ করে দেয়।

কিন্তু ভগৎ সিংদের প্রতি মানুষের গভীর আবেগ ও ভালবাসা এর দ্বারা দমিত হয না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ তারিখে প্রখ্যাত জননেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদ থেকে ভারতের বড়লাটের কাছে ভগৎ সিংদের পক্ষে প্রাণভিক্ষা চেযে আবেদন করেন। ফাঁসির আদেশ রদ করে প্রয়োজনে ভগৎ-দের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম দেবার প্রার্থনা জানান তিনি। সমস্ত দেশবাসীর হয়ে এই তিন মহান দেশপ্রেমিকের জীবন রক্ষার জন্য আকুল আবেদন জানান তিনি। কিন্তু তাও নাকচ হয়ে যায়।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ তারিখে বন্দীদের আইনজীবীদের পক্ষে জীবনলাল, বলজিত, এবং শ্যামলাল হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন জানান। আইনের এই ধারায় হাইকোর্ট বন্দীকে আদালতে হাজির করানো, শুনানী করানো এবং মুক্তি দেবার আদেশ জারী করতে পারে। এই আবেদনও যথারীতি ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ তারিখে, হাইকোর্টের দ্বারা নাকচ হয়ে যায়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ তারিখের একটি গণস্বাক্ষর সম্বলিত লাখো মানুষের দণ্ডাজ্ঞা রদের আবেদনও বড়লাট নাকচ করে দেন।

ঐতিহাসিক বন্দী-মুক্তির আপস রফা পর্বে গান্ধীজী ও লর্ড আরউইনের মধ্যে

আলোচনায় ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি রদ করার প্রসঙ্গ ওঠে। বড়লাট সাহেবের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফাঁসি রদ করার প্রস্তাবে রাজী হতে চান না।

জাতির জনক বা পিতা হিসাবে, মহাত্মা হিসেবে, যে গান্ধীজীকে ভারতের মানুষ আজ সবকিছু বিস্মৃত হয়ে পাদ্যঅর্ঘ্য নিবেদন করে, সেই গান্ধীজী ঐ ঐতিহাসিক চুক্তির রফা পর্বে ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর মত তিন বিপ্লবী তরুণের মুক্তি বা প্রাণরক্ষার কোন শর্ত ঐ আপস চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করতে রাজী হন না। অথচ, সমগ্র ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে সহিংস অথবা অহিংস যে কোন পন্থা-পদ্ধতিরই বিশ্বাসী হোক, দলমত নির্বিশেষে এইসব দেশপ্রেমিক মুক্তিসংগ্রামীদের সমানভাবে বিচার করে মুক্তি দেবার শর্তই ছিল তখন অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। আশ্চর্যের বিষয় গান্ধীজী এই যুক্তিপূর্ণ বিষয়টিকে নস্যাৎ করে বলেছেন, 'এই বন্দীমুক্তি চুক্তি সম্পাদনে আমি হয়ত ভগৎ সিংদের মুক্তির দাবীকে আবশ্যিক শর্ত করতে পারতাম। কিন্তু এটা করা হয়নি। আমার দল, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিও আমার বক্তব্যে রাজী হয়েছিল যাতে ওদেব মুক্তিকে চুক্তির শর্ত না করা হয়। আমি সেই কারণেই আলোচনার সময় বড়লাটের কাছে ওদের বিষযটা জানিয়েছি—কিন্তু ওদের মুক্তিকে বন্দীমুক্তির শর্ত করি নি।'

(গান্ধীজী লিখিত 'Young India', সূত্র: G. S. Deol Page-85)।

জাতিব জনক হিসেবে গান্ধীজী সকলের কাছে পূজ্য। মহান মানবপ্রেমী, মানবদরদী বলে তিনি দেশবাসীর কাছে বহুল প্রচাবিত। অথচ তিনিই আশ্চর্যজনকভাবে ভগৎ সিং-দের মুক্তির ব্যাপারে কেবল নিশ্চেষ্টই থাকেননি, আরও কিছুটা চেষ্টাবানও হয়েছিলেন ; যাতে ভগৎ সিং সহ এই তিন বিপ্লবী তরুণের ফাঁসি যথাসম্ভব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হয এবং আসন্ন মার্চ, ১৯৩১-এর করাচী কংগ্রেস অধিবেশনের আগেই যাতে ভগৎ সিংদের ফাঁসির পর্ব শেষ হযে যায।

গান্ধীজী ভাইসরয় তথা বড়লাট লর্ড আরউইনকে ভগৎদের মুক্তির বদলে তুরন্ত ফাঁসিতে চডাবার বিশেষ প্রার্থনা করলেন, 'If the boys should be hanged, they had better be hanged before the Congress (Karachi) Session, than after it.' ('The History of the Indian National Congress,' Vol- I, Bombay (1946), Page-442 by Dr. P. Sitaramayya। (সূত্র : G. S. Deol, 'Shaheed Bhagat Singh, A Biography', March 1969)।

এই ঘটনা ঘটল যখন দেশজুড়ে ভগৎ সিংদের মুক্তির জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলেই আন্দোলন, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কংগ্রেস নেতা Dr. P. Sitaramayya লিখেছেন: 'The Country was greatly agitated over the impending executions. Congressmen themselves were anxious to explore the good will prevalent all round for securing this Commutation.' ('সারা দেশ বিপুলভাবে আলোড়িত হচ্ছিল তাদের আসন্ন ফাঁসির

ঘটনায়। কংগ্রেসীরাও চিন্তিত ছিলেন এবং তাদের সদিচ্ছা কাজে লাগিয়ে এদের ফাঁসির আদেশ রদ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।' সূত্র : ঐ।)

লাহোরের 'The Tribune' পত্রিকা লিখল, 'এই তিন বিপ্লবীর মুক্তি ও দণ্ডাদেশ রদ করার জন্য সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। পাঞ্জাবসহ অন্যান্য প্রদেশেও হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ এইসব সমাবেশে যোগ দিচ্ছে।'

নেতাজী সুভাষও এই সময় (১৮/৩/৩১) বলেন, 'গান্ধী-আরউইন-সন্ধি-চুক্তি অত্যন্ত অসন্তোষজনক ও হতাশা ব্যঞ্জক।' (সূত্র : নির্বাচিত ভাষণ সংগ্রহ)

শেষ সাক্ষাৎকার :

এই সময়, ৩রা মার্চ ১৯৩১ তারিখে ভগৎ সিং-এর পরিবারের মানুষজনকে ভগৎ-এর সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করার অনুমতি দিল জেল কর্তৃপক্ষ।

ভগৎ-এর পিতা কিষেণ সিং-এর সঙ্গে এলেন তাঁর মা, ভাই কুলবীর ও কুলতার সিং, বোন বিবি অমরকাউর। জেলের গবাদের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তারা ভালবাসার পাত্রকে শেষবারের মত ছুঁলেন। বাবা, মা পরম স্নেহে ভগৎ-এর গায়ে মাথায় শেষ আদরের স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন।

অকম্পিত কণ্ঠে ভগৎ-এর মা বিদ্যাবতীজী বললেন, "বেটা ভগনওয়ালা, তুমি তোমার নীতিতে অবিচল থেকো। একদিন সকলকেই মরতে হবে। সারা দুনিয়া যে মৃত্যুকে মনে রাখবে সেটাই তো সর্বোৎকৃষ্ট মৃত্যু। আমি তোমার মা হিসেবে আজ খুশি যে আমার বেটা একটা মহৎ উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করছে। তোমার কাছে আমার শেষ ইচ্ছা যে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে দুনিয়াকে জাগিয়ে দাও। পরমানন্দে মৃত্যুবরণ কর বীর পুত্র। তোমার শান্ত নির্ভীক শরীরে ওজন বাড়ুক।"

মাতাকে আশ্বস্ত করলেন ভগৎ সিং, 'তুমি যা বলেছ তাই হবে মা।'

পিতা কিষেণ সিং : 'হয়ত আর একটা সাক্ষাৎ হতে পারে।'

ভগৎ সিং : 'আপনি কি কিছু শুনেছেন ?'

কিষেণ সিং : 'হ্যাঁ।'

ভগৎ সিং : 'কি শুনেছেন ?'

কিষেণ সিং : 'তোমার, সুখদেব ও রাজগুরুর দণ্ডাদেশ রদ হবে না। গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী কেবল কংগ্রেসী বন্দীরা মুক্তি পাবে। বিপ্লবী বন্দীরা ছাড়া পাবে না। বড়লাট ইচ্ছে করলে তার বিশেষ ক্ষমতাবলে ফাঁসির আদেশ রদ করতে পারতেন. কিন্তু তিনি সেটা প্রয়োগে রাজী হননি।'

ভগৎ সিং : 'আমি তো গোড়া থেকেই বলছি, আমাদের এই দণ্ডাদেশ কেউই রদ করতে পারবে না। ফাঁসুড়ের দড়ি আমাদের বরণ করে নেবেই। এ নতুন কিছু নয়।'

কিষেণ সিং : 'আমি আরো একটা কথা শুনছি ভগৎ।'

ভগৎ সিং : 'সেটা কি?'

কিষেণ সিং : 'মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যদি এই তিন তরুণকে ফাঁসিতে লটকাতেই হয় তাহলে যেন কংগ্রেসের আসন্ন করাচী অধিবেশনের আগেই সেটা সেরে ফেলা হয়।'

ভগৎ সিং : 'এই করাচী সেসন কবে থেকে শুরু হবে?'

কিষেণ সিং : 'এই মার্চ মাসের শেষদিকে।'

ভগৎ সিং : 'বাঃ। বাবা, তাহলে তো এটা বিরাট আনন্দের খবর! গরম পড়ে যাচ্ছে। এই সেলে গরমে ভাজা ভাজা হয়ে রোস্ট হয়ে মরার চেয়ে, ফাঁসিতে মরাই ভাল। গুরুজনেরা তো বলেন মৃত্যুর পর নাকি একটু ভাল জীবন পাওয়া যায়!'··· (সূত্র : G. S. Deol)।

ভাইকে লেখা ভগৎ সিং-এর শেষ পত্র :

দুই ভাই কুলবীর ও কুলতার সিংকে জেলের শেষ সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি ভগৎ-এর পক্ষ থেকে দুটি পৃথক পৃথক পত্র পাঠাবার তথ্যও মেলে। এই দুটি চিঠিই একই দিনের। ৩রা মার্চ, ১৯৩১ তারিখে লিখিত। চিঠির ভাষা, দুটিতেই উর্দুভাষা। চিঠি দুটি এইরকম :

"লাহোর সেন্ট্রাল জেল

"৩রা মার্চ, ১৯৩১।

"প্রিয় কুলবীর,

"তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। জেলের শেষ সাক্ষাৎকারের সময় তুমি বলেছিলে আগের চিঠির জবাবে তোমাকে কিছু লিখে জানাতে। তাই সামান্য কিছু লিখছি। দেখ ভাই, আমি তো কারোর জন্য কিছুই করে যেতে পারলাম না। তোমার জন্যও না। তোমরা কি করে বাঁচবে একথা যখন ভাবি তখন হৃদয় দুলে উঠে। কিন্তু ভাই সাহসী হও। পরম দুঃখ-কষ্টেও হতাশ হয়ো না। এইসব কথা ছাড়া আমি তোমাদের আর কি-ই বা শোনাতে পারি ভাই! আমি জানি ভাই, আজ তোমার হৃদয় আমার জন্য গভীর দুঃখ, সংশয়ের সাগরে তলিয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো অসহায়, কিই বা করতে পারি আজ? আমার অতি প্রিয়, অতি আদরের ভাই, মনে রেখো জীবন একটা কঠিন পরীক্ষাগার। এই দুনিয়াটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। আমাদের চারধারের মানুষজনও অত্যন্ত কৃতঘ্ন, বেইমান।

"একমাত্র সাহস অবলম্বন করেই এই দুনিয়ায় বাঁচতে পারবে।"

"প্রিয় কুলতার,

"জেলেব শেষ সাক্ষাৎকারে আজ তুমি কাঁদলে। আজ তোমার চোখে জল দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তোমার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ, বেদনাক্লিষ্ট। তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার প্রিয় ভাই, সাহসের সঙ্গে তোমার লেখাপড়া চালিয়ে যাও। নিজের প্রতি খেয়াল রেখো।

"ভেঙ্গে পোড় না। মন খারাপ কোর না। আর কি-ই বা আমি লিখতে পারি? আর কি-ই বা তোমাকে বলতে পারি? শোন, ছোট্ট একটা কবিতা বলি, শোন: তারা নিত্য নূতন অত্যাচারের কৌশল খুঁজতে ব্যস্ত / আমরাও দেখতে চাই তাদের দৌড় কতটা / এই দুনিয়ার ওপর রাগ করে কি হবে? / মুক্ত আকাশের বুকে অসন্তোষ ছুঁড়ে দিয়েই বা কি হবে? / আমাদের দুনিয়াতো আলাদা / সংগ্রাম চলুক/কমরেড, আমার শেষ নিঃশ্বাসের দিন আগত / ভোরের বাতির মত আমারও নিভে যাবার সময় এসেছে / হে আমার স্বদেশবাসী, তোমরা সুখে থাক / আমাদের দিন শেষ / বিদায় / সাহসে বুক বেঁধে চল / নমস্তে।

"তোমার ভাই
"ভগৎ সিং"

'ফাঁসি নয়, আমাদের গুলি করে মারা হোক'—ভগৎ সিং :

৫ই মার্চ ১৯৩১ তারিখে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির সরকারী ঘোষণা জারি হয়ে গেছে। গান্ধীজী এই চুক্তিতে রাজী হয়ে গেছেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন, গণ-আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিতে। ইংরেজ সরকার পক্ষান্তরে জেল থেকে সত্যাগ্রহীদের ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু চুক্তির শর্তে, ১০ নং ধারায় বলা হয়েছে, Ordinance No. 1 of 1931 relating to the Terrorist Movement does not come within the scope of the provision। ১৩নং ধারায় বলা হয়েছে, Violance- বা ঐ ধরনের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হবে না।

সব দিক থেকে সব পথ বন্ধ। ভগৎ সিংদের অবধারিত মৃত্যু কেউ রুখতে পারবে না। এমন সময় মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালালেন আদালতে ভগৎ সিংদের পরমর্শদাতা উকিল প্রাণনাথ মেহ্তা। জেলের সেলে তিন বন্দীকে একজোট করে পরামর্শের অজুহাতে প্রাণনাথ বললেন, "দেখ ভগৎ, তোমরা তিনজন কিন্তু এখন আর নিছক ব্যক্তি নও। দেশের সম্পদ। দেশের মানুষ চাইছে তাদের স্বার্থে তোমাদের জীবন রক্ষা করতে। আর এখন একটিই পথ খোলা আছে তা হল 'মার্সি পিটিসন্'।"

তিনজনের মুখই গম্ভীর হয়ে উঠল। সুখদেব ও রাজগুরু উত্তেজিত কণ্ঠে হয়ত কিছু কড়া কথা বলতে চাইছিল, ভগৎ তাকে সামলে দিয়ে প্রাণনাথকে বললেন, "কি ধরনের মার্সি বা দয়া ভিক্ষা করতে বলছ বন্ধু?"

প্রাণনাথ বললেন, "আমাকে তোমরা ভুল বুঝ না। আমি এমন কিছু কাজ করব না যাতে তোমাদের বীরত্বে কালিমা লাগে। তোমরা রাজী হলে আজ রাতে আমাদের আইনজীবীদের এক কমিটি মিটিং থেকে এ ব্যাপারে একটা খসড়া বানান হবে। সেটা আমি সকালে তোমাদের কাছে নিয়ে আসব।" দিনটা ছিল ১৯শে মার্চ ১৯৩১।

ভগৎ হেসে বললেন, "কিন্তু এই খসড়া তো আমরাও বানাতে পারি। ঠিক আছে

আমাদের মামলায় তোমার সুনাম সুখ্যাতি বাড়ুক! কিন্তু বন্ধুদের এই উপকার যেন ভুল না!"

রাত জেগে পাঁচজন মিলে অতি যত্নে 'মার্সি পিটিশনের' খসড়া বানিয়ে নিয়ে এলেন প্রাণনাথ মেহতা। পরদিন ২০শে মার্চ ১৯৩১ তারিখে।

প্রাণনাথের তৈরি খসড়া পড়ে হো হো করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুরা। ভগৎ বললেন, "বন্ধু, এই খসড়া তোমার কাছেই রেখে দাও। আমরা তিনজন ইতিমধ্যেই দয়াভিক্ষার প্রার্থনাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। আসলে তুমি কাল চলে যাবার পর আমরা তিনজন আলোচনা করে ভেবে দেখলাম, এই 'মার্সি পিটিশনটা' যখন এতই জরুরী তখন আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয়। এই নাও, দেখ। চিঠিটা পাঞ্জাবের গভর্নরের কাছে ইতিমধ্যেই পাঠান হয়েছে।" (সূত্র: বীরেন্দ্র সিঁধু, 'ভগৎ সিং')।

ভগৎ-এর লেখা এই পত্রে, তিনজনই একসঙ্গে সই করে সর্বশেষে দাবী জানিয়েছেন, "আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের একথা বলার সুযোগ দেবেন যে, আপনারা আমাদের হত্যা করতে কৃতসংকল্প এবং সেটা যেভাবেই হোক আপনারা করবেনই। আপনাদের হাতে ক্ষমতা আছে। আর আজকের দুনিয়ায় ক্ষমতা যার হাতে থাকে সেই ন্যায় অন্যায়ের বিচারক। আমরা জানি আপনাদের নীতি হল, 'জোর যার, মুলুক তার।' আমাদের বিরুদ্ধে যে আদালতী কর্মকাণ্ডের প্রহসন হয়েছিল, সেটা এই জোর-জুলুমের তথাকথিত ন্যায় বিচারেরই উদাহরণ।

"আমরা যা বলতে চাইছি তা হল, আপনাদেরই আদালতের রায়ে বলা হয়েছে যে, আমরা আপনাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। সেক্ষেত্রে আমরা তাহলে নিশ্চিতভাবে যুদ্ধবন্দী। আমরা তাই আপনাদের কাছে যুদ্ধবন্দীসুলভ আচরণই চাই। অর্থাৎ, আমরা চাই ফাঁসির পরিবর্তে যুদ্ধবন্দীদের মত আমাদের গুলি করে মারা হোক। আদালত যে আদেশ দিয়েছে তাকে তার মর্মার্থ অনুযায়ী কার্যকরী করার দায়িত্ব আপনার। আপনি সে দায়িত্ব রক্ষার প্রামাণ দিন।

"আমরা অনুরোধ করছি এবং আশা রাখছি আপনি সেনাবাহিনীকে আদেশ দেবেন যাতে তারা যুদ্ধবন্দীর মত আমাদের গুলি করে হত্যা করে।"

"নিবেদক

"ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু"।

বিশ্ব বিপ্লবের ইতিহাসে এই ধরনের দয়া-প্রার্থনা বা 'মার্সি পিটিশনের' নজির নেই। সেই অর্থে ভগৎ সিং-এর তৈরি এই পিটিশন এক অতুলনীয় ঐতিহাসিক দলিল। এর কয়েকটি নির্বাচিত অংশ এইরকম:

"আমরা যদিও যুদ্ধের অবস্থার কথা বলছি, তাহলেও বাস্তবে তেমন কোন সর্বাত্মক প্রত্যক্ষ যুদ্ধ এখনো শুরু হয়নি।...তা সত্ত্বেও যুক্তির খাতিরে ধরা যাক যুদ্ধাবস্থা সত্যিই বিরাজ করছে। আর এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে। যতক্ষণ একদল পরগাছা শোষক এদেশের

মেহনতি শ্রমিক সাধারণ মানুষকে শোষণ করবে এবং এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। এই শোষকের দলের কোন জাত বিচার নেই। এরা বৃটিশ পুঁজিপতি অথবা বৃটিশ ও তার দালাল ভারতীয় পুঁজিপতির মিলিত কোম্পানি অথবা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পুঁজিপতি হতে পারে।...কোন্ দেশ, কোন্ জাতির এতে পুঁজিপতির শোষণের চরিত্র পাল্টায় না।

"আমরা জানি, আপনার সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং কিছুটা সফলও হয়েছে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রভাবশালী নেতাদের ক্রয় করার এবং তার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসকে নৈতিক অধঃপতনে ঠেলে দিতে। কিন্তু জেনে রাখুন এতে যুদ্ধ পরিস্থিতি পাল্টাবে না। যুদ্ধ চলতেই থাকবে।

"আমরা জানি, সাময়িকভাবে ভারতের শ্রমজীবী মানুষের অগ্রগামী অংশের দল, বিপ্লবী দল, এই যুদ্ধে কিছুটা কোণঠাসা হয়েছে। কিন্তু জেনে রাখুন, এতেও পরিস্থিতি পাল্টাবে না। যুদ্ধ চলতেই থাকবে।

"সাম্প্রতিক আপস চুক্তিতে আমরা দেখলাম এক সময় যাদের ভালবাসা, সহানুভূতি পেয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমরা ঋণী ছিলাম, তারা কি ধরনের অনুভূতিহীন, বিচার বিবেচনাহীন আপসরফার পথে হাঁটলেন। যে চুক্তিতে তারা সম্মতি দিলেন তাতে দেশের মুক্তিযজ্ঞে এমনকি যেসব মহিলারাও যোগ দিয়ে অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করছেন, একমাত্র কোন এক সময় তারা সহিংস আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, এই অপরাধে তাদেরও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হল না। আমরা সব কিছুই লক্ষ্য করলাম। কিন্তু জেনে রাখুন, এতেও যুদ্ধ বন্ধ হবে না। যুদ্ধ চলতেই থাকবে।

"এখন বিচার আপনাদের। বিভিন্ন সময়ে এই যুদ্ধ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে। যুদ্ধ চলবে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। কখনো সম্পূর্ণ বিক্ষোভের স্তরে, কখনো বা মরণপণ লড়াই-এর স্তরে। কোন্ পথে এই যুদ্ধ এগোবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।...নতুন নতুন উদ্যম, সাহস ও সঙ্কল্প নিয়ে যুদ্ধ, লড়াই চলতেই থাকবে। যতদিন না বর্তমান সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে।...

"পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দিন ফুরিয়ে আসছে। এই যুদ্ধ আমরা ডেকে আনিনি। সুতরাং ভাববেন না আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। এই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সামাজিক পরিমণ্ডল, পরিবেশেরই ফলশ্রুতি এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ। ঐতিহাসিক কালের চক্রে অতুলনীয় শহীদের মৃত্যুবরণের স্বাক্ষর রেখেছেন বিপ্লবী যতীন দাস। হৃদয় বিদারক মহান আত্মদানের নজির রেখেছেন বিপ্লবী ভগবতীচরণ ভোরা। বীর বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের মহান গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের ঔজ্জ্বল্য সেই কাল চক্রকে আরও সৌন্দর্যভূষিত করেছে। আমাদের এই তিনজনের অতি সামান্য আত্মদান এই কালচক্রের সঙ্গে কেবলমাত্র সংযোজিত হবে।" (সূত্র: "Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh', by Shiv Verma)।

ভগৎ সিং-এর জীবনের শেষ চিঠি :

লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং-এর নির্জন কনডেমড্ সেলের কাছে ১৪নং ওয়ার্ডে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার (২য়) সাজাপ্রাপ্ত যেসব সাথী বন্দীরা ছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত গোপনে ভগৎ সিং-এর কাছে এক টুকরো প্রশ্ন লেখা কাগজ পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল, 'সরদার, তুমি যদি এখনোও ফাঁসি থেকে বাঁচতে চাও তো জানাও। এইটুকু সময়ের মধ্যে যদি কিছু সম্ভব হয় তাহলে করা হবে।' দিনটি ছিল ২২শে মার্চ ১৯৩১।

উর্দুভাষায় লেখা চিঠিতে ভগৎ তার জবাব দিলেন ঐ দিনই। চিঠিটি এইরকম :

"সাথী,

"প্রাকৃতিক নিয়মে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আমার মধ্যেও থাকা উচিৎ। আমি এই কথা গোপন করতে চাই না। কিন্তু আমার বেঁচে থাকাটা শর্তাধীন। আমি কারারুদ্ধ বন্দী হিসেবে অথবা জেলের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে বেঁচে থাকতে চাই না। আমার নাম এখন ভারতীয় ক্রান্তিকারী বা বিপ্লবী দলের মধ্যবিন্দু বা প্রতীক হয়ে গেছে। আর বিপ্লবী দলের আদর্শ ও বলিদান আমাকে বেশ উঁচু জায়গায় তুলে দিয়েছে। এতটাই উঁচু জায়গায় আমাকে তুলে দেওয়া হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, বেঁচে থাকলে হর্‌গিজ আমি এত উঁচুতে উঠতাম না।

"আমার চরিত্রের দুর্বলতা এখনোও লোকের সামনে প্রকাশ পায়নি। ফাঁসি থেকে বেঁচে গেলে কিন্তু এইসব দুর্বলতা জাহির হয়ে যাবে। তখন হয়ত বিপ্লবের প্রতীক মাটিতে গড়াগড়ি দেবে অথবা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে! কিন্তু হাসতে হাসতে বীর পদক্ষেপে আমি যদি ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে যাই তাহলে সেই ছবি হিন্দুস্থানের মায়েদের কাছে তাদের শিশুদের উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করবে। স্বাধীনতার যুদ্ধে সেই দৃশ্য বলিদানের সংখ্যাকে এতই বাড়িয়ে তুলবে যে, সাম্রাজ্যবাদ সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও বিপ্লবের অগ্রগতি রুখতে পারবে না।

"হ্যাঁ, একটা চিন্তা আমাকে এখনোও বিদ্রূপ করে এবং তীক্ষ্ণভাবে বেঁধে। তা হল, আমার দেশ ও মানবতার জন্য আমার অন্তরে যে গভীর দুঃখ, ক্লেশ জমে আছে, তাকে দূর করার কাজে আমি হাজার ভাগের সামান্য একভাগ কাজও করে যেতে পারলাম না। যদি আমি বেঁচে থাকতাম, তাহলে হয়ত এই কাজটা সম্পূর্ণ করার একটা সুযোগ পেতাম। আর আমার অন্তরের জমে থাকা দুঃখ, অনুতাপের কিছুটা সুরাহা করতে পারতাম।

"কেবল এইটুকু ইচ্ছা ছাড়া, ফাঁসির দড়ি থেকে গলা বাঁচাবার জন্য অন্য কোন আকর্ষণ বা লোভই আমি অনুভব করিনি। আরে ভাই, আমার থেকে বেশি ভাগ্যবান আর কেউ আছে? আজকাল তো আমার নিজের সম্পর্কে বেশ গর্ব বোধ হয় ভাই! এখন তো বেশ চাঞ্চল্যের সঙ্গে জীবনের শেষ পরীক্ষার প্রতীক্ষায় আছি। প্রার্থনা করি সময়টা নিকটবর্তী হোক।

"আপনাদের সাথী
"ভগৎ সিং"।

(সূত্র : 'পত্র আউর দস্তাবেজ'— বীরেন্দ্র সিঁধু সম্পাদিত)

ফাঁসির মঞ্চে ভগৎ সিং :

গান্ধীজীর চাপে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল, ২৩ শে মার্চ ১৯৩১ তারিখেই ভগৎ

সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসিতে চড়ান হবে। এদের ফাঁসিতে হত্যা পর্ব শেষ না হলে ২৬শে মার্চ ১৯৩১ তারিখের আসন্ন করাচী অধিবেশনে গান্ধীজীর পক্ষে লর্ড আরউইনের সঙ্গে চুক্তিটিকে সারা ভারত কংগ্রেস সম্মেলন থেকে অনুমোদন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারত। ফলে, পাঞ্জাব সরকার টেলিগ্রামে বিশেষ খবর দিল কেন্দ্রীয় সরকারকে : 'ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে ২৩শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় ফাঁসি দেওয়া হবে। এ খবর ঐদিন গোপন রাখা হবে। পরদিন ২৪শে মার্চ সকালে এটা প্রকাশ করা হবে।'

২৩শে মার্চ ১৯৩১ তারিখের সকালে, জেলে বসে 'The Tribune' পত্রিকা পড়ছিলেন ভগৎ সিং। হঠাৎ 'পুস্তক-পরিচয়' কলমে চোখ গেল। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান লেনিনের 'জীবন চরিত'-এর এক আলোচনা বা বুক রিভিউ ছাপা হয়েছে ঐ কলমে। ভগৎ সিং-এর মনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হল, লেনিনের জীবনী গ্রন্থটি তাঁকে পড়তেই হবে। জেলের ওয়ার্ডারের হাত দিয়ে তাঁর আইনি পরামর্শদাতা বন্ধু প্রাণনাথ মেহ্তার কাছে গোপন বার্তা পাঠালেন, "অন্তিম আইনি শলা-পরামর্শের অজুহাত দেখিয়ে এক্ষুণি এস। আসবার সময় লেনিনের 'জীবন-চরিত' গ্রন্থটি আনতে ভুলবে না।"

এদিকে জেলের ভেতরে ভগৎ সিংদের ফাঁসিতে চড়াবার গোপন নির্দেশ-ভিত্তিক প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। এই সময় প্রাণনাথ মেহ্তা ভগৎ সিং-এর কালকুঠুরিতে এসে পৌঁছলেন। ভগৎ-এর অন্তিম সাক্ষাৎকার সম্পর্কে প্রাণনাথের লেখা থেকে কিছু জানা যায়। প্রাণনাথ লিখেছেন এইভাবে :

"ঐ দিন আমি প্রায় এক ঘণ্টা ভগৎ সিং-এর সেলে তাঁর পাশেই ছিলাম। এর আগেও আমি ভগৎ-এর সঙ্গে ঐ সেলে অনেক সময় কাটিয়েছি। ভগৎ-এর অনশন ধর্মঘট, পুলিশের সঙ্গে আদালতের ভেতর সাহসিক সংঘর্ষ, এসব ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু আমি কখনোও ভাবতেই পারিনি ভগৎ সিং এমন একজন উচ্চস্তরের সাহসী ও মহান ব্যক্তি। আমি জানতাম এবং ভগৎও জানতেন তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত অতি নিকটে। ফাঁসির নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ঘড়ি যেন ছুটে চলেছিল। কিন্তু আশ্চর্য! এরই মধ্যে ভগৎকে আমি অতি প্রসন্ন চিত্তে নির্লিপ্তভাবে বই পড়ে যেতে দেখলাম।"

"মনে আছে, ভগৎ-এর সেলে ঢুকতেই তিনি প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বইটা এনেছ?' আমি তাঁর হাতে 'বিপ্লবী লেনিন' বইটা তুলে দিই। বইটা হাতে নিয়ে তাঁর চোখমুখ আনন্দে, প্রসন্নতায় ভরে গেল।

"আমি বললাম, 'ভগৎ, দেশের জন্য তুমি শেষ কিছু বলে যাও।' বই থেকে মুখ না তুলে সে জলদি জবাব দিল, 'সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ। ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ'।

"আমি তাঁর মানসিক অবস্থা আঁচ করার জন্য জানতে চাইলাম, 'আজ তোমার কি মনে হচ্ছে?' ভগৎ বই থেকে মুখ না তুলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'আমি সম্পূর্ণ খুশিতে আছি।'

"আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'তোমার অন্তিম ইচ্ছা কি?' এবার ভগৎ মজা করে হেসে বলল, 'ঐ সবাই যেমন চায়, ফের জন্ম, ফের মাতৃভূমির সেবা!'

"আমি সর্বক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ভগৎ সিং-এর দিকে। একি কোন মানুষ? না দেবতা?"

এরই মধ্যে গতদিনে যে সাথী বন্ধুরা গোপন চিঠি পাঠিয়েছিল, তাদের দূতও দেখা

করতে এল এক চিরকূট নিয়ে, যাতে লেখা, 'বাইরে হাজারো মানুষের জমায়েত, প্রয়োজনে তারা জেল ভেঙ্গে তোমাকে মুক্ত করতে ঢুকবে' ইত্যাদি। ভগৎ-এর নেতিবাচক জবাব শুনে, ফিরে যাচ্ছিল সেই দূত। প্রাণনাথকে দিয়ে ডাকালেন ভগৎ। 'দোস্ত, ওঁকে একবার আসতে বল না।' সাথীদের দূত এল।

ভগৎ এবার স্মিতহাস্যে তাকে বললেন, "ভাই কথাবার্তা তো অনেক হোল। শুভদিনে এবার তাহলে রসগোল্লা খাইয়ে দাও!"

সত্যিই কিছুক্ষণ বাদে ভগৎ-এর জন্য জেলের সেলে রসগোল্লা এল। জীবনের অন্তিম ভোজনে, পরম তৃপ্তিতে, ভগৎ তাঁর প্রিয় খাদ্য রসগোল্লা খেলেন।

এই সময় বাইরে থাকা অন্যান্য কয়েদীদের ওপর এ্যাসিস্টান্ট জেলারের হুকুম হল, 'যার যার ঘরে চলে যাও'। দুপুর পার হয়নি তখনোও। সাধারণত সন্ধ্যার সময় বন্দীরা ঘবে ফেরে। কিন্তু সব নিয়ম বানচাল করে, তাদের দিনের আলোতেই বন্দীশালায বন্ধ করা হল। কারণ, চরম অনিযম ও বে-আইনিভাবে সমস্ত প্রথা-পদ্ধতির অবমাননা কবে, জেল কর্তৃপক্ষ গোপনে সন্ধ্যার আঁধারে চুপিচুপি বীর বিপ্লবীদেব ফাঁসিব মঞ্চে তুলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছে।

লাহোর সেন্ট্রাল জেলের চিফ ওযার্ডার চতর সিং-কে দুপুর তিনটে নাগাদ জেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হল সব ব্যবস্থা পুবো করার জন্য। চতর সিং মধুর স্বভাবের পরম ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি। সকাল-সন্ধ্যা পাঠ, কীর্তন ইত্যাদি করেন। অন্তিম সময়ে ভগৎ-এর ওপব করুণা বশত চতব সিং এসে বললেন, 'বেটা, অব তো আখিরী ওয়াক্ত আ পহুঁচা হ্যায। ম্যায় তুমহাবে বাপকে বরাবর হুঁ। মেরে এক বাত মান লো।'

ভগৎ হেসে বললেন, 'বেশ তো বলুন, কি হুকুম?'

চতর সিং আন্তরিকতাব সঙ্গে বললেন, 'আমার কেবল একটাই আবেদন। এই অন্তিম সমযে 'বাহে গুরু' কা নাম লে লো আউর গুরুবাণী কা পাঠ কর লো। এই লো গুটকা (ছোট আকারের ধর্মগ্রন্থ) তুমহারে লিযে লায়া হুঁ।'

চতর সিং-এর হুকুম শুনে ভগৎ জোরসে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "কিছুদিন আগে যদি আপনি এই হুকুম করতেন তাহলে আপনার ইচ্ছা এবং হুকুম দুটিই আমি পূরণ করতে পারতাম। এখন অন্তিম সময়ে যদি পরমাত্মার স্মরণ করি তাহলে নির্ঘাৎ তিনি বলবেন, 'ব্যাটা বুজদিল, ভীরু! সারা জীবন আমাকে স্মরণ করল না, এখন ফাঁসির দড়ি দেখে ভয় পেয়ে আমাকে ডাকছে!' এর চাইতে এটাই কি ভাল হবে না, যেভাবে আমি আগের জীবন কাটিয়েছি, সেইভাবেই দুনিযা থেকে চলে যাব। একথা সত্যি যে কিছু লোক আমাকে নাস্তিক বলে দোষী বা অপরাধী সাব্যস্ত করেছে কিন্তু আমাকে ভীরু, বেইমান এইসব তো কেউ বলতে পারবে না। একথা তো কেউ বলতে পারবে না যে অন্তিম সময়ে মৃত্যুর সামনে তার পা কাঁপতে থাকে।"

চতর সিং-এর ইচ্ছা, হুকুম কোনটাই কাজে এল না। সে চলে গেল। ভগৎ আপনমনে লেনিনের জীবনী গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। এই সময় সেলের তালা খুলল। জেলের কর্তা বললেন, 'সরদারজী, ফাঁসী লাগানে কা হুকুম আ গয়া হ্যায়। আপ তৈয়ার হো যাইয়ে।'

ভগৎ সিং-এর ডান হাতে বইটা ছিল। বাঁ হাত বাড়িয়ে তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান। একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার চলছে।' থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন জেলার অফিসার। কিছুটা পড়বার পর, বইটা রেখে, ভগৎ সিং তেজোদ্দীপ্ত

ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চলুন।' একবার, এতদিনের আবাসস্থল কালকুঠুরীকে এক নজরে দেখে নিয়ে, বাইরে পা রাখলেন ভগৎ। ইতিমধ্যে অপর সেল থেকে সুখদেব ও রাজগুরুও বাইরে এসে গেছেন। পরম আনন্দে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

এবার ফাঁসির মঞ্চে ওঠার জন্য কালো পোশাক পরাবার ব্যবস্থা হল। ভগৎ সিং বললেন, 'আমরা খুনে, ডাকাত বা সাধারণ অপরাধী নই যে ঐ কালো পোশাক পরতে হবে। আমরা তোমাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যুদ্ধবন্দী, রাজনৈতিক বন্দী। আমরা ঐ পোশাক পরব না।' প্রতিবাদের খবর পেয়ে জেলের দারোগা আকবর খান ছুটে এলেন। বিনীত ভাবে তিনি অনুরোধ করলেন, 'এটা নেহাৎই একটা জেলের প্রথা। এর এত মূল্য দেবেন না আপনারা। সামান্য ব্যাপার নিয়ে অশান্তি, শেষ সময়ে আপনাদের চরিত্রের উপযুক্তও হবে না। দয়া করে সহযোগিতা করুন।' শেষে রাজী হলেন ওঁরা।

একই কাণ্ড হল হাতকড়ি পরান নিয়ে। সুখদেব প্রবল আপত্তি করল হাতকড়ি পরতে। বেধে গেল ঝগড়া। বৃদ্ধ ওয়ার্ডার চতর সিং ভগৎকে অনুরোধ করল, 'হম পর হী রহম (দয়া) কিজিয়ে। হতকড়ি লগানে কা হুক্‌ম মিলা হ্যায়। আউর এ এক কায়দা হ্যায়, মান জাইয়ে বাবা!' চতর সিং-এর সবিনয় অনুরোধও রক্ষা করলেন তাঁরা।

উচ্চস্বরে স্লোগান তুললেন তিনজন। 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ', 'Down, down Union Jack', 'Up Up National flag', 'Down With British Imperialism'। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জেলের সমস্ত রাজবন্দীরাও স্লোগান দিতে থাকলেন। সারা জেল বন্দীদের উচ্চকণ্ঠের স্লোগানে গম্‌গম্‌ করে উঠল।

পণ্ডিত কে. সন্তানমের বাংলো জেলের কাছেই। তিনি জেলের ভেতর এই শোরগোল শুনে, ভগৎ সিং-এর পিতা কিষেণ সিংকে টেলিফোনে খবর দিলেন।

এদিকে স্লোগান বন্ধ হতেই, ভগৎ, সুখদেব ও রাজগুরু তিনজনেই কণ্ঠ মিলিয়ে গান ধরলেন,

'দিল্‌ সে নিকলেগী ন মর কর ভী বতন (মাতৃভূমি) কি উলফত্‌ (ভালবাসা),
মেরী মিট্টী (কবর) সে ভী খুশ্‌বু-এ-বতন আয়েগী।'

সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিট থেকে জেলের কর্তা মিঃ চোপরা, জেল সুপার, ডেপুটি কমিশনার লাহোর, আই. জি. পুলিশ, আই. জি. জেল, ফাঁসির মঞ্চে অপেক্ষা করছিলেন। ওদিকে জেলের ফটকের মধ্যে সাথী রাজবন্দীরাও অধীর উত্তেজনায় শেষ মুহূর্তের ধ্বনি শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তিন বন্দীকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হল। স্থির, অচঞ্চল, অকুতোভয়ের প্রতিমূর্তি তিন বিপ্লবী। ভগৎ মৃদু হেসে অফিসারদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনারা সত্যি সত্যিই বড় ভাগ্যবান। কারণ, আপনারা আজ এই দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাচ্ছেন যে, ভারতীয় বিপ্লবীরা তাদের মহান আদর্শের জন্য কিভাবে প্রসন্নচিত্তে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।' দুঃখ ও লজ্জায় অফিসারদের মাথা নীচু হল।

ভগৎ, সুখদেব ও রাজগুরুর গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। প্রস্তুতিপর্ব শেষ। এবার ঘাতকের হাত পড়বে লোহার হাতলের লিভারে। খুলে যাবে পায়ের তলার কাঠের পাদানি। ঝুলে পড়বে তিনটি তাজা প্রাণ মৃত্যুর কোলে।

ভগৎ সিং হঠাৎ জেল সুপারকে হাত নেড়ে অনুরোধ করলেন, 'দুমিনিট সময় দিন।

যাতে আমরা জীবনের শেষ মুহূর্তে মনের পূর্ণ প্রশান্তির জন্য প্রাণভরে স্লোগান দিতে পারি। আশা করি মৃত্যুপথযাত্রীদের এইটুকু অনুরোধ আপনি রাখবেন।'

জেল সুপার মৌন থেকে স্বীকৃতি প্রকাশ করলেন। তিন বিপ্লবী মনের পূর্ণ সাধ মিটিয়ে সর্বোচ্চ কণ্ঠে, সর্বশক্তি নিঃশেষ করে স্লোগান দিলেন, 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'সাম্রাজ্যবাদ কা নাশ হো,' 'Down with Imperialism'। আকাশ-বাতাস মুখরিত হল সেই বিষন্ন সন্ধ্যায়। ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর অন্তিম আহ্বান-ধ্বনি ছড়িয়ে গেল দেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তে।

ইতিমধ্যে, পায়ের তলার অবলম্বন কাঠের খণ্ডটি সরে গেল। তিন তরতাজা যুবক মুহূর্তে পৌঁছে গেলেন শহীদত্বে। অমর শহীদ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু।

জেলের সাথী ধর্মপাল বলেছেন, "জেলের ঘড়ির হিসেবে ভগৎ সিংদের ফাঁসি হয় ঠিক সন্ধ্যা ৭-২১ মিনিটে। ফাঁসির তক্তা সরে যাবার শব্দ শুনে, সারা জেল জুড়ে আওয়াজ ওঠে, 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ', 'সুখদেব জিন্দাবাদ', 'রাজগুরু জিন্দাবাদ'। একটানা আধঘন্টা ধরে চলে সারা লাহোর জেল জুড়ে এই জয়ধ্বনি।

জেল সুপার হাইকোর্টের ওয়ারেন্ট অনুযায়ী ফাঁসির কাজ সমাপ্ত করে তার রিপোর্ট পাঠালেন :

'I hereby certify that the sentence of death passed on Bhagat Singh has been duly executed, and that the said Bhagat Singh was accordingly hanged by the neck till he was dead, at Lahore Central Jail on Monday, the 23rd day of March, 1931 at 7 pm. That the body remained suspended for a full hour, and was not taken down until life was ascertained by a medical officer to be extinct; and that no accident, error or other misadventure occured.'

এবার জেল কর্তৃপক্ষ চোরের মত ঐ রাত্রেই ঐ তিন শহীদের মরদেহ নিয়ে গেলো ফিরোজপুরের কাছে, সুতলেজ (শতদ্রু) নদীর কিনারে। কোনরকমে দাহকার্য শেষ করে দেহগুলিকে প্রায় আধপোড়া অবস্থায় নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে খুনীর দল পালিয়ে এলো।

পরদিন ২৪শে মার্চ ১৯৩১ তারিখের সকালে লাহোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামে প্রকাশ করা হল এক বিজ্ঞপ্তি। শহরের দেওয়ালে সেঁটে দিল এই খবর :

'The public are hereby informed that the dead bodies of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdeb, who were hanged yesterday evening (March, 23) were taken out of the Jail to the bank of the Sutlej where they were cremated according to Sikh and Hindu rites and their remains were also thrown into the water." (সূত্র : G.S. Deol)।

ফাঁসির দিনের হিসেবে, ভগৎ সিং-এর পৃথিবীর বুকে সশরীরে বেঁচে থাকার সময়টা মাত্র ২৩ বছর ৫ মাস ২৭ দিন। কিন্তু ভগৎ সিং অনন্য চরিত্রের ভগৎ সিং বলেই তাঁর জীবিত কালের বোধ হয় আলাদা কোন অঙ্কের হিসেব হয় না। কারণ, ভগৎ সিং সমস্ত কালেই বেঁচে থাকবেন। কারণ ভগৎ সিং অমর। তাঁর মৃত্যু নেই। হাজারো শহীদের উজ্জ্বল নক্ষত্রলোকে ভগৎ সিং শহীদ-ই-আজম। শহীদ সম্রাট।

শহীদ স্মারক হিসেবে সুতলেজ (শতদ্রু) নদীর কিনারের স্থানটি যেখানে ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে দাহ করা হয়, পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে

১৯৫০ সালের চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জায়গাটা পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের ৬ মাইল দূরে।

এই পুণ্য তীর্থে আজও প্রতি বছর ২৩শে মার্চ শহীদ দিবসে 'শহীদী মেলা' হয়। সাড়ম্বর 'শহীদ দিবসে' দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ, সমস্ত রাজনৈতিক দল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১০

শেষের কথা

ভগৎ সিং ও তাঁর সাথী সুখদেব[৩০], রাজগুরুর[৩১] ফাঁসি ও সুতলেজ (শতদ্রু) নদীর ধারে অতি গোপনে সরকারী অন্ত্যেষ্টির খবর পেয়ে পরদিন ২৪শে মার্চ ১৯৩১ তারিখে ভগৎ সিং-এর বোন অমর কাউর, বন্ধু জয়দেব গুপ্তাসহ হাজারে হাজারে মানুষ পাগলের মত ছোটে নদীর ধারে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে সেই অগুনতি মানুষের চোখে দুঃখ বেদনার অশ্রু ছাপিয়ে ওঠে। অধীর আগ্রহে তারা চিতা থেকে সংগ্রহ করে শহীদের স্মৃতি। পরম যত্নে অতি পুণ্য বস্তুর মত তারা সঞ্চয় করে সেই দেহাবশেষ।

দেশের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছেপে বেরোয় ভগৎ সিংদের শহীদের মৃত্যুবরণের খবর। জাতীয় বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সারা দেশের কোণায় কোণায় অনুষ্ঠিত হয় জনসভা আর শোকসভা। সরকারী প্রতিহিংসামূলক হত্যা বলে নিন্দিত হয় ভগৎ সিংদের এই অমর শহীদের মৃত্যুবরণের ঘটনা। তীব্র নিন্দা ও ক্রোধ ব্যক্ত হয় হাজারো লাখো মানুষের কণ্ঠে গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে। প্রবলভাবে সমালোচিত হয় এই চুক্তি।

লাহোর থেকে প্রকাশিত 'The Tribune' পত্রিকার ২৬শে মার্চ ১৯৩১ তারিখের সংখ্যায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি লেখে :

'ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির আদেশ রদ না করে তাদের যেভাবে ফাঁসি দেওয়া হল, এই ভুলের গভীরতা, বিস্তৃতি ও আয়তনের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের বৃটিশ সরকারের আর অন্য কোন ভুলেরই তুলনা করা চলে না।'

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'The Daily Worker' পত্রিকা তার ২৫শে মার্চ ১৯৩১ তারিখের সংখ্যায় বৃটিশ লেবার পার্টি সরকারের এই কাজ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে লিখল :

'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার স্বার্থেই ভারতের লাহোর জেলে তিন বন্দী ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে বৃটিশ লেবার পার্টির সরকার হত্যা করল। ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে বৃটিশ লেবার সরকারের এটি একটি ঘৃণ্য রক্তলোলুপ কাজ। লেবার সরকারের হুকুমে তাদেরই তৈরি উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক শাসন-কাঠামোর মধ্যে, তিনজন ভারতীয় বিপ্লবীকে যেভাবে হত্যা করা হল, তার দ্বারা বোঝা যায় ম্যাকডোনাল্ড রাজত্ব তাদের বৃটিশ ঔপনিবেশিকতাকে বাঁচাতে যে কোন স্তরে নামতে প্রস্তুত।'

এই সময় বঙ্গপ্রদেশে হিন্দীভাষায় লেখা 'ভগৎ সিং কো বীরত্ব' নামে একটি বই প্রকাশিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সরকার আইনের থাবা বসিয়ে সেটিকে বাজেয়াপ্ত করল। পাঞ্জাবে উর্দুভাষায় লেখা 'সর্দার ভগৎ সিং' নামে একটি ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকার বহুল প্রচার হল। এটিকেও পাঞ্জাব সরকার আইনের বলে নিষিদ্ধ করে দিল।

কলকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশন শহীদ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুলতুবী ঘোষণা করে দেওয়া হল। দিল্লীর আইনসভায় জাতীয় দলের নেতারা এই ঘটনার প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। এমনকি জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনেও এই ঘটনার ঢেউ আছড়ে পড়ল প্রবলবেগে। গান্ধীজীও তাকে সামলাতে পারলেন না। চাপে পড়ে তাঁকে ঐ অধিবেশন উপলক্ষে সমস্ত রকম প্রকাশ্য কর্মসূচী যেমন সভা, শোভাযাত্রা স্থগিত ঘোষণা করতে হল। গান্ধীজীকে তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে উচ্চারিত এইসব বিপ্লবীদের সম্পর্কিত বিরুদ্ধ মনোভাব অস্বস্তিতে ফেলল। এমনকি তাঁকে 'জাতীয়তা-বিরোধী' বলে নিন্দিত হবার অস্বস্তিকর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হল।

করাচী কংগ্রেসে দাবী উঠল ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার। দলের দক্ষিণপন্থী নেতাদের সঙ্গে বামপন্থীদের বেঁধে গেল তুমুল 'শব্দ-নির্বাচনী' যুদ্ধ। কি ভাষায় এই প্রস্তাব নেওয়া হবে। কতটা সমর্থন করা হবে। কতটা প্রশংসা কবা হবে। কতটা নিন্দা করা হবে। এই নিয়ে চলল বাক্-বিতণ্ডা। শেষে গৃহীত হল এই প্রস্তাব :

'জাতীয় কংগ্রেস তাব সংগঠনকে সমস্ত প্রকার বাজনৈতিক সহিংসবাদী কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে রাখে এবং এইসব কাজের প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ করে। তা সত্ত্বেও এই সভা ভগৎ সিং ও তাঁর সাথী সুখদেব এবং রাজগুরুর সাহস ও আত্মদানের ঘটনাকে স্বীকৃতি দিযে লিপিবদ্ধ করছে। এই সভা, এই তিন মৃতজনের পরিবারবর্গের সঙ্গে একইভাবে শোকসন্তপ্ত। জাতীয কংগ্রেস মনে করে, এই তিনজনের ফাঁসির ঘটনা একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বেচ্ছাচারিতামূলক কাজ। সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে এদেব মৃত্যুদণ্ডাদেশ রদ করার দাবীকে যেভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে সেটাও প্রতিশোধাত্মক কাজ।...'

এই প্রস্তাব সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, 'অবস্থাটা ঐ অধিবেশনে এইবকম জায়গায় পৌঁছেছিল যে, সাধারণ অবস্থায় যারা এসব কথার ধার কাছ দিয়েও হাঁটতে রাজী হতেন না, চাপে পড়ে তাদের এই প্রস্তাবে রাজী হতে হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীকেও বাধ্য হয়ে তাঁর বিবেকবোধকে কিছুটা প্রসারিত করতে হয়েছে।' (সূত্র : G. S. Deol, 'Shahced Bhagat Singh, A Biography'.)

বোম্বাইতে (বর্তমান, মুম্বই) তিন দিনের টানা শ্রমিক ধর্মঘট হল। সবচাইতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল কানপুরে। ২৪শে মার্চ ১৯৩১ তারিখে আরো অনেক জায়গার মত এই শহরেও ভগৎ সিংদের ফাঁসির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে হরতাল পালনের আহ্বানও জানান হয়েছিল। স্বতস্ফূর্তভাবে সফল হয়েছিল সেই প্রতিবাদ হরতাল। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে গেল কানপুর শহরে। হরতাল উপলক্ষে দুষ্টচক্রের উস্কানীতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেল। শ্রমিক অঞ্চলে পরিচিত শ্রমিক নেতা হিসেবে সেই দাঙ্গা সামলাতে গিয়েছিলেন একসময়ে কানপুরে ভগৎ সিং-এরই রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা ও অভিভাবক সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী। দাঙ্গাকারীদের হাতে নিহত হলেন বিদ্যার্থীজী। এ এক নিদারুণ হৃদয়বিদারক ঘটনা।

পরিশিষ্ট

ভগৎ সিং সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু: "ভগৎ সিং আজ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। তিনি একটি প্রতীক। আজ সারা দেশ যে বিপ্লব এবং বিদ্রোহের চিন্তা-আদর্শে প্রভাবিত হয়েছে, ভগৎ সিং সেই বিপ্লবী চিন্তার জীবন্ত প্রতীক।" (অমৃতসরের বক্তৃতা; সূত্র: G. S. Deol)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী: "ভগৎ সিংকে কেন্দ্র করে যতটা অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর কথা জানা যায় তেমনটি স্মরণকালের মধ্যে আর কারও জীবনকে ঘিরে পাওয়া যায় না।" ('Martyrs of India', Edited by Chaman Lal, Kanpur 1957, Page 150; সূত্র: G. S. Deol)

ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া: "একথা বলা মোটেই বাড়াবাড়ি নয় যে আজ সারা ভারত জুড়ে ভগৎ সিং-এর নাম গান্ধীজীর মত একইভাবে জনপ্রিয়।" ('The History of the Indian National Congress, Vol-I, Page 456, by Dr. P. Sitaramayya; সূত্র: G.S. Deol)

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু: (১৯২৯ সালের জুলাই মাসে জেলে প্রথম ভগৎ সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার উপলক্ষে তাঁর আত্মজীবনীতে ভগৎ সম্পর্কে মন্তব্য):

"ভগৎ সিং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তাঁর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য এটা ঠিক নয়। সমগ্র জাতির স্বার্থে লালা লাজপত রায়ের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে তাঁর কার্যক্রম তাকে জনপ্রিয় করছে। তিনি সারা দেশে বিপ্লব, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের জীবন্ত প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি কি অ্যাকসন করেছেন লোকে সে কথা বিস্মৃত হয়ে, তাঁকে একটি প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই পাঞ্জাবের প্রতিটি গ্রাম, গঞ্জ, শহরে এবং উত্তর ভারতেরও বেশ কিছু জায়গায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। ভগৎ সিংকে কেন্দ্র করে অসংখ্য গল্প-কাহিনী গড়ে উঠেছে। সারা দেশে ভগৎ সিং যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন সেটা বিস্ময়কর।

"ভগৎ সিংকে আমি দেখেছি একজন চমৎকার আকর্ষণীয় বুদ্ধিজীবী চেহারার ধীর, স্থির শান্ত ব্যক্তিত্বের মানুষ হিসেবে। ভগৎ সিং-এর চেহারাটিও যেমন ভদ্র মার্জিত, তাঁর কথাবার্তাও তেমনি ভদ্র ও বিনয়ী বলেই আমার বোধ হয়েছে।

"সাহস ও পৌরুষের সঙ্গে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ভারতের মানুষের বাঁচার পথ কিভাবে তৈরি করে যেতে হয়, ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদানের মধ্যে সমগ্র দেশবাসীর এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিৎ।"

"এই তরুণটি (ভগৎ সিং) হঠাৎ এত জনপ্রিয় ও সকলের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে যে গান্ধীজীর মত মানুষ যিনি অহিংসায় বিশ্বাসী তিনিও আজ ভগৎ সিং-এর প্রশংসা করছেন। পেশোয়ার, শোলাপুর, বোম্বাই-সহ বিভিন্ন জায়গায় কত মানুষই তো দেশের জন্য জীবন দিলেন কিন্তু ভগৎ সিং-এর আত্মোৎসর্গ, দুর্জয় সাহস, সকলের থেকে

পৃথক, এক অতি উচ্চস্তরের। আমাদের সকলের ভগৎ সিং-এর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ কিভাবে দেশের স্বার্থে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে হয়। শহীদ ভগৎ সিং ও তাঁর পরিবারের মানুষদের দেশের জন্য সেবা ও আত্মদানের কথা সর্বদাই মনে রাখা উচিত।"

বিজয়কুমার সিন্‌হা : (ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ কমরেড, H. S. R. A দলের নেতা এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী)।

"মহান সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জন্য ভগৎ সিং তাঁর জীবন দিয়ে গেছেন। ···ভগৎ সিংকে কেবলমাত্র একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াটা ভুল হবে। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যা কিনা নতুন চিন্তা ও নতুন আদর্শের ঘোষণা করেছিল, সেই নতুন যুগের আদর্শ প্রতিনিধিত্বকারী নেতা। ভগৎ সিং-এর ঘটনাবহুল বিপ্লবী জীবন নাটকীয়ভাবে ভারতের সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক হয়ে গেছে।

"ব্যক্তিজীবনে সর্দার ভগৎ সিং তাঁর প্রীতিকর ব্যবহারের জন্য সকলের কাছে আকর্ষণীয় ছিলেন। তাঁর ছিল শিল্পীসুলভ মানসিকতা। বিভিন্ন বিষয়ের অতি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করতে তিনি কখনই ভুলতেন না এবং সবকিছুই তাঁর চোখে ধরা পড়ত। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদ্। গভীর চিন্তাশক্তির সঙ্গে, প্রচণ্ড অনুভূতিপ্রবণ মনের অপূর্ব সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি হিসেবেই ভগৎ সিংকে আমরা ভারতের বিপ্লবী তরুণদের এক সর্বোৎকৃষ্ট নেতৃত্বের উদাহরণ হিসেবে দেখতে পাই।

"তাঁর ছিল অফুরন্ত আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। বিপ্লবের স্বার্থে তিনি ছিলেন আত্মবলিদানে সর্বদা প্রস্তুত।"

শিব বর্মা : (ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ কমরেড, H. S. R. A. দলের নেতা ও সংগঠক এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী)।

"ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে আসন্ন পরিবর্তনগুলি ভগৎ সিং ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দৃষ্টিতে, সঠিকভাবেই দেখেছিলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আগামীদিনে কার্ল মার্কসের শিক্ষা অনুযায়ী গঠিত দলের নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের ওপরই বর্তাবে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব। এটা হয়ত সত্য যে 'মার্কসবাদী' কথাটার আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী তিনি হয়ত 'পুরোপুরি মার্কসবাদী' হয়ে ওঠেননি। কিন্তু একথা সত্য যে জীবনের শেষ দিনগুলিতে এসে তিনি 'মার্কসবাদী' চরিত্রের অনেক নিকটবর্তী হয়েছিলেন।"

"মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস আত্মবলিদান দেশপ্রেম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক ভগৎ সিং। ভগৎ সিং-এর সমাজতান্ত্রিক সমাজগড়ার স্বপ্ন দেশের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান ছিল রণহুঙ্কার।···

"সাধারণ মানুষ জানেন না ভগৎ সিং সত্যিই কি ছিলেন। তারা কেবল শুনেছেন

ভগৎ সিং একজন সাহসী যুবক ছিলেন। যিনি লালা লাজপত রায়ের হত্যার বদলা নিয়ে সান্ডার্স বধ করেছিলেন এবং দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা ছুঁড়েছিলেন, ব্যাস এইটুকুই। কিন্তু ভগৎ সিং যে একজন অতি উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন একথা বেশিরভাগ মানুষেরই জানা নেই। তথ্যের এই ঘাটতির জন্যই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শগত দিকটিকে সাধারণভাবে এবং ভগৎ সিংকে বিশেষভাবে হাল্কা করে এবং বিকৃত করে পরিবেশন করে। এদের উদ্দেশ্যই হল নিজেদের ঝোঁকসর্বস্ব একপেশে তথ্য ও ইতিহাস পেশ করা।

"আমাদের সময়ে ভগৎ সিং অনেকের চেয়ে, অনেক উচ্চ চিন্তা ভাবনার, উচ্চস্তরের চিন্তাবিদ ছিলেন।"

('Selected writings of Shaheed Bhagat Singh', by Shiv Verma)।

অজয় ঘোষ : (ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ কমরেড, H. S R. A এর সংগঠক ও পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক)।

"জাতীয় আন্দোলনে ভগৎ সিং-ই প্রথম 'বন্দে মাতরম' স্লোগানের পরিবর্তে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানের সূচনা করেন। তাঁর নাম উচ্চারিত হত লক্ষ লক্ষ মানুষেব কণ্ঠে। প্রতিটি যুবকেব হৃদয়ে 'ভগৎ সিং' নামটি ছিল সংগ্রামের প্রেবণা। ভগৎ-এব সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দের কথা যখন মনে করি তখন আমার বুক গর্বে ভরে যায়।

"স্বল্প সমযেব জন্য ভগৎ ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আবির্ভূত হযেছিলেন ধূমকেতুর মত। যখন তিনি মিলিয়ে গেলেন তখন লক্ষ লক্ষ দৃষ্টির সামনে সপ্তর্ষিমণ্ডলেব তারাদেব মত তিনি মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হলেন। নতুন ভাবতের আশা-আকাঙ্ক্ষাব প্রতীক হলেন ভগৎ। যিনি মৃত্যুর সামনে অকুতোভয়। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন স্বাধীন ভারতের সৌধ বানাতে যিনি বদ্ধ পরিকর।"

('Bhagat Singh and his Comrades', by Ajoy Ghosh, Communist Party Publication)।

বি-টি-রণদিভে : (অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া-মার্কসিস্টের অন্যতম বিশিষ্ট তাত্ত্বিক নেতা)।

"জনজীবনে ভগৎ সিং-এর খোলাখুলি আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ জানতে পারল যে ভারতের মাটিতে এমন একজন যুবক আছেন যিনি শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপূরক বিপ্লবী চিন্তায় বিশ্বাসী। যিনি সর্বাপেক্ষা উন্নত বিজ্ঞানসম্মত বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করতে চান।

"এটা বিনা দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে বলা চলে যে বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে জাতীয নেতাদের নেতৃত্বের চরিত্র ও তার দুর্বলতা সম্পর্কে ভগৎ সিং-এর অনুমান ও বিশ্লেষণ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের সঙ্গে প্রায় কমবেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ভগৎ সিং-এর রচনাবলীই প্রমাণ করে, তাঁর ক্রমশ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীলতার সত্যতা।

"বর্তমান সংকটজনক সময়ে ভগৎ সিং-এর রচনাবলী সর্বস্তরে দেশপ্রেমিক এবং বিশেষ করে যুবকশ্রেণীকে নিশ্চিতভাবে উদ্বুদ্ধ করবে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে মজবুত করে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। ভগৎ সিং-এর লেখাগুলি সর্বস্তরের

যুবকদের অনুপ্রেরণা জোগাবে জনগণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।"
(Foreword note by B. T Ranadive.to 'Selected writings of Shaheed Bhagat Sing', by Shiv Verma)।

অধ্যাপক বিপান চন্দ্র: (ভগৎ সিং প্রণীত 'কেন আমি নাস্তিক' পুস্তিকার ভূমিকা লিখেছিলেন অধ্যাপক বিপান চন্দ্র। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন)

"ভগৎ সিং কেবলমাত্র ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজতন্ত্রীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ দেশে মার্কসবাদী চিন্তানায়কদের প্রথম স্তরের অন্যতম নেতা।

"(এই পুস্তিকায়) ধর্মের ভূমিকা ও তার মৌলিক কারণগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা ভগৎ সিং-এর শক্তিশালী চিন্তা-পদ্ধতি, বিপ্লবী সংকল্প এবং ঐতিহাসিক বাস্তব প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে বিচার করার এক অপূর্ব বিশ্লেষণ-ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হই।"

বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে, ভগৎ সিং-এর উল্লিখিত "God serves as a father, mother, sister, and brother, friend and helper" কথাটা কার্ল মার্কসের ১৮৪৪ সালের যুবক বয়সের লেখা, "...It is the opium of the people" কথাটির ভাব ও তাৎপর্যের কত নিকটবর্তী। আশ্চর্যের বিষয় ভগৎ যখন এটি লিখেছিলেন তখন কার্ল মার্কসের ঐ লেখাটি এবং ব্যাখ্যাটি তিনি কদাপি পড়েননি, চোখেও দেখেননি, এই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

আসফ আলী: (দিল্লী আইনসভা বোমা মামলার রাজবন্দীদের পক্ষ সমর্থক প্রখ্যাত আইনজীবী ও পরবর্তীকালে উড়িষ্যার রাজ্যপাল)

"আমি ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত এই দুজনকেই দেখেছি খুবই মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ, ভদ্র, মার্জিত ব্যক্তিত্ব।

"ভগৎ সিং ছিলেন ভারী সুন্দর, ভালবাসার পাত্র। আমি স্মরণকালে এঁদের মত বীর, সাহসী, তেজস্বী যুবক আর দেখিনি।

"বিপ্লবী বললেই যেমন বোঝানো হয় রক্তপিপাসু কর্কশ স্বভাবের ভয়ঙ্কর এক ব্যক্তিত্ব, ভগৎ সিং ছিলেন ঠিক তার বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তিনি দেখতে যেমন ছিলেন অপূর্বকান্তি, তেমনি ব্যবহারেও ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত, রুচিশীল এবং সকলের প্রিয়পাত্র। তাঁর কালের গণ্ডী অতিক্রম করে ভগৎ সিং চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার এক আশ্চর্য নিদর্শন রেখে গেছেন। ভগৎ সিং আজ যদি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকার সুযোগ পেতেন, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, জীবনের যে কোন বিষয়ে তিনি সারা দুনিয়ার সামনে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতেন।"
('The Common Weal', Poona, dated March 23, 1949, An Article 'Bhagat Singh An Obsolescent' by Asaf Ali,সূত্র : G. S. Deol)।

মুজফ্ফর আহ্‌মেদ: (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও মার্কসবাদী চিন্তাবিদ)' ···ভারতের ইতিহাসে অন্য কোন যুবসংগঠন 'নওজওয়ান ভারতসভা'র মত এত বেশি রাজনীতিক প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। বিভিন্ন বিপ্লবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগের ভিতর দিয়ে ভগৎ সিং রাজনীতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি রাজনীতিতে বিকশিত হয়েছিলেন 'নওজওয়ান ভারতসভা'র মারফতে।"
('অগ্নিযুগ' সম্পাদনা, শৈলেশ দে)।

তথ্যসূত্র

১ বীরেন্দ্র সিঁধুর লেখা, 'ভারতীয় ক্রান্তিকে অগ্রদূত অমব শহীদ ভগৎ সিং' : (হিন্দী)।

২ ১২ টা 'মিসল' হল ভাঙ্গি, কান্হিয়া, সুকাবচাকিয়া (বণজিৎ সিং এই মিসলেব নেতা ছিলেন), নাকাই, কাইজুল্লাপুবিয়া, আলুওযালিযা, বামগবিযা, ডালিওযালিয়া, কাবোরা সিংহিয়া, নিশানওয়ালা, শহীদ ও নিহাঙ্গ, ও ফুলকিয়া।

৩ 'ভাবতবর্ষেব ইতিহাস' : প্রগতি প্রকাশন, মস্কো। ১৯৮২।

৪ ২৫শে এপ্রিল ১৮০৯ খৃস্টাব্দে অমৃতসবে বণজিৎ সিং ও বৃটিশদের মধ্যে স্বাক্ষবিত 'পাবপিচুয়াল ফ্রেন্ডসিপ' বা স্থায়ী বন্ধুত্বের চুক্তি এবং পববর্তীকালে গভর্নব্ জেনাবেল হার্ডিঞ্জেব ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে শিখ-বাজ্য দখলেব জন্য যুদ্ধ ঘোষণা, শিখ-যোদ্ধাদেব অসম সাহসিক লড়াই, বিশ্বাসঘাতকতা জনিত দুর্বলতা, ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়াবী তাবিখে পবাজিত হাজার হাজার শিখসৈন্যকে হত্যা এবং সর্বশেষে ৩০শে মার্চ ১৮৪৯ তাবিখে লর্ড ডালহৌসিব ঘোষণাবলে পাঞ্জাব দখল।

৫ দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে (১৮৪৯ খৃস্টাব্দে) পাঞ্জাব দখলেব পবই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারেব শেষপর্বের সূচনা হয়। যাব পবিণতিতে বৃটিশ রাজশক্তি পাঞ্জাবের বুকে তথাকথিত কিছু সংস্কাবমূলক উন্নয়নী পবিকল্পনা নেয। এবই অন্যতম ছিল কৃষিব ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কাবসাধন এবং এসবেব মিলিত প্রতিক্রিয়ায় পাঞ্জাবের একটি অংশকে বিভ্রান্ত কবে বৃটিশ অনুগত কবা হয। এবং এবা দ্বিতীয় ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধসহ ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহে বিরূপ ভূমিকা পালন কবে।

৬ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রীঅববিন্দের যোগসূত্রে যুক্ত হন ববোদাব সৈন্য-বিভাগে। ১৯০২ সালে শ্রীঅববিন্দ তাঁকে বাংলায় পাঠান বিপ্লবী-সংগঠনের কাজে। এর পব অনুজ বাবীন ঘোষকেও পাঠান যতীন্দ্রনাথেব সঙ্গে যোগ দিতে। ১৯০৩ সালে শ্রীঅববিন্দ বাংলায় আসেন। 'অনুশীলন' সংগঠনেব অন্যতম নেতা প্রমথ মিত্রবা শ্রীঅববিন্দেব কাছে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উগ্র হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রচাবের অভিযোগ আনেন। বাবীন ঘোষের সঙ্গেও তাঁর মতপার্থক্য হয। এক সময় তিনি 'নিবালম্ব স্বামী' নামে সন্ন্যাস গ্রহণ কবে তবাই-এব জঙ্গলপথে চলে যান তিব্বত। সেখানে হিমালয়েব নানান জাযগা ঘুবে পাঞ্জাবে আসেন। এখানে তিনি শ্রীঅরবিন্দেব বিপ্লবী চিন্তা ছড়িয়ে দেন দেশপ্রেমিক পাঞ্জাবীদেব মধ্যে। ভগৎ সিং-এব বাবা কিষেণ সিং, কাকা বিপ্লবী সর্দার অজিত সিং, লালা লাজপৎ বায, হবদয়াল, লালা অমবদাস, ওবেদুল্লা সিন্ধি, আম্বালার ডাঃ হবিচরণ মুখোপাধ্যায়, পেশোযারেব ডাঃ চারু ঘোষ প্রমুখ প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ হন তাঁর আদর্শ প্রচাবে।

৭ 'মুক্তিব সংগ্রামে ভাবত' : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তব পঃ বঙ্গ সরকাব, ১৯৮৬।
৮ 'ভাবতেব দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
৯ 'অমর শহীদ ভগৎ সিং' : বীবেন্দ্র সিঁধু। প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকাব। (হিন্দী)।
১০ 'অমর শহীদ ভগৎ সিং' : বীবেন্দ্র সিঁধু। (হিন্দী)।
১১ ১৯১৫ সালেব লাহোব ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম আসামী বিপ্লবী কর্তার সিং সাবাভা তাঁর জবানবন্দীতে স্বীকাব কবেছেন অজিত সিং-এব ভাইয়েব (কিষেণ সিং) কাছ থেকে তিনি ১০০০ টাকা পেয়েছেন। আর একজন বাজসাক্ষী নবাব খানও তাব বিবৃতিতে এই কথাব উল্লেখ করে বলেছেন যে, ভাই পরমানন্দ একবাব কর্তার সিং সাবাভাকে পাঠিয়েছিলেন কিষেণ সিং-এব কাছে যিনি ঐ পবিমাণ অর্থ সাহায্য কবেছিলেন।
১২ প্রবাদ প্রতিম সংগ্রামী 'বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ' : (আত্মজীবনী), পশ্চিম বঙ্গ বাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃষ্ঠা ১৭৫।
১৩ 'বাংলায় বিপ্লববাদ' : নলিনীকিশোর গুহ।
১৪ 'Shaheed Bhagat Singh, A Biography' : by G. S. Deol এবং ও 'অমব শহীদ ভগৎ সিং' : বীবেন্দ্র সিঁধু (হিন্দী)।
১৫ গদর পার্টি : বিদেশে ভারতীযদেব স্বাধীনতা সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম এই দলেব। আমেবিকায় প্রবাসী ভাবতীযদের সংগঠনেব নামকরণ করা হয় 'হিন্দুস্থানী এসোসিয়েসন অব দি প্যাসিফিক কোস্ট'। লালা হরদয়াল এর সম্পাদক ও বাবা সোহন সিং ভাকনা সভাপতি নির্বাচিত হন। 'গদব' অর্থাৎ 'বিপ্লব' এই নামে ১৯১৩ সালে সানফ্রান্সিসকো থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই পত্রিকার নামেই পববর্তীকালে এর নামকরণ হয় গদব পার্টি। গদর পার্টি ধর্ম নিরপেক্ষতাব আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। হিন্দু, মুসলিম, শিখ সকলের শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল গদব পার্টি। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসেব বিষয় বলে দল ঘোষণা করেছিল। 'যুগান্তর আশ্রম'-এর নামে তার অফিস ভবনের নামকরণ হয়েছিল। যেখানে হিন্দু, শিখ ও মুসলিম'বা একসঙ্গে থাকতেন, খাওয়া-দাওয়া করতেন। শহীদ কর্তার সিং সারাভা বিদেশে থাকাকালীন এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

লালা হরদয়াল পরিচালিত গদর পার্টি রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে কাজ করছিল এদেশে। তাঁরা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল (প্রতুল গাঙ্গুলী প্রণীত 'বিপ্লবীর জীবন দর্শন'। পৃ. ২৮৮)।

১৬ **'কর্তার সিং সারাভা'**: সে সময় এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হিন্দী 'চাঁদ' পত্রিকায় ভগৎ সিং-এর লেখা অন্যতম সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ। ভগৎ সিং-এর কলমের জোর ছিল আশ্চর্য রকম। হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী এবং ইংরাজি ভাষার ওপর তাঁর ছিল চমৎকার দখল। সে সময়ে অমৃতসর থেকে প্রকাশিত সোহন সিং জোশের 'কীর্তি' পত্রিকায় গদর পার্টি এবং বব্বর অকালী শহীদদের সম্পর্কে পাঞ্জাবী ভাষায় ভগৎ সিং-এর লেখা সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। এমনি সুফী অম্বাপ্রসাদ, ডাঃ মথুরা সিং, কুকা আন্দোলনের নেতা বাবা রাম সিংদের সম্পর্কেও তাঁর লেখা সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

১৭ **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার**: পাঞ্জাবের ইতিহাসে দুই কলঙ্কময় নাম, এক পাঞ্জাব প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর্ মাইকেল ডায়ার। যে অত্যাচারী শাসক সারা প্রদেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অপরজন জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ তারিখের কুখ্যাত গণহত্যালীলার নায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার।

১৮ **হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন**: ১৯২৩ সালের শেষে তৈরি হয়েছিল 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন'। এটি ভগৎ সিং-এর সহযোদ্ধা কমরেড শিব বর্মা সম্পাদিত 'Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh' এর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে (Page 21)। কিন্তু অপর প্রখ্যাত বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন: "শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯২০ সনে আন্দামান হইতে মুক্তিলাভের পর, কিছুকাল জামসেদপুর শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন। অনুশীলনই সর্বপ্রথমে শ্রমিক সংগঠনে হাত দেয়। উত্তর ভারতের 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির' জন্ম হয় ১৯২৪ সনে কলিকাতায়—ইহার স্রষ্টা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলী) ও আমি ছিলাম। পরবর্তীযুগে উত্তর ভারতে অনুশীলন সমিতি 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি' নামে পরিচিত ছিল। ভগৎ সিং আমাদের সভ্য ছিল। ১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় ভগৎ সিং পলাতক অবস্থায় আমাদের সহিত দেখা করিয়া গিয়াছিল। ভগৎ সিং খুব সাহসী এবং উৎসাহী যুবক ছিল। তাঁহার ফাঁসির সময় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন হইয়াছিল।" (পৃ. ২১৩)।

১৯ **মৌলানা হসরৎ মোহানি**: শিব বর্মাকৃত 'Selected writings of Shaheed Bhagat Singh'-গ্রন্থ থেকে এঁর পরিচয় পাওয়া যায়। রাধামোহন গোকুলজী, সত্য ভক্ত এই দুজনের সঙ্গে এক সারিতে যাঁরা কানপুর গ্রুপ হিসেবে নিজেদের অনেক আগেই কম্যুনিস্ট বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন ইনি তাঁদের একজন। রাধামোহন গোকুলজী, যাঁর কাছে শিব বর্মা কম্যুনিজমের প্রথম পাঠ নেন, তিনি ছিলেন প্রবলভাবে নাস্তিক। জনপ্রিয় লেখনীতে তিনি ভগবান, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সত্য ভক্তের কম্যুনিজমের চিন্তার সঙ্গে কিছুটা অধ্যাত্মবাদ মিশে থাকত। কিন্তু মৌলানার চিন্তা ছিল কম্যুনিজমের চিন্তার সঙ্গে কিছুটা ইসলামিক চিন্তার মিশ্রণ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই তিন নেতাই সে সময়ে এ দেশে সোভিয়েত রাশিয়া এবং কম্যুনিজমের চিন্তাকে জনপ্রিয় করেছেন। কানপুর গ্রুপের তরুণ বিপ্লবীরা এঁদের তিনজনের মাধ্যমেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় দীক্ষিত হয়েছেন।

মৌলানার নাম আর একদিক দিয়ে ঐতিহাসিক। ১৯২১ সালে আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপক হলেন মৌলানা হসরৎ মোহানি। সমর্থক স্বামী কুমারানন্দ। দুজনেই ছিলেন কম্যুনিস্ট। ('মুক্তির সন্ধানে ভারত,' পঃ বঃ সঃ প্রকাশিত আলেখ্য গ্রন্থ থেকে এই সংবাদ সংগৃহীত)।

২০ **দি রেভলিউশন্যারী ও ইওলো পেপার**: ভগৎ সিং-এর সাথী বিপ্লবী নেতা শিব বর্মা তাঁর 'শহীদ স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "শচীনদা (শচীন্দ্রনাথ সান্যাল) এ্যাসোসিয়েসনের কর্মসূচী ও তার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগেই একটা দলিল তৈরি করেছিলেন। এবং তারই অনুরূপ নিয়মাবলীর একটা খসড়া করেছিলেন। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে দুটি দলিলই গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে এই দুটি দলিল 'দি রেভলিউশন্যারী' ও 'ইওলো লিফলেট' (হলদে হ্যান্ডবিল) নামে বিখ্যাত। নিয়মাবলীর হ্যান্ডবিলখানি হলদে কাগজে ছাপা হয়েছিল বলে ঐ নামকরণ। সরকারী দলিলেও এই হ্যান্ডবিলটি 'ইওলো লিফলেট' নামে পরিচিত।

"দি রেভলিউশন্যারী' ও 'ইওলো লিফলেট' দুটি ছাপার ব্যবস্থা যতীন দাসই করেছিলেন। 'দি রেভলিউশন্যারী' সারা দেশে এক দিনে একই সময়ে প্রচার করা হয়েছিল। বাংলা দেশে যতীন দাস তার সহকর্মী পরিতোষ ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রভৃতির সহায়তায় সে কাজ সম্পন্ন করেছিল।"

'দি রেভলিউশন্যারী' প্রচারপত্রের এক জায়গায়, একটি প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে, "অধ্যাত্মবাদী চিন্তার জগতে দল সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দল একথা প্রচার করতে চায় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক মায়া নয়, যাকে মোহ বা বিভ্রম বলে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং অবজ্ঞায় ঘৃণা করতে হবে। বরং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, সৌন্দর্যের উৎসরূপ সর্বশক্তিমান এক আত্মার জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ।"

ভগৎ সিং তাঁর 'কেন আমি নাস্তিক' পুস্তিকায় এই অংশের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে এটি শচীন্দ্রনাথ

সান্যালের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত বক্তব্য এবং গুপ্ত সংগঠনে এইভাবেই বিশিষ্ট নেতাব নিজস্ব চিন্তা দলেব চিন্তা বলে প্রচাবিত হয় এবং অন্যদেব কর্তব্য হয় দ্বিধাহীনভাবে তাব ওপব আস্থা বাখতে এমনকি দ্বিমত থাকলেও। ভগৎ বলেছেন, "…পুরো প্যাবাগ্রাফ জুড়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেব কর্মলীলা বর্ণনা কবা হয়েছে। তাব সবটাই হল দুর্বোধ্য অতীন্দ্রিয়বাদ।" কিন্তু, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এটি সর্বসম্মতিক্রমে দলেব সভায় গৃহীত সকলেব সিদ্ধান্ত। সম্ভবত, গুপ্ত সংগঠনেব অভ্যন্তবীণ কাবণে এ সম্পর্কে তথাগত কোন ফাঁক কাত ভগৎ-এব এই ধারণা হয়েছিল।

২১ কাকোবী ট্রেন ডাকাতিতে জখম হবাব ঘটনা সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলেশ দে তাঁর 'ওবা আকাশে জাগাত ঝড়' গ্রন্থে অন্য বিববণ দিয়েছেন, যদিও তাব সূত্র উল্লিখিত নেই। তিনি লিখেছেন, "কাকোবী ট্রেন ডাকাতিতে জনৈক যাত্রী নিহত হয়েছে…একথা সত্য। কিন্তু তাব জন্য আসামীবা দাযী নন। যাত্রীটি তাব স্ত্রীব কথা ভেবে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে যাচ্ছিল, মহিলা কামবাব দিকে। বিপ্লবীদেব একজন ভেবে তাকে গুলি কবেছেন প্রথম শ্রেণীব জনৈক শ্বেতাঙ্গ যাত্রী।…" (পৃ. ৩৫)

২২ গজলটি নিম্নরূপ : "মিট গযা জব মিটনেওযালা / ফিব সলাম আয়া তো ক্যা, / দিল কী বববাদী কে বাদ / উনকা পযাম আযা তো ক্যা। / মিট গঈ জব সব উমীদেঁ / মিট গয়ে সাবে খযাল / উস ঘড়ী গব নামাব / লেকব পযাম আযা তো ক্যা। / আাব দিলে নাদান / মিট জা অব তু কূযে যাব মেঁ, / ফিব মেবী নাকামিযোঁ কে বাদ। / কাম আযা তো ক্যা। / কাশ অপনী জিন্দগী মেঁ হম / ব মঞ্জব দেখতে, / ববসবে তুববত কোঈ / মশহুব খবম আয়া তো ক্যা। / আখিবী শব দীদ কে কাবিল থী / বিসমিল কী তডপ, / সুবেহ্ দম কোঈ অগব / বালাযে বাম আযা তো ক্যা।"

বাংলা গদ্যানুবাদে গজলটি দাঁডায :

"যাব শেষ হবাব কথা, সে শেষ হযে গেলে, তাকে সেলাম দিযে আব কি হবে? হৃদয ভেঙ্গে যাবাব পব, তাব বাণী এলে কি আব হবে? সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন নিঃশেষিত, চেতনা যখন অবলুপ্ত, সেই সময়ে সংবাদ নিযে হবকবা এলে কি আব হবে? হে অবোধ হৃদয, প্রিযাব কুঞ্জগলিতে এবাব তুই শেষ হয়ে যা! আমাব অক্ষমতার পব কাজ শুরু হলে কি আব হবে? নিজেব জীবনকালে যদি সেই দৃশ্য একবাব দেখতে পেতাম! সমাধি-সৌধেব ওপব মবালগমনেব প্রদর্শনী দেখালে কি আর হবে? বাতেব অন্তিম প্রহবে হৃদযেব (বিসমিল-এব আক্ষবিক অর্থ হৃৎপিণ্ড, আবাব কবিব ভনিতাও বটে) ব্যাকুলতা ছিল দেখার মত, প্রথম উষাকালে সুউচ্চ বাতায়নে কেউ দাঁড়িযে থাকলে কি আব হবে?

('শহীদ স্মৃতি', সম্পাদনা : শিব বর্মা)

২৩ G. S Deol তাঁব 'Shaheed Bhagat Singh, A Biography' গ্রন্থে ঘটনাটিব উল্লেখ কবেছেন এইভাবে। কিন্তু, ভগৎ সিং-এব সাথী যশপাল লিখেছেন ভিন্ন ঘটনাব কথা। যশপাল তাঁব 'সিংহাবলোকন' গ্রন্থে লিখেছেন ঐ সভাটি ছিল H S. R A-এব কেন্দ্রীয় সমিতিব সভা। কেন্দ্রীয় সমিতিব অধিকাংশ সদস্যই তখন লাহোরে উপস্থিত ছিলেন। শিব বর্মা এবং ফণীন্দ্র ঘোষ অনেক দূবে ছিলেন। তাদেব খবব দিযে সভা কবতে দেবী হবে এই কাবণে তাদেব কাছে সভাব সংবাদ পৌঁছয়নি। G. S Deol আবও বলেছেন যে ঐ সভায় ভগবতীব স্ত্রী দলেব সমর্থক দুর্গা দেবী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি ঐ অ্যাকসনে অংশ নিতে চেযেছিলেন। কিন্তু ভগৎ সিং-এব পলাযন পর্বেব ঘটনায় দুর্গা দেবীব ভূমিকা তাব প্রমাণ বাখে না। এ ক্ষেত্রে ভগৎ সিং-এব সাথী যশপালেব বর্ণনাই বিশ্বাসেব দাবী বাখে।

২৪ অধ্যাপক হাজারা সিং : প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী, অধ্যাপক ও অমৃতসরের গুরু-নানক দেব বিশ্ববিদ্যালযে উপাচার্যেব সচিব, তাঁব ২বা এপ্রিল ১৯৮৬ সালেব প্রেবিত পত্রেব সঙ্গে এই লেখককে কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ পাঠান। 'The Dramatic Escape' প্রবন্ধটি তাবই একটি। এটি তাঁব বিবৃতি অনুযায়ী তৈবি হয়েছে দুর্গা দেবী, জয়দেব কাপুর, শিব বর্মা, ডঃ গয়া প্রসাদ এবং শহীদ যতীন দাসেব ভাই কিরণ দাসের সঙ্গে আলোচনাব ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যেব সাহায্যে। শহীদ যতীন দাসেব ভাই কিবণ দাসেব পুত্র মিলন দাস যিনি লেখকের সহকর্মী তাঁবই সূত্রে অধ্যাপক হাজাবা সিং-এর সঙ্গে পত্রালাপেব সূচনা। পত্রেব সূচনায় অধ্যাপক লিখেছেন,

"My dear Bandopadhyay
"Your letter of March 20 at my Ludhiana address
I am appreciative of dear Milan to have referred my name to you in your literary and research pursuits on Martyr Bhagat Singh.
"I am enclosing two texts, viz.
i)...............
ii) Dramatic Escape.
"They will provide a broad spectrum for your literary approach to the subject..."

২৫ শিব বর্মার বিবৃতি উল্লেখ করে G. S. Deol বলেছেন, আজাদের হিংওয়ালার ছদ্মবেশে পালানোটাই সত্য ঘটনা। অপর দিকে আর একটি ঘটনার কথা শোনা যায়। আজাদ নাকি মথুবার তীর্থযাত্রী একটি দলের মধ্যে পণ্ডিতেব ছদ্মবেশে ঢুকে বেলপথে লাহোব থেকে পালান।

২৬ ১৯২৮ সালে সোহন সিং জোশের উদ্যোগে, পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কীর্তি কিষাণ পার্টি।' ঐ বছরে মীরাট সম্মেলনে যুক্ত প্রদেশে 'ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি' গঠিত হয়। পি. সি. যোশী তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময়, ঐ পার্টির সারা ভারত সম্মেলন ডাকা হয়। এই সময় কমিউনিস্টরা বিভিন্ন প্রদেশের দলগুলিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 'ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি' গঠনে উদ্যোগী হন। ('ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস': সরল চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৪৩)।

২৭ ভগৎ সিং-এর জবাবী চিঠি: উত্তেজনার তুঙ্গে সুখদেব তার প্রিয় প্রাণের বন্ধুকে বিশ্রীভাবে আক্রমণ করে। ইঙ্গিত করে সে বলতে চায় যে দলের সভায় যোগ দিতে আসা এক মহিলার প্রতি একদিনের সৌজন্যমূলক কথা বলা ও হাসির অর্থ ঐ মহিলার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ। সেই কারণেই যেন ভগৎ জীবনের প্রলোভনের হাতছানিতে মোহগ্রস্ত। ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সংযত থেকে ভগৎ প্রিয় বন্ধুর এই বাচালতা সহ্য করে। পরে ভগৎ শান্তভাবে দিল্লীর সীতারাম বাজার আস্তানায় বসে, ৫ই এপ্রিল ১৯২৯ তারিখে সুখদেবকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লেখে। ৬ই এপ্রিল, পরদিন সাথী শিব বর্মার হাত দিয়ে চিঠিটি লাহোরে সুখদেবের কাছে পাঠায়। চিঠির কিছু অংশ:

"এই চিঠি যখন তুমি পাবে তখন আমি পাড়ি দিয়েছি, দূরে, অনেক দূরে আমার গন্তব্য স্থানে।··· আজ অবধি একটা কথা আমার হৃদয়ে বিঁধছে এই ভেবে যে আমার ভাই, আমার আপন ভাই আমার বিরুদ্ধে হৃদয় দৌর্বল্যের মারাত্মক অভিযোগ আনল।··· আমি দেখছি আমার অতি সারল্যকে বাচালতা এবং স্বীকারোক্তিকে দুর্বলতা বলে জাহির করা হচ্ছে। কিন্তু ভাই, আমি বুঝতে পারছি এসব নিছক ভুল বোঝাবুঝি। তুমিই ভাল করে জান আমি দুর্বল নই। মন পরিষ্কার রেখে আমি বিদায় নেব। আশা করি তুমিও মনকে সাফ করবে। তুমি দয়া করে তড়িঘড়ি কাজ করা বন্ধ কর। শান্ত, ভদ্রভাবে ধীর স্থির হয়ে দলের কাজ সামলাও। মনে রেখো তোমার ওপর বিরাট দায়িত্ব আছে।···

"ভালবাসা, প্রেম এসব বিষয় নৈতিক দিক থেকে আমার কাছে নিছক ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই আবেগ বা ভাবাবেগ একটা পাশবিক বৃত্তি নয়। বরং এটা একটা অত্যন্ত মধুর মানবিক ভাবনা। প্রেম ভালবাসা বিষয় হিসেবে পাশবিক বা জৈবিক আবেগ নয়। তাই দেখা যায় প্রেম ভালবাসা সর্বদা মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে। প্রেম ভালবাসা কখোনই মানুষকে নীচে নামায় না। অবশ্যই যদি সেই প্রেম ভালবাসা পাশবিক বা জৈবিক প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে সত্যিকারের সাচ্চা প্রেম-ভালবাসা হয়। সিনেমার প্রেমিক-প্রেমিকাদের আমরা যা দেখি, সেটা থেকে এসব বিষয়ের বোধ হবে না। কারণ সিনেমায় এরা প্রেম ভালবাসার নামে জৈবিক বা পাশবিক বৃত্তির ক্রীড়নক। খাঁটি প্রেম-ভালবাসা নিজের খেয়াল খুশিমত গড়ে নেওয়া যায় না। এ তার নিজের পথে আপন নিয়মে হাজির হয়। কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না কখন তার সাক্ষাৎ মিলবে।···

"আমার মনে হয়, আমার মনের কথা তোমাকে মন খুলে বলতে পেরেছি। ভাই, একটা কথা তোমাকে খোলাখুলি বলতে চাই যে আমরা বিপ্লবী এবং বিপ্লবী চিন্তাধারা ও নৈতিকতায় বিশ্বাসী। এই বিপ্লবী নৈতিকতার মধ্যে কট্টর আর্যসমাজী ধ্যান ধারণার কোন স্থান নেই। আমরা ঐ ধরনের আদর্শবাদ নিয়ে চলতে পারি না। আমরা আগ-বাড়িয়ে অনেক বড় বড় কথা বলতে পারি, তারপর সহজেই সেটা গোপনও করে ফেলতে পারি। কিন্তু আসল জীবনে যখন সমস্যার মুখোমুখি হই তখন হাত-পায়ের কাঁপন থামতে চায় না।

"তাই বলছি ভাই, এসব কথাবার্তা বলা ছাড়। নিজের মনে কোন ভ্রান্ত অনুমান না রেখে গভীর বিনয়ের সঙ্গে কি তোমাকে এটুকু বলতে পারি, তোমার মধ্যে যে অতি-আদর্শবাদের আতিশয্য আছে সেটার মাত্রা কিছুটা কমাও? আমার মত যারা দুর্বলতার ব্যামোর শিকার এবং পেছনে পড়ে আছে তাদের প্রতি দয়া করে এত তীক্ষ্ণ, ধারাল বাক্যের আক্রমণ বন্ধ কর। এদের ভর্ৎসনা করে দুঃখ-কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দিও না। এদের সকলের জন্যই তোমার ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রয়োজন।

"আমি কি তাহলে আশা করতে পারি যে, এখন থেকে তুমি যেসব মানুষের তোমার কাছ থেকে সহৃদয় আচরণ সব চাইতে বেশি প্রয়োজন; তাদের সঙ্গে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে, বন্ধুত্ব করবে? কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি নিজে ব্যক্তিজীবনে যতদিন এই বিষয়গুলির মুখোমুখি না হচ্ছ, ততদিন এইসব তত্ত্বের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে না। তুমি ভাবছ, কেন আমি এসব কথা তুলছি! কারণ আমি বিলকুল স্পষ্ট থাকতে চাই। তাই আজ আমি প্রাণ খুলে তোমাকে সব কিছু বললাম।

"তোমার সাফল্য ও প্রসন্ন জীবনের কামনা করি।

"তোমার ভাই
"ভগৎ সিং"।

২৮ আইনসভায় বিলিকরা প্রচারপত্র: দিল্লী আইনসভায় বোমা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী রঙের এই প্রচারপত্রটি হলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। 'The Hindustan Times' পত্রিকার একজন সাংবাদিক হলের মধ্য থেকে এর একটি কপি সংগ্রহ করেন। ঐ পত্রিকার ৮ই এপ্রিল ১৯২৯ তারিখের বিশেষ সান্ধ্য সংখ্যায় এই প্রচারপত্রটি হুবহু ছেপে বার করা হয়। পুলিশ পরে এটি বাজেয়াপ্ত করে। শিব বর্মা লিখেছেন, ইংরাজীতে এই প্রচারপত্রটি ভগৎ সিং লিখেছিলেন, দলের সীতারাম বাজার ডেরায় বসে। ভগৎ নিজেই এটিকে দলের

প্যাড বা লেটাব হেডে অত্যন্ত পবিশ্রম করে ৩০।৪০ কপি টাইপ করেন। মাবোযাডী স্কুলের একজন ড্রিল মাস্টাবের সাহায্যে ভগৎ সিং-এব সাথী জযদেব কাপুবই এইসব টাইপ করাব ব্যবস্থা কবে দেন।
প্রচারপত্রেব ছাপান অংশ :

"THE
"HINDUSTAN SOCIALIST REPUBLICAN ARMY
"NOTICE

প্রচাবপত্রেব টাইপ করা অংশ: " 'বধিবকে শোনাতে হলে উচ্চকণ্ঠেব প্রয়োজন'। একই ধবনেব ঘটনায ফবাসী নৈবাজ্যবাদী শহীদ বৈলেঁযবেব এই অমব কথাগুলি উচ্চাবণ কবে আমবা আমাদেব এই 'অ্যাকসনে'ব সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উত্থাপন কবছি।

"বিগত দশ বছবেব অবমাননাকব শাসন সংস্কারের কথাব পুনবাবৃত্তি করতে চাই না। এই সভা অর্থাৎ তথাকথিত ভাবতীয পার্লামেন্ট, ভাবতীয জাতিব প্রতি যে অপমানজনক আচবণ কবেছে সে কথাবও উল্লেখ কবতে চাই না। আমবা বলতে চাই যে, যখন সাইমন কমিশনেব সংস্কাব মূলক রুটি-মাংসেব টুকবোব ভাগ বাঁটোযাবা নিয়ে নেতারা নিজেদেব মধ্যে কামড়া-কামডিতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ই সবকাব আমাদেব ওপব আবও কযেকটা নতুন দমনমূলক আইনী ব্যবস্থা, যেমন 'পাবলিক সেফটি' ও 'ট্রেড ডিসপিউট' বিলগুলি চাপিযে দিচ্ছে। বাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা, লেখা ও কর্ম নিবোধক, 'প্রেস সিডিসন' বিলটি এবা মজুত বেখেছে আগামী অধিবেশনেব জন্য। যথেচ্ছভাবে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তাবেব ঘটনা থেকে পবিষ্কাব বোঝা যাচ্ছে হাওয়া কোনদিকে বইছে।

"এইবকম একটা চরম উত্তেজক অবস্থায, হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিযেসন তাদেব দাযিত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থেকে অত্যন্ত গুরুত্বেব সঙ্গে বিচাব বিবেচনা করেই তাব সৈনাবাহিনীকে আদেশ কবেছে, আজকেব এই অ্যাকসন করাব। যাব উদ্দেশ্য এই অবমাননাকব প্রহসন বন্ধ কবা। বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শোষকবা যথেচ্ছাচাব চালাতে পাবে। কিন্তু তাদেব ঘৃণ্য কাজকে জনসমক্ষে উলঙ্গ কবে দেওযা হবে।

"জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, আপনাবা আপনাদেব নিজ নিজ নির্বাচনক্ষেত্রে ফিবে যান। আসন্ন বিপ্লবেব জন্য মানুষকে প্রস্তুত করুন। আসুন, আমবা এই সবকাবকে এটা টেব পাইয়ে দিই যে পাবলিক সেফটি এবং ট্রেড ডিসপিউট বিলসহ্ লালা লাজপত রাযেব নিষ্ঠুব হত্যাকাণ্ডেব বিরুদ্ধে, ভাবতের অসহায মানুষদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানোব সঙ্গে সঙ্গে আমবা এদেব ইতিহাসেব ঘটনাব পুনরাবৃত্তিব শিক্ষাটাও ভাল কবে মনে কবিযে দিই। ব্যক্তিকে হত্যা কবা সহজ কিন্তু আদর্শকে খতম করা যায না। বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য ধূলোয মিশে যায কিন্তু আদর্শ বেঁচে থাকে। বুববোঁ রাজবংশেব বিনাশ ঘটেছে। জাবতন্ত্রেব পতন হযেছে। কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে বিজযেব পথে এগিয়ে চলেছে বিপ্লব।

"আমবা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনাব সঙ্গে স্বীকাব কবছি আমবা যাবা মানবজীবনকে মহান বলে শ্রদ্ধা কবি আমবা যাবা গৌববময ভবিষ্যৎ যেখানে মানুষ পূর্ণ শান্তি ও স্বাধীনতা ভোগ কববে তেমন সমাজব্যবস্থাব স্বপ্ন দেখি, সেই তাদেবই আজ বাধ্য হযে বক্ত ঝবাতে হল। কিন্তু যে মহান বিপ্লব মানুষেব দ্বাবা মানুষেব শোষণের অবসান ঘটিযে সকলেব জন্য স্বাধীনতা এনে দেবে, শোষণব্যবস্থাকে বানচাল করে দেবে, সেই 'মহান বিপ্লবেব' যজ্ঞে কিছু ব্যক্তিকে জীবন আহুতি তো দিতেই হবে। এটা অনিবার্য।

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

(স্বাক্ষর) "বলবাজ
"Dated———— 192 "কমাণ্ডাব-ইন্-চীফ"

বলবাজ নামেব স্বাক্ষরটি কাল্পনিক। কমান্ডার-ইন্-চীফ ছিলেন, আসলে, চন্দ্রশেখব আজাদ।

২৯ যতীন দাস : জন্ম ২৭শে অক্টোবব ১৯০৪ তাবিখে কলকাতাব শ্যামবাজাব অঞ্চলে এবং কলেজ পাঠ, বিদ্যাসাগব কলেজে। (সূত্র : 'Saheed Bhagat Singh', K.K. Khullar)। জন্মস্থান : ১বি, গণেন্দ্র মিত্র লেন, শ্যামবাজাব, মাতুলালয়ে।

লাহোর জেলে ঐতিহাসিক অনশনেব পূর্বে তিনি বর্তমান বাংলাদেশেব মৈমনসিং কেন্দ্রীয় কাবাগাবে বন্দী থাকা অবস্থায় ১৯২৫ সালে টানা ২০ দিনেব অনশন ধর্মঘট কবেন। ১৯২৮ সালে তিনি মুক্তি পান। কলকাতায অনুষ্ঠিত ১৯২৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভলান্টিযার্স-বাহিনীব মেজব হিসেবে যোগ দেন, যে বাহিনীর 'জেনাবেল অফিসাব কমান্ডিং' ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। (সূত্র : ঐ)

বোমা তৈরিব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। ভগৎ সিং-এর সঙ্গে ১৯২৮ সালে কলকাতায তাঁর-যোগাযোগ হয়। যতীন দাস ছিলেন গম্ভীব, শান্ত ও স্বল্পভাষী দৃঢ় চবিত্রেব এক অসামান্য বিপ্লবী। দক্ষিণ কলকাতায় 'স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী' গডে তোলাব ব্যাপারে যতীন দাসেব অবদান প্রচুর। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বাহিনীর নেতা সত্য গুপ্তের প্রধান সহায়ক ছিলেন তিনি। শচীন্দ্রনাথ সান্যালেব সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১৯২৯ সালের ১৪ই জুন, যতীন দাসকে তাঁর কলকাতাব বাডি থেকে লাহোব পুলিশের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঐতিহাসিক ৬৩ দিনের অনশন অন্তে তাঁর শহীদের মৃত্যুবরণের পর, লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলের মধ্য দিয়ে দেহ আনা হয় কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। যতীন দাসের বৃদ্ধ পিতা শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র দাস অতুলনীয় গাম্ভীর্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে বলেছিলেন : "ওঁ নারায়ণ, যে দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করেছিল, তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার আদরের খেঁদুকে (যতীন দাসের ঘরোয়া, ডাকনাম) অশ্রুঅর্ঘ্য-সহ তোমার চরণে সমর্পণ করলাম!"···· (সূত্র : শিববর্মা প্রণীত 'শহীদ স্মৃতি' এবং ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় প্রণীত 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব')।

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তারিখে, কলকাতা কর্পোরেশন শহীদ যতীন দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। মেয়র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নির্দেশে কলকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত অফিস ও স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়। কর্পোরেশন যতীন দাসের স্মৃতিতে একটি রাস্তারও নামকরণ করে। (সূত্র : 'Terrorism in Bengal', Vol.-I. Page 827)।

৩০ **সুখদেব :** জন্ম : ১৯০৫ সাল। জন্মস্থান : লায়ালপুর, পাঞ্জাব (বর্তমান পাকিস্তানের ফৈসলাবাদ।) পিতা : রামলাল। সুখদেব ভূমিষ্ঠ হবার তিন মাস পূর্বে তার পিতার মৃত্যু হয়। সুখদেবের ভরণপোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করেন তার কাকা লালা অচিন্ত্য রাম। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ লাহোর সেন্ট্রাল জেলে (ভগৎ ও রাজগুরুর সঙ্গে) সুখদেবের ফাঁসি হয়।···

"দীর্ঘদেহী না হলেও সুখদেবের রঙ ছিল উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। মাথাভরা একরাশ কোঁকড়া চুল। চমৎকার দেখতে। ভাসা-ভাসা দুটি বড় বড় চোখ। তার একরোখা কথাবার্তার জন্য, 'ভিলেজার' বা গেঁয়ো এই নামে, ঠাট্টা করে, দলের লোকেরা ডাকত।···হাসির ফোয়ারা ছড়ানো, আবার পর মুহূর্তে নীরবতার আচরণে স্থির গাম্ভীর্য আনা-সুখদেবের প্রকৃতিতে এই আশ্চর্য সংমিশ্রন ঘটেছিল।···

"পাঞ্জাব পার্টির রাজনীতিক নেতা ছিল ভগৎ সিং। কিন্তু প্রধান সংগঠক ছিল সুখদেব।···নিজের ব্যাপারে সুখদেব ছিল খুবই উদাসীন। কিন্তু সাথীদের দেখভাল করতে, খাওয়াতে, পরাতে তার আনন্দের সীমা ছিল না।···বেলফুল আর বেলফুলের মালা, এ দুটির দারুণ সখ ছিল সুখদেবের। ভুট্টা খেতেও খুব ভালবাসত। পথ চলতে চলতে তিন-চারটে ভুট্টা কিনত। নিজে খেত পথ-চলতি অন্যদেরও দিত।···সুখদেবের প্রকৃতি যেমন ছিল জেদী তেমনি ছিল খাম-খেয়ালি। মাথায় কিছু একবার যদি ঢোকে তাহলে কার সাধ্য তাকে টলায়! সে একবার যে কাজ করবে বলে স্থির করত সেটা করা থেকে তাকে বিরত করা সাধ্যাতীত ছিল।··· ভগৎ সিং-এর প্রতি সুখদেবের মমতা ছিল সব চাইতে বেশি। তার সকল ভালবাসা ও প্রীতির পাত্র ছিল ভগৎ সিং।···কিন্তু সময়মত আদর্শের জন্য সে তার এই সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে দ্বিধা করল না। সে বলল, 'আমি বন্ধুর প্রতি আমার কর্তব্য পালন করেছি।'···

"জেলের সাথীদের মধ্যে ভগৎ সিং-এর পরেই সমাজবাদ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি পড়াশুনা ও ভাবনা-চিন্তা কেউ করে থাকলে, সে ছিল সুখদেব।···

"বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যের সাফল্যে সুখদেবের বিশ্বাস যে কতখানি অটল ছিল তার প্রমাণ সুখদেবের ফাঁসির পূর্বে গান্ধীকে লেখা তার ঐতিহাসিক পত্রটি।" (সূত্র : 'শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা)।

জানা যায়, 'যব জ্যোতি জাগে' (হিন্দী) পুস্তিকাটির লেখক ছিলেন সুখদেব।

৩১ **রাজগুরু :** জন্ম : ১৯০৯ সাল। জন্মস্থান : খেড়া, জেলা পুনা, মহারাষ্ট্র। পুরো নাম : শিবরাম হরি রাজগুরু। পিতার নাম : হরি নারায়ণ রাজগুরু। রাজগুরুর বয়স যখন ছ'বছর, তখন তার বাবা মারা যান। বড় ভাই, দিনকর হরি রাজগুরু তাকে লালন-পালন করেন। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ, লাহোর সেন্ট্রাল জেলে সাথী ভগৎ সিং ও সুখদেবের সঙ্গে তারও ফাঁসি হয়।···

, বারাণসীর একটি মিউনিসিপ্যাল স্কুলে রাজগুরু ছিলেন ড্রিল মাস্টার, যখন শিব বর্মা, দলের একটি অ্যাকসনে তাকে যুক্ত করার জন্য রাজগুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

রাজগুরুর দৈহিক গঠন ছিল সাধারণ। শ্যামবর্ণ। আকর্ষণহীন লম্বা চেহারা। গাল দুটি বসা। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়া।···· পরণে খাঁকি হাফপ্যান্ট, সার্ট।···দলের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবার প্রথম দিকের কর্কশ স্বভাবের রাজগুরু ধীরে ধীরে পুরোপুরি বদলে যায়। আনন্দ, স্ফূর্তি, মজা, হাসি, ঠাট্টায় রাজগুরুর জুড়ি মেলা ছিল শক্ত। রাজগুরুর একটিই রোগ ছিল, যখন তখন যেখানে সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়া। এ নিয়ে অনেক মজার মজার ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়।···

কারুশিল্প সামগ্রী এবং অঙ্কনশিল্প দ্রব্যের প্রতি রাজগুরুর ছিল বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ। সে ছিল, সংক্ষেপে সৌন্দর্যের পূজারী। এনিয়ে চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে রাজগুরুর দ্বন্দ্ব ও পরে আজাদের ভুল স্বীকারের একটি ঘটনার কথা জানা যায়।···

বিপ্লবী জীবনে ভগৎ সিংকে তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করত রাজগুরু। কে আগে মৃত্যুবরণ করবে এই ছিল রাজগুরুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়।

মার্কসবাদী তত্ত্ব এবং সাম্যবাদের বুনিয়াদী মতাদর্শ সম্পর্কে বিশেষ তত্ত্বজ্ঞানী না হলেও রাজগুরু তার জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন' সামাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই মুক্তির পথ এবং দৃঢ়ভাবে তার ধারক ও বাহক ছিলেন তিনি।

ফাঁসির কিছুদিন আগে, রাজগুরু খোলামনে বলেছিলেন যে, বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে তার নীরস জীবন কত সুন্দর ও শোভন হয়ে উঠেছিল, যা আগে তার কাছে ছিল অর্থহীন, সেই পৃথিবীই বিপ্লবীদের স্পর্শে হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়। সাথীরা ঠাট্টা করে বলল, 'মরতে ভয় পাচ্ছ ?... অনুশোচনা হচ্ছে ?'

রাজগুরু দীর্ঘ বিশ্লেষণ শেষে বললেন, '...এমন আলোকোজ্জ্বল মহান মৃত্যুকে যে ভয় করে তাকে মূর্খ ছাড়া আর কি বলব ! একজন বিপ্লবীর কাছে এই মৃত্যু আশীর্বাদ।'

(সূত্র : 'শহীদ স্মৃতি', শিব বর্মা)।

গ্রন্থপঞ্জি

ভারতীয় ক্রান্তি কে অগ্রদূত অমর শহীদ ভগৎ সিংহ (হিন্দী) : বীরেন্দ্র সিঁধু, নিউদিল্লী।
ভারতবর্ষের ইতিহাস : কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য,মস্কো।
মুক্তির সংগ্রামে ভারত : আলেখ্য গ্রন্থ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার।
ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়।
বাংলায় বিপ্লববাদ : নলিনীকিশোর গুহ।
ইনক্লাব জিন্দাবাদ : লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।
বিপ্লবীর জীবন দর্শন : প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী।
জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)।
বাবা পৃথ্বীসিং আজাদ (অনুবাদ) : আত্মজীবনী।
রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ : চিণ্মোহন সেহানবীশ।
ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ : সবল চট্টোপাধ্যায়।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা : সরোজ মুখোপাধ্যায়।
গণশক্তি,কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ · জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, সম্পাদনা · অনিল বিশ্বাস।
শহীদ স্মৃতি (অনুবাদ) : শিব বর্মা।
অগ্নিযুগ, সম্পাদনা : শৈলেশ দে।
ওরা আকাশে জাগাত ঝড় : শৈলেশ দে।
সিংহাবলোকন (হিন্দী) : যশপাল, এলাহাবাদ।
সরদার ভগৎ সিং পত্র আউর দস্তাবেজ (হিন্দী) : বীরেন্দ্র সিঁধু, দিল্লী।
Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh Edited by Shiv Verma, নিউদিল্লী।
The Untold Story : Lt. Gen. B M. Kaul, বম্বে।
Why I am an Atheist : Sardar Bhagat Singh, কানপুর।
Shaheed Bhagat Singh, A Biography Gurdev Singh Deol, পাতিয়ালা।
Bhagat Singh and his Comrades . Ajoy Ghosh, নিউদিল্লী।
Shaheed Bhagat Singh K. K Khullar।
Terrorism in Bengal : Edited by Amiya K Samanta, কলকাতা।
The Dramatic Escape Prof. Hazara Singh, অমৃতসর।
জালিয়ানওয়ালাবাগ (হিন্দী) : Govt. of Punjab।
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।
শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা : পণ্ডিচেরী।
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা : স্বামী গম্ভীরানন্দ।
নেতাজী ও ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ, নেতাজী জন্মশতবর্ষ স্মারক সংগ্রহ/৫।
নির্বাচিত ভাষণ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ঐ।

নির্দেশিকা

খ

গ

চ

ভ

ম

য

ব

হ